পশ্চিমবঙ্গে

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

[Panchayat System in West Bengal]

অসিতকুমার বসু এম. এ., পি. এইচ. ডি.
লেকচারার, বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা-৬৩
এবং
আংশিক সময়ের শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PASCHIMBANGE PANCHAYAT BYABASTHA

Dr. Asitkumar Basu

প্রকাশকাল :

জুন, ১৯৮৩

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যান্‌সন্‌, নবম তল

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয় প্রেস

৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : পনের টাকা

চিত্র এবং প্রচ্ছদ :

দুর্গা রায়

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in Regional Languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী ১৯৫৮ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের কার্যক্রম আরম্ভ। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে নির্বাচন স্থগিত ছিল। তাই গ্রামবাসীদের এতে কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৩ সালে নতুন এক পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই আইন অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে। পঞ্চায়েত কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটেছে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণের সময় পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সে বিষয়ে একটি পরিশিষ্ট এই গ্রন্থের শেষে সংযোগ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন, কাজকর্ম, অর্থ, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক, গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যাদি ও তার প্রতিকারের প্রতি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জনপ্রশাসনের শতবার্ষিকী অধ্যাপক ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং অনেক জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তাছাড়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পূর্বতন প্রধান অধ্যাপক এবং বর্তমানে নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট অব এশিয়ান ষ্টাডিজের ডাইরেক্টর ডঃ রাধারমণ চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও সহকর্মিবৃন্দ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকুমারকৃষ্ণ বসু, এম. এ.,

ডবল্যু. বি. সি. এস্. মহাশয়, যিনি দীর্ঘ দিন ধরে গ্রামীণ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ নানা জটিল সমস্যা পর্যালোচনা ও মত বিনিময় করে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানবার সুযোগ পেয়েছি। তাছাড়া, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন পঞ্চায়েতের জয়েন্ট ডাইরেক্টর শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন, সহকারী ডাইরেক্টরবৃন্দ সর্বশ্রী আনন্দ ঘোষ হাজরা, উদয় ভাদুড়ী ও জি. সি. সরকার এবং পঞ্চায়েত ভবনের অন্যান্য অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ। পঞ্চায়েতের পূর্বতন জয়েণ্ট ডাইরেক্টর শ্রীঅমলেন্দু দে মহাশয়ের সঙ্গেও আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্য ও তৎসক্রান্ত মতামত একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত।

পরিশেষে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে আমার পড়ানোর সুযোগ ঘটেছে, তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে খুবই উপকৃত হয়েছি।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও তার কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত করাই আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ তাঁদের মধ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আরো গভীর জ্ঞানলাভের জন্য উৎসাহ জাগালে আমার সামান্য প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম এই ধরনের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ সুধীসমাজে সমাদৃত হবে আশা করি। শ্রীমান আলো দাস তার সুন্দর হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা মহাশয় এই গ্রন্থটি প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং তা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। মুদ্রণ বিষয়ে জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ঐ প্রেসের নিপুণ কর্মীবৃন্দের সার্বিক সহায়তার ফলেই গ্রন্থটির মুদ্রণ দ্রুত হয়েছে। তাঁদের অবদানও স্মরণ করছি।

'বসু ভবন'

অসিতকুমার বসু

২৭বি, তসুপুকুর রোড,

ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০ ০৩১

উৎসর্গ

যাঁরা অখণ্ড বাংলার গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে
ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন সেই আমার মাতামহ
প্রয়াত বিনোদবিহারী গুহ মজুমদার, প্রেসিডেন্ট,
হরিঢালী ইউনিয়ন বোর্ড, খুলনা জেলা
এবং
আমার প্রপিতামহ প্রয়াত জানকীনাথ বসু,
প্রেসিডেন্ট, হরিঢালী ইউনিয়ন বোর্ড,
খুলনা জেলা—
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা- 3,242
সদস্য সংখ্যা-46,766
পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা- 324
সদস্য সংখ্যা- 8,467
জেলা পরিষদের সংখ্যা- 15
সদস্য সংখ্যা- 648
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা
পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা
76
দার্জিলিং
10
122
জলপাইগুড়ি
13
128
কোচবিহার
11
157
পশ্চিম দিনাজপুর
16
144
মালদহ
15
251
মুর্শিদাবাদ
26
169
বীরভূম
19
224
বর্ধমান
23
182
নদীয়া
16
169
পুরুলিয়া
20
190
বাঁকুড়া
22
201
হুগলী
17
165
হাওড়া
14
549
চব্বিশ পরগণা
50
575
মেদিনীপুর
52
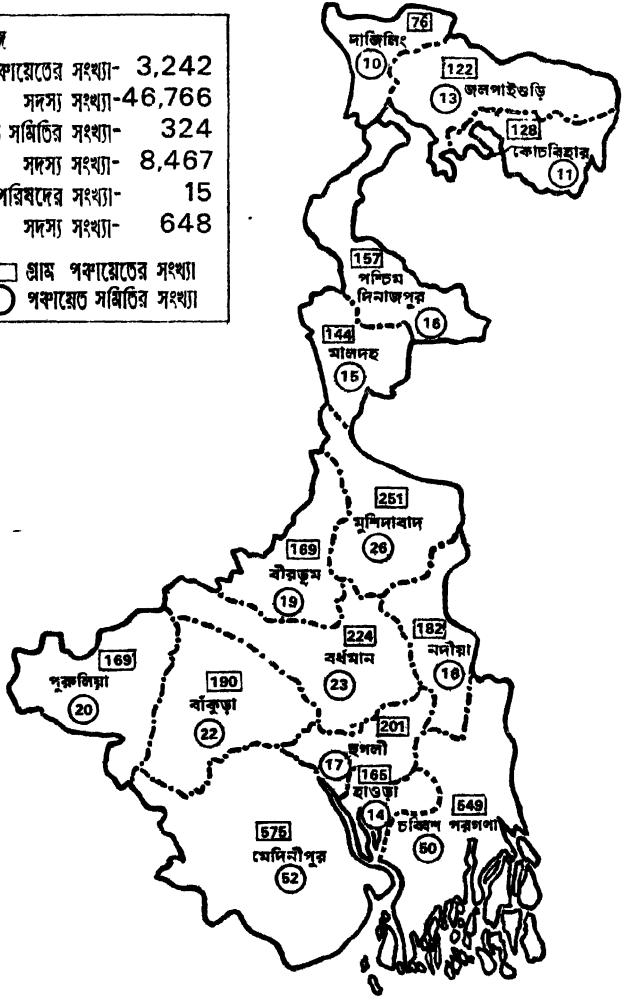
প্রথম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্ব

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেই কোন না কোন রকমের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। তবে এদের মধ্যে গঠন ও আদর্শগত পার্থক্য যথেষ্ট। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায় এবং তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কি সম্পর্ক এবিষয়ে সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য কোন পরিপূর্ণ ও সুসঙ্গত তত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এখনো গড়ে ওঠেনি। তবে এবিষয়ে রবসন, জ্যাকসন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে কিছু কিছু তত্ত্বগত ধারণা পাওয়া যায়। ই. এরিক-জ্যাকসনের মতে, "স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় গণনির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সেবামূলক এবং অন্যান্য বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা। এই পরিষদগুলি নির্বাচিত হয় তাদের প্রশাসনভুক্ত এলাকাগুলি থেকে।"[1] উইলিয়াম এ. রবসন স্থানীয় সরকার বলতে মনে করেন এমন একটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী যাদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় পরিচালনার জন্য আইন সঙ্গত অধিকার এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন রয়েছে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা নেই স্থানীয় শাসনের জন্য, তাই দরকার এমন একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যে কর্তৃপক্ষের বাইরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা রয়েছে। আর এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিষয়ক প্রশাসনে স্থানীয় জনসম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করেন। স্থানীয় শাসনে এই সবগুলো উপাদানের পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে।[2] সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল উপাদান হচ্ছে এর আইনগত মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, সাধারণ স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসন পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ এবং প্রশাসন ব্যয় মেটাবার জন্য নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা। স্থানীয় শাসনের অর্থ হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষুদ্রতর অথচ আভ্যন্তরীণ কোন এলাকায় ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষমতা। স্থানীয় কথাটার অর্থ হচ্ছে একটি সীমিত এলাকা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্থানীয় শাসন একই

অর্থদ্যোতক। তবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কথাটির মধ্যে স্থানীয় এলাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতার ওপর গুরুত্বটা যেন বেশী রয়েছে।[৪] সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত পরিষদগুলি সেখানকার পৌরব্যবস্থা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের একাজে সাহায্য করেন যে সব অফিসার তাঁরা পরিষদগুলির কাছে দায়ী থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রশাসন বিধিগত-ভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করেন বটে কিন্তু নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে যাতে অনেকটা পরিমাণে স্থানীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকে সেজন্য যথেষ্ট আর্থিক ও অন্যান্য স্বাধীনতা এই পরিষদগুলির থাকে।'[৫]

স্থানীয়স্তরে স্বায়ত্তশাসনের মূল উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় জনগণের কল্যাণসাধন। স্থানীয় শাসনের একটি পরিপূর্ণ এবং সুসঙ্গত তত্ত্ব খুঁজে বের করা অবশ্য খুবই কঠিন। এর দু'রকম অর্থ হতে পারে—স্থানীয় স্বায়ত্ত প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্থানীয় বিবিধ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে স্থানীয় জনগণের উন্নততর প্রশাসনের জন্য রাজ্যের এলাকাকে বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়। এই সব এলাকা প্রশাসনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় প্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাপারে স্থানীয় শাসনের সাফল্যের জন্য যা দরকার তাহল শাসিত স্থানীয় জনগণের ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতা প্রয়োগ। লেসলী গ্রীণের মতে, 'স্থানীয় শাসন বলতে বোঝায় এমন এক স্থানীয় শাসন সংস্থা যা স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং তাদের নিকট দায়ী। সেই সঙ্গে এই সংস্থা বা পরিষদ রাষ্ট্রের নিকটও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দায়ী। এ ধরনের সংস্থা হয়ত বস্তুত সুইস কন্‌ফেডা-রেশনের মতই রাষ্ট্রগঠনের আগে বর্তমান ছিল। কিংবা কানাডার মত রাষ্ট্র থেকেই তা উদ্ভূত। কিন্তু তারা সরকারী প্রশাসনের অঙ্গ নয়। এধরনের সংস্থার মৌল নীতি হচ্ছে এই যে স্থানীয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে সমবেতভাবে স্থানীয় জনগণ এবং রাষ্ট্রের নিকট দায়ী থাকেন।'[৬]

গ্রাম ভিত্তিক ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে গান্ধীজি যে বক্তব্য রেখেছেন

তার মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজি বলেছেন, "স্বাধীনতা হইবে তলদেশ হইতে, যেমন, প্রত্যেক গ্রাম হইবে এক একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়েত বা সাধারণতন্ত্র। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেক গ্রামকে সকল বিষয়ে আত্ম-নির্ভর হইতে হইবে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে হইবে, আর সমস্ত পৃথিবী যদি বিরূপ হয়, তবে একমাত্র নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করিতে হইবে।… ………এই ব্যবস্থায় প্রতিবেশী তথা দুনিয়ার অপর কাহারও উপর নির্ভরতা বা তাহার স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য গ্রহণ বাদ পড়িবে না।"[6]

এ প্রসঙ্গে গান্ধীজি আরও বলেছেন, "অসংখ্য গ্রাম লইয়া গঠিত এই সমাজদেহ চক্রাকারে বৃদ্ধি পাইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, এই দেহের কোন অংশ অপর অংশের উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিবে না, ইহা পিরামিডের মত হইবে না, শীর্ষদেশকে উর্ধ্বে আলোকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য তলদেশ নীচের অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে না। ইহা হইবে মহাসমুদ্রের মত মণ্ডলাকার,—এই মণ্ডলের কেন্দ্র হইবে ব্যক্তি। ব্যক্তি গ্রামের জন্য আত্মাহুতি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে—একটি গ্রাম বহুগ্রামের বৃহত্তর মণ্ডলের জন্য মরিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চক্রাকারে যে দেহ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে, ব্যক্তি লইয়াই তাহা গঠিত হইবে এবং সেই বিশাল দেহে একই প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে। এখানে দম্ভে মোহে ব্যক্তি কখনও উদ্ধত হইবে না, পরন্তু নম্র হৃদয়ে সমুদ্র-মণ্ডলের মত যে সুবিশাল দেহের তাহারা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহারাই ঐশ্বর্য উপলব্ধি করিবে।

সুতরাং এই বিশাল দেহে বাহিরের পরিধিতে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ভিতরের চক্রের মানুষকে পিষিয়া মারিবার জন্য ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন না, তাঁহারা বরং সকলকে শক্তি দিবেন এবং সকলের নিকট হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবেন……………যদি প্রত্যেক গ্রামটিকে লইয়া ভারতবর্ষে একটি সাধারণতন্ত্র গঠিত করিতে হয়, তবে আমি উহার যে চিত্র দিয়াছি তাহাই সত্য বলিয়া আমি দাবী করিব—এই চিত্রে আদিতে যাহা এবং অন্তে যাহা, তাহারা উভয়েই সমান অর্থাৎ সবার আগে বা সবার পিছে বলিয়া এই চিত্রে কেহ বা কোন কিছু থাকিবে না।"[7]

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বটি গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, সমগ্র জনগণের শাসন এবং সে শাসনে চলে ভোটের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ। আধুনিক যুগধারণায় গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিমূলক। অর্থাৎ জনগণের সমগ্র বা বেশীর ভাগ অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের শাসন ক্ষমতার প্রয়োগ করেন এবং এই প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা। সমস্ত আর্থিক ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে মুক্তি ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তি সম্প্রদায় এবং জাতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লোকের নিকট সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত করে দেয়া। গণতন্ত্র শুধু যে একটি জীবনধারা তাই নয়, এটি একটি রাষ্ট্রশাসন প্রণালীও। অর্থাৎ এই জীবনধারা গড়ে তোলার জন্যই গণতান্ত্রিক সরকার এমনি একটি শাসনব্যবস্থাও গড়ে তোলেন।

দক্ষ ও সৎ সরকার যে স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না একথা বলাই যথেষ্ট নয়। অতিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত বিপদ থাকতে পারে। ফলতঃ প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাহত হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির দরুন আধুনিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণের ও যান্ত্রীকরণের প্রচেষ্টার ফলে কিছু বিপরীত ও অশুভ শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে এবং কার্যত অনেকক্ষেত্রে ঘটেছেও। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দক্ষতা এর ফলে ব্যাহত হয়েছে। অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত প্রশাসনে আমলাতন্ত্র নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে থাকেন। অতিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসনের দুর্নীতি, দাসমনোবৃত্তি এবং অযোগ্যতা দেখা দেয়।

এই অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ আধুনিক গণতন্ত্রের একটি মৌল সমস্যা। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রকে সুস্থ ও সবল রাখবার জন্য গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। "স্থানীয় স্তরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত এবং পরিপুষ্ট হলেই জাতীয় স্তরে গণতন্ত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চলতে পারে।"[৪] সাধারণতঃ অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত সরকারের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার

হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবা হয়। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, স্থানীয় স্তরই গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষণভূমি। কারণ এই স্তরেই জনগণ তাদের আশু এবং প্রত্যক্ষ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন আর নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলির ধরণ ধারন সম্পর্কেও তারা অবহিত।

সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে, জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত মানবগোষ্ঠীর এক একটি সমষ্টি। স্বাধীনতার অর্থ কি? এর একটি অর্থ হল, কোন মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সরকারে নাগরিকত্বের নিশ্চিত অধিকার। একটি স্থানীয় মানবগোষ্ঠীর মর্যাদা ও আত্মবিকাশের পথ সুগম করে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নাগরিকতা শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই এধরনের নাগরিকতা শিক্ষার স্বাভাবিক অবকাশ রয়েছে। জনহিতকর কাজে স্থানীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্বয়ং পরিচালনার বোধ গড়ে তোলার ফলে গোষ্ঠী বা জনসম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ব ও দায়িত্ববোধ বেড়ে ওঠে। এবং সেইজন্য গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ছোট ছোট এলাকায় স্বায়ত্তশাসন নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রথমতঃ, এর মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে পৌর কর্তব্য ও দায়িত্ব:বোধ জন্মায়। স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে সার্বজনীন বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে সার্বজনীন স্বার্থের এক যৌথ মনোভাব গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নাগরিক চেতনা বিকাশের পথ প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সত্যিকারের গণতন্ত্রে যা দরকার তা হল জনগণকে প্রশাসনের অংশীদার করা। প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের স্বার্থকে মূল নির্দেশক নীতি হিসাবে সক্রিয় রাখতে হবে। শুধু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। যা সবচেয়ে বেশী দরকার তা হলো প্রশাসনিক স্তরে জনগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রয়োগের সুস্পষ্ট সুযোগ প্রদান। আর জনগণই তো গণতন্ত্রের প্রকৃত মালিক বা কর্তা। এই ক্ষমতা বা প্রভাব প্রয়োগের সুযোগ ঘটে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে। এ. দ্য. টোকোভিল যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে নাগরিকদের স্থানীয় পরিষদগুলি স্বাধীন জাতির শক্তি স্বরূপ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলির যা গুরুত্ব, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পৌর পরিষদের গুরুত্বও তাই।[৩] স্থানীয় পৌর পরিষদগুলি স্বাধীনতাকে জনসাধারণের

নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেয়। এবং কি করে সেই স্বাধীনতাকে ব্যবহার ও ভোগ করতে হয় তা শেখায়। কোন একটি দেশ বা জাতি হয়ত স্বাধীন সরকার গঠন করল। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা না থাকলে সেই সরকারের মধ্যে স্বাধীন সত্তা গড়ে উঠতে পারে না। সুইজারল্যাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের। সেখানে এই শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে অংশগ্রহণ করছেন। ব্রাইস বলেছেন, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং এর সাফল্যের সবচেয়ে বড় গ্যারাণ্টি।[10] আদর্শগত দিক্ থেকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে গণতন্ত্রের বাল্যভূমি। সক্রিয় এবং সৎ নাগরিকতা শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জুড়ি নেই। তাই বলা যেতে পারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি হল আসলে গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শ পাঠশালা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা পূর্ব সর্ত হল সার্বজনীন শিক্ষা। জনগণ সেই শিক্ষা হাতে কলমে লাভ করতে পারেন এই ধরনের পাঠশালাগুলিতে।

তৃতীয়তঃ, সরকারী সিদ্ধান্তগুলি সবই যদি দূরবর্তী রাজধানীতে নেওয়া হয় তাহলে সরকার কীভাবে চলছে এবং সরকার কী করতে পারে বা পারেনা সে সম্পর্কে নাগরিকদের জানবার বা উর্দ্ধপ্রশাসনের পক্ষেও জনগণের মনো-ভাব জানবার সুযোগ খুব অল্পই থাকে। ফলে জনগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে রাজনৈতিক ঔদাসীন্য এবং উচ্চ প্রশাসকদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতা দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে নাগরিকরা আরো কিছু শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। এছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁদের জন-স্বার্থেই কাজ করতে হয়, জনস্বার্থের কথা চিন্তা করতে হয় এবং সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে হয়। এর ফলে, জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, সমাজের সর্ব-নিম্ন স্তরে রাজনৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়।[11] স্থানীয় শাসিত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে তাই বলা যেতে পারে রাজনৈতিক শিক্ষার কার্যকরী মাধ্যম। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় "স্থানীয় শাসন একটি সরকারের অন্য যে কোন অংশের তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষামূলক।"[12]

চতুর্থতঃ, এমন কিছু স্থানীয় সমস্যা আছে যা সম্পূর্ণ স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় লোকেরাই এইসব সমস্যা সম্পর্কে বেশী ওয়াকিবহাল। তাঁরা জানেন, কী ভাবে এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাই পরিকল্পনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে নামেনও। অনেক সময় জাতীয় পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা ও জনগণের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকার ফলে সেইগুলি উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় সমস্যা মোকাবিলা করে থাকেন। তাই তাঁদের সামগ্রিক মূল্যায়ণের জন্য তাঁরা জাতীয় পরিকল্পনা রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের বৃহত্তর সমস্যার ব্যাপারে কাজে হাত দেওয়া সহজ হয়।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি গড়ে তুলতে পারে। যদি কথনো ভুল হয় তবে তা স্থানীয় ক্ষেত্রে সীমিত থাকবে। সমগ্র দেশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

ষষ্ঠতঃ, স্থানীয় শাসন ছাড়া স্থানীয় প্রতিভাকে খুঁজে বের করাও শক্ত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ফলে স্থানীয় প্রতিভার সন্ধান ও বিকাশের সুযোগ পাওয়া যায়।

সপ্তমতঃ, স্থানীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যও স্থানীয় সরকার প্রয়োজন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আকারে বৃহৎ এবং জাতীয় সমস্যাও প্রচুর। এক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমুদয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যাগুলি অবহেলিত হয়। তাই শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্যই, কেবলমাত্র শ্রমবিভাগের নীতির উপর ভিত্তি করেও, সরকারের করণীয় কার্যগুলি জাতীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া প্রয়োজন।[13]

গণতন্ত্রে এই ধরনের কাঠামো ও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বাস্তবিকই 'বিকেন্দ্রীকরণ এবং দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনই উন্নততর সমাজ গঠনের রাজনৈতিক পথ।'[14] অধ্যাপক জি. ডি. এইচ্ কোল একই কথা বলেছেন একটু আলাদাভাবে। তিনি লিখেছেন, 'গণতন্ত্র কেন্দ্রী-

ভবনের বিরোধী। কেননা এটি এমন একটি চেতনা যা সমবেত ইচ্ছা প্রকাশের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গেই এবং ঘটনাস্থলেই স্বীয় স্বাধীনতাকে ঘোষণা করতে চায়। এই স্বাধীনতার চেতনাকে এক কেন্দ্রীয় খাতে প্রবাহিত করার অর্থ হচ্ছে এর স্বতস্ফূর্ততাকে বিনষ্ট করা এবং একে অবাস্তব করে তোলা।[15] সুতরাং প্রশাসনিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক আদর্শ আরোপের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সহজাত ভাবেই ঘটে থাকে। এটা হচ্ছে কেন্দ্রীভবনের বিপরীত এবং এর অর্থ হচ্ছে সরকারের উচ্চতর স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে আইন প্রণয়ন, বিচার এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা। কেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় সদর দপ্তরে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কেন্দ্রীভবন। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কয়েকটি ইউনিটের মধ্যে কর্তৃত্ব ছড়িয়ে দেওয়া। এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ফেসলার:

'কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত অথবা বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে যেসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে তার গুরুত্ব দেখে। কেননা, এমন কিছু বিষয় আছে যা সম্পূর্ণভাবে সদর দপ্তরের সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেয়া হয়। বিকেন্দ্রীকরণের বা কেন্দ্রীকরণের প্রমাণ পাওয়া যাবে আরও নানা দিক থেকে। যেমন, যে বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে সদর দপ্তরে উদ্ভূত এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেসব বিষয়ে স্থানীয় কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রের আলাপ আলোচনা এবং স্থানীয় কর্মীদের মতামতে গুরুত্ব দানের পরিমাণ, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সদর দপ্তরের সঙ্গে স্থানীয় কর্মচারীদের পরামর্শের কালপর্য্যায়, স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন ও নির্দেশের সংখ্যা, স্থানীয় সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য নাগরিকদের আবেদনের ব্যবস্থা, প্রতিটি ভৌগলিক এলাকায় সমস্ত বিভাগের স্থানীয় কাজকর্ম একজন মাত্র স্থানীয় আধিকারিকের দ্বারা কতটা পরিচালিত তার পরিমাণ এবং স্থানীয় আধিকারিকদের দক্ষতা শুধুমাত্র একটি স্থানীয় শাসনের অস্তিত্ব, কিংবা এর ওপর নানা কাজের বোঝা থাকা কিংবা কর্মচারী সংখ্যার দশভাগের নয়ভাগের স্থানীয় কাজকর্মে নিয়োগ এর কোনটাই বিকেন্দ্রীকরণের পরিচয় বহন করে না।'[16]

ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ (devolution) বা দায়িত্ব অর্পণের (delegation) সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণের (decentralization) ধারণার পার্থক্য রয়েছে। 'বিকেন্দ্রী-

করণের অর্থ হচ্ছে— যেসব এলাকায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরিষদের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেসব এলাকায় স্থানীয় শাসন বর্তমান।[17] এর সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের সাবেকী ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ (devolution) হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি 'যাতে প্রথাসম্মত ভাবে গঠিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সুনির্দিষ্ট বা অবশিষ্ট কাজ চালাবার জন্য আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।'[18] আর দায়িত্ব অর্পণ বা প্রত্যভিযোজন (delegation) বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ হস্তান্তর যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দেবার বা সিদ্ধান্ত সংশোধনের অধিকার বজায় থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে যা হস্তান্তর করা হয় তা কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব প্রদান নয়, আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণ নয়, শুধুমাত্র কেন্দ্রানুগ কর্মসূচী রূপায়ণে সীমাবদ্ধ কাজের দায়িত্ব।

অনেক সময়েই প্রত্যভিযোজন অর্থাৎ ক্ষমতা অর্পণকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে ভুল করা হয়। এই ক্ষমতা অর্পণের ফলে অবশ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সব দিক থেকেই। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কিছু কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব সরকার অন্য কর্তৃপক্ষের হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এক সমাবেত দায়িত্ববোধ জন্মে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তাদেরই হাতে যারা সরাসরি এইসব ক্ষমতার মূল্যায়ন ও পরিণাম উপলব্ধি করেন। তারা হলেন স্থানীয় জনসাধারণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রকৃতপক্ষে সমার্থক নয়। বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটির মধ্যে সাধারণতঃ কোন বিশেষ গণতান্ত্রিক অর্থ নিহিত নেই। সেইজন্যই একটি বিশেষ অর্থ আরোপের উদ্দেশ্যে বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটির পূর্বে 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং এই আদর্শের প্রতিষ্ঠানিক

রূপ হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে রয়েছে বিকেন্দ্রীকরণের উপাদান। আর জনগণের অংশগ্রহণের ধারণার মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক উপাদান। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ শাসনব্যবস্থার নতুন স্তর স্থাপন। এ ব্যাপারে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে স্বয়ংশাসিত রাজ্যগঠন এবং রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রশাসনের সঙ্গে জনগণকে জড়িত করা। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই জনগণের এই অংশগ্রহণ সম্ভব। ভারতীয় পটভূমিকায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে পঞ্চায়েতীরাজের মাধ্যমে। ডঃ ইকবাল নারায়ন এই পঞ্চায়েতীরাজের পটভূমিতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটির তত্ত্বগত দিকটি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এইভাবে: 'উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী উভয়দিক থেকেই পঞ্চায়েতী রাজ হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর সম্প্রসারণ। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করতে হবে মুখ্যত উন্নয়ন যন্ত্র হিসেবে, শাসন যন্ত্র হিসেবে নয়।'[19] ডাঃ নারায়ন আরো সুনির্দিষ্টভাবে পঞ্চায়েতীরাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন, 'পঞ্চায়েতী রাজ হচ্ছে স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট এলাকার প্রশাসন যে প্রশাসন প্রধানত স্থানীয় কাজকর্ম এবং সেবার ভারপ্রাপ্ত। এইসব সেবা বা কাজকর্মের সুফল ঐসব স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারাই পান এবং ঐসব সেবা বা কাজকর্মের জন্য যতটা সম্ভব নিজেদের সম্পদ থেকেই অর্থ দেন। প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোও তাঁদের নিজস্ব। এই প্রশাসন আইন সঙ্গতভাবে অনুমোদিত, ঐ এলাকার বাসিন্দাদের কাছে দায়ী এবং যতটা সম্ভব বহির্নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।'[20]

সহজভাষায় বলতে গেলে, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হচ্ছে স্থানীয় জনগণের দ্বারা স্থানীয় কাজকর্ম স্বাধীন এবং জনপ্রিয়ভাবে পরিচালনা করা। মূলতঃ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বরূপ ও পরিধি হবে নিম্নরূপ:

'(a) বিভিন্ন স্তরে কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব এবং এ ধরনের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষই শেষপর্যায়ে সার্বভৌম অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ;

(b) এইসব কর্তৃপক্ষের ওপর কাজকর্মের দায়িত্ব বণ্টন;

(c) এইসব কর্তৃপক্ষের গঠন হবে গণতান্ত্রিক;

(d) গণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করবে এইসব কর্তৃপক্ষ; এবং

(e) নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এইসব কর্তৃপক্ষের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা থাকবে। তবে উর্দ্ধতর স্তরে তারা গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকবেন।'[21]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫৭ সালে সমষ্টি উন্নয়ন সেবা সংক্রান্ত মেহতা পর্যবেক্ষক দল (ষ্ট্যাডি টিম) সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। এবং বিশেষভাবে জনগণের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষক দলটি গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং এর ওপর সরকারী কর্তৃত্ব অর্পণের ওপর। সমষ্টি উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের তত্ত্বটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পর্যবেক্ষক দল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতির বৃহত্তর দিক্‌টির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। 'জনগণের অংশগ্রহণ বলতে শুধু কোন কাজের খরচের অংশ বাবদ নগদ বা টাকার বিনিময়ে কিছু বস্তু দেওয়া বা শ্রম দেওয়া বোঝায় না। অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত সব কিছুতেই তাদের স্বার্থ রয়েছে এবং সরকারী অংশ-গ্রহণ শুধুমাত্র প্রয়োজন শুধু তাদের সাহায্য করবার জন্যই।'[22]

সুতরাং যে কোন স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তা সুস্পষ্ট। কার্য্যকরী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমেই জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারকে শাসন চালাতে হয় বিরাট এলাকা জুড়ে। তাই তার পক্ষে স্থানীয় প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং এজন্য যা দরকার তা হল, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং শাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ যার ফলে শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে স্থানীয় এলাকার জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের জন্য।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসকদের কাছে ইহা একটা প্রত্যাহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডগলাস এসমিন্সজার মনে করেন যে এক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন রচনার সময় দূরদৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন মতাদর্শের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যাতে কর্মসূচী রূপায়ণে প্রশাসন যন্ত্রের সুস্পষ্ট ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কেননা আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই প্রশাসকের কাজকর্ম সীমিত করা যায়। আর তার ফলে

আমলাতন্ত্রের বা অন্য কোন দিক থেকে বাধা না পেয়ে প্রশাসনের পক্ষে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সহজ হয়। কিন্তু কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে এই সীমা চিহ্নিত করতে হবে খুব সুস্পষ্ট এবং সুচিন্তিত ভাবে।[23]

অবশ্য শুধু আইন প্রণয়নেই কাজ শেষ হয় না। স্ব-শাসনের জন্য জনগণের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলা সমান গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ যদি তাদের স্থানীয় এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রচলনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হন, তাহলে সেই স্বায়ত্তশাসন যাতে ভালোভাবে চলে তার জন্য আইন প্রণয়নের মূল্য থাকে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে জনগণের স্বার্থে কর্মসূচী রূপায়ণের সুযোগ। এর সদ্ব্যবহারের ফলে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটবে। ভারতবর্ষে গ্রামই জনজীবনের মূল কেন্দ্রে। গ্রাম থেকে গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক সংগঠন—পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত করা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। এই সংগঠনের মূল দায়িত্ব হ'ল জনগণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে রূপায়িত করা। অর্থাৎ স্থানীয় জনগণের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করা—গ্রামীণ জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা— জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এর প্রশাসনিক সংগঠনকে এমনভাবে স্থাপন করা দরকার যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণই তাঁদের যাবতীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরাই নেবেন বা নিতে পারেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলেই এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা সফল ভাবে রূপায়িত হতে চলেছে।

REFERENCES

1. E. Eric Jackson, 'Local Government in England', Civic Affairs, Vol. 12, No. 11, June 1965, P. 23.
2. William A. Robson, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 9-10, P. 574.
3. Encyclopaedia Britannica, Vol. 14, P. 178.

4. T. J. O. Hickey, 'Enemies within and without the Gates', Political Quarterly, April-June, 1966.
5. Dr. Leslie Green quoted by Mohit Bhattacharya, Rural Self-Government in Metropolitan Calcutta, 1965, Asia Publishing House, New York, P. 102.
6. Harijan, July 28, 1946. Harijan Patrika (Bengali), August 4, 1946, P. 188.
7. Ibid.
8. William A. Robson, The Government and Misgovernment of London, George Allen & Unwin, London, 1948, P. 349.
9. A. De Tocqueville, Democracy in America, Vol. I, P. 57.
10. James Bryce, Modern Democracies, Vol. I, Macmillan, London, 1929, P. 150.
11. J. S. Mill, Representative Government, Everyman's Library, 1936, London, P. 348.
12. H. J. Laski, A Grammar of Politics, Allen & Unwin, London, 1960, P. 413.
13. J S. Mill, Ibid , P. 348.
14. A. Huxley, Ends and Means, P. 63.
15. G. D. H. Cole, A Guide to Modern Politics, P. 532.
16. E. M. Marx quoted by A. Avasthi and S. Maheswari, Public Administration, Educational Publishers, Agra, 1969, P. 52.
17. Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 14, P. 179.
18. Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, Asia Publishing House, Bombay, 1963, P. 23.
19. M. V. Mathur and Iqbal Narain, Edited, Panchayati Raj, Planning and Democracy, Asia Publishing House, Bombay, 1969, P. 25.
20. Ibid, P. 58.
21. P. R. Dubhashi, Rural Development Administration in India, Popular Prakashan, Bombay, 1970. P. 111.
22. Report of the Team for the Study of C. P. and NES, Vol. 1, 1957, P. 3.
23. Doglas Ensminger, Democratic Decentralization: A New Administrative Challenge, Indian Journal of Public Administration, July-September, 1961, P. 291.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং পশ্চিমবঙ্গ

প্রাচীন ভারতে পঞ্চায়েত

স্বাধীন ভারতবর্ষে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার ধারণা মোটেই নতুন নয়। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধারণাটির মূল সন্ধান পাওয়া যাবে। স্থানীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ধারণা হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠনের মতই প্রাচীন। সম্ভবত বিশ্বের অন্য যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এটি প্রবীণতর। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই এর মূল রয়েছে; বস্তুত এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এককালে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। পঞ্চায়েত শব্দটির অর্থ কি দেখা যাক। পঞ্চায়েত বলতে সম্ভবতঃ বোঝাতো এমন একটি গ্রাম্য পরিষদ যার সভ্যসংখ্যা গোড়ার দিকে ছিল পাঁচজন। এই পাঁচ বা পঞ্চ শব্দ থেকেই পঞ্চায়েত শব্দটি উদ্ভূত। কিন্তু পরে সব সময় যে এই সংখ্যাটি অপরিবর্তিত রয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং কালে কালে পঞ্চায়েত শব্দটির সংখ্যাগত তাৎপর্য প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এখন প্রশাসনিক অথবা বিচার সংক্রান্ত কাজের জন্য গঠিত জনসাধারণের সভা এই অর্থেই কেবল পঞ্চায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে স্বতস্ফূর্তভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল। কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামাঞ্চলের জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রতিষ্ঠানেরও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে।

আগেকার দিনে বা সাবেকী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল সমগ্র গ্রাম জীবন কেন্দ্রীক। প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা ছিল তার। গ্রাম পঞ্চায়েত তখন জমি বিলি করত। কৃষকদের উৎপন্ন শস্য থেকে খাজনা আদায় করত এবং গ্রামের পক্ষ থেকে সেই খাজনার প্রাপ্য অংশ সরকারকে দিত। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে এক একটি বড় পঞ্চায়েত ছিল। এই বড়

পঞ্চায়েত তার আয়ত্বাধীন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তদারকি করত এবং দরকার হলে তাদের কাজে হস্তক্ষেপও করত। প্রাচীনকালে গ্রামসমূহের সমষ্টিগত বা সাধারণ ব্যাপারে দেখাশুনোর জন্য কয়েকজন করে কার্যনির্বাহক থাকতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোড়ল, হিসাব রক্ষক, চৌকিদার, সীমানা রক্ষক, পুরোহিত, বিদ্যালয় শিক্ষক, জ্যোতিষী এবং গ্রামীণ কারিগর। গ্রামীণ জনসমষ্টির এইসব সেবকরা তাঁদের জনসেবার জন্য পারিশ্রমিক পেতেন। এই পারিশ্রমিক দেওয়া হত শস্যের ভাগ হিসাবে অথবা ভূমিদান করে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রাক ব্রিটিশ যুগে পল্লী প্রশাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চায়েত বা গ্রামসভা। এই গ্রামসভাই প্রধানত প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে দায়িত্বে থাকতেন। কিন্তু কিভাবে এই গ্রামসভা গঠন করা হত সে সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। গ্রামসভার ধরন নানা জায়গায় নানা রকম ছিল। তখনকার দিনে পঞ্চায়েত কীভাবে গঠিত হত স্যার বাবরাটি রিজলে (Sir Berbart Risely) তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায়, গ্রামের মানুষরা সমবেত হতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত একটা মতামত গড়ে উঠত। এই মতামতই তাদেব সবার মতামত হয়ে দাঁড়াতো। সংখ্যাগুরু মতামত বলে কিছু ছিল না, কারণ মতামত যাই হত তা সর্বসম্মত বলে স্বীকৃত হত। তেমনি সংখ্যালঘু মত বলেও কিছু ছিল না। কারণ আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যালঘুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে পরিবর্তিত হত। এই পদ্ধতিকে তাই বরং বলা যেতে পারে সোচ্চার নির্বাচন।[1] সুতরাং পঞ্চায়েত নির্বাচন তখনকার দিনে ছিল অত্যন্ত অনুষ্ঠান বর্জিত, প্রত্যক্ষ এবং সমগ্র গ্রামবাসীর ঘরোয়া ব্যাপার। রাষ্ট্রের অধীন থেকেও পল্লীর জনসমষ্টি তখনকার দিনে সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন। গ্রামের কর্মচারীরা বা এই ধরনের সেবকরা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না, সরকারের দ্বারাও নয়। এবং সরকারী নির্দেশ পালন করতে হলেও তাদের কাজের ধরনই ছিল এমন যাতে নৈতিক দিক থেকে তারা জনমতের প্রভাবে সব সময়ই প্রভাবিত হতেন। কারণ গ্রামবাসীরাই সরাসরি তাদের বেতন দিতেন। মুঘল রাজত্বেও গ্রামাঞ্চলের এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে কাজ করেছে। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়,

ব্রিটিশ শাসনকালে আমাদের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পঞ্চায়েতগুলি তাদের আগেকার ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। তবু এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে Will Durant যে কথা উল্লেখ করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য ও সমর্থনীয়: "The village community in ancient India—the panchayat system—is the pro-type of all forms of self—government and democracy that have ever been evolved in various parts of the world".[1a]

ব্রিটিশ আমল

ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তে আরো লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটিশ আমলেই গ্রামীণ সংগঠনে পুরোপুরি ভাঙ্গন দেখা দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে। ফলে গ্রামীণ জনসমষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন ছিল পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত। এই কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি আইনগত অনুমোদনের অভাবে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তারা হয়ে পড়ে ব্রিটিশ রাজের বলি।

১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরবর্তী একশো বছরে ব্রিটিশ সরকার অবিভক্ত বাংলার গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি পুনর্গঠনে কোন আগ্রহ দেখায়নি। পল্লী চৌকিদারী আইন পাশ হয় ১৮৭০ সালে। এর পর থেকে বাংলায় গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-গুলি নতুন করে চালু করা হয়। কিন্তু এটা আসলে ছিল গ্রামাঞ্চলে পুলিশী ব্যবস্থা রাখার একটা কৌশল। সে সময় এক-একটি গ্রাম ছিল এক-একটি ইউনিট। এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে পরবর্তীকালে বাংলায় ইউনিট বলতে সাধারণতঃ বোঝাত দুই বা তিনটি গ্রামের সমন্বয়।

১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইন অনুযায়ী গঠিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আসলে ছিল একটি কৃত্রিম সংস্থা। এই পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রাম-বাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের নিযুক্ত করতেন। তা ছাড়া সমষ্টির সাধারণ স্বার্থবিধানের জন্য এই আইন রচিত হয়নি। এই

আইনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু গ্রামাঞ্চলের অপরাধ নিবারণ করা। এই আইনের মাধ্যমে ৬০টির বেশী বাড়ী রয়েছে এমন যে কোন গ্রামে পঞ্চায়েত নিয়োগের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অন্যূন পাঁচজন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হত।[2] গ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পঞ্চায়েত দায়ী থাকত। গ্রামের কোথাও কোন অপরাধ ঘটলে পঞ্চায়েতকে তা জানাতে হতো থানার পুলিশের কাছে। এদিক থেকে আইনটি ছিল খুবই সীমিত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা নিযুক্ত এই পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় কর ধার্যকরণ ও সংগ্রহের যন্ত্রস্বরূপও কাজ করত। আর এই স্থানীয় কর আদায় করা হত গ্রামের পুলিশের ভরণপোষণের জন্য, গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ক কাজকর্ম চালাবার জন্য নয়। পঞ্চায়েতগুলি খুব সীমিত উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবে গণ্য হত। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানীয় সরকারী কাজকর্মের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ক কাজকর্ম, যেমন রাস্তাঘাট, পুকুর, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেলফ-গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ইউনিয়ন কমিটি নামে পৃথক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্লাডষ্টোন-যুগের প্রকৃত উদারপন্থী লর্ড রিপনই ছিলেন প্রথম ভাইসরয়, ভারতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে যার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য তিনি একটা বিস্তৃত প্রকল্প রচনা করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংস্কারকে তিনি ভাইসরয় হিসেবে ভারতে তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশদের দ্বারা এদেশে শিক্ষা, সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রবর্তনের ফলে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশা ভারতীয়দের মনে সৃষ্ট হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে 'রাজনৈতিক এবং লোকশিক্ষার হাতিয়ার'[3] বলে মনে করতেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ ইংরেজীর ১৮ই মে ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে রিপণের প্রস্তাবটি পাশ হয়। এই প্রস্তাবে যেসব নীতি গৃহীত হয়েছিল তাতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের

প্রচেষ্টা ও আগ্রহ লক্ষণীয়। ঐ প্রস্তাবে আমরা দেখতে পাই, স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক কাজ হবে রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়েও এর গুরুত্ব বেশী (পঞ্চম অনুচ্ছেদ)। মিউনিসিপাল বোর্ডের অনুরূপ গ্রামীণ পরিষদ স্থাপন করা। প্রশাসনিক ইউনিট হবে ছোট-মহকুমা, তহশীল বা তালুক (দশম অনুচ্ছেদ)। সমস্ত পরিষদেই দুই-তৃতীয়াংশের বেশী বেসরকারী সদস্য থাকবেন; যেখানে সম্ভব এই সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শহরগুলিতে অবিলম্বে নির্বাচন শুরু হবে। পরে ক্রমে ক্রমে এবং পরীক্ষামূলক ভাবে ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে (অনুচ্ছেদ 12, 13, 14)। পরিষদগুলির ওপর ভেতরের চেয়ে বাইরের নিয়ন্ত্রণই বেশী থাকবে (অনুচ্ছেদ 17)। যেখানে সম্ভব স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যান বেসরকারী ব্যক্তি হবেন (অনুচ্ছেদ 18)। শেষ পর্যন্ত এও স্থির হয় যে প্রতিটি প্রদেশ তার স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এই প্রস্তাবের সাধারণ নির্দেশগুলি ব্যাখ্যা করবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার আগেই লর্ড রিপন এদেশ থেকে চলে যান এবং তার স্থানে ভাইসরয় হিসাবে আসেন লর্ড কার্জন। কার্জন ছিলেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ঘোর বিরোধী। তাছাড়া তৎকালীন ভারত সরকারের জট পাকানো প্রশাসনিক কাঠামো এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির অনিচ্ছার দরুন কেন্দ্রীয় সরকার রিপনের স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাবটি কার্যকর করতেও সক্ষম হয়নি। ফলে পরবর্তী কয়েক দশক এই উদার প্রস্তাবটি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার স্তরেই রয়ে গিয়েছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনে স্থানীয় সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে এতদিন ধরে ব্রিটিশ ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত কাজকর্ম অব-হেলিত হচ্ছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রথম সরকারী আইন হল ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন। এই আইনে তিন স্তরের সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়:

(1) জেলা পরিষদ
(2) স্থানীয় পরিষদ এবং
(3) ইউনিয়ন কমিটি

প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে জেলা পরিষদ গঠন এই আইনে বাধ্যতা-মূলক করা হয়। প্রতিটি মহকুমার জন্য কয়েকটি স্থানীয় পরিষদ বা একটির বেশী মহকুমার জন্য একটি অথবা কোন মহাকুমার একটি অংশের জন্য একটি পরিষদ গঠনের সংস্থান এই আইনে রাখা হয়। কিন্তু স্থানীয় পরিষদের স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার এবং আয়ের সূত্র ছিল না। জেলা পরিষদ যে সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করত, স্থানীয় পরিষদগুলি কেবল সেগুলি প্রয়োগ করতে পারত। এগুলি অনেকটা জেলা পরিষদের অঙ্গ ছিল এবং জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটি হিসেবে কাজ করত। এটা তাই "বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনরূপী গাড়ীর পঞ্চম চাকা'[4] হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং ১৯৩৬ সালের সংশোধনী আইন অনুযায়ী স্থানীয় পরিষদ বিলোপের জন্য ১এ ধারাটি সংযোজিত হল। অবশ্য ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন বলবৎ হওয়ার আগে পর্য্যন্ত কয়েকটি স্থানীয় পরিষদ কাজ চালাচ্ছিল যেমন দার্জিলিং জেলায়।

এই আইনে কোন একটি গ্রাম বা গ্রামসমষ্টির জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন কমিটির কাজ স্থানীয় পুষ্করিনী, বিদ্যালয় ও রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করা। এগুলি ছিল জেলা পরিষদের অধীন এবং অর্থের জন্য জেলা পরিষদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল।

সুতরাং গ্রামপর্যায়ে এ সময় দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল, ১৮৭০ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন কমিটি। এভাবে সেই ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদকে প্রশাসনের ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা হয়। স্বায়ত্তশাসনের এই যে সূচনা এটা সঠিক হয়নি। কারণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শুরু হওয়া উচিত নীচে থেকে, ওপর থেকে নয়।

লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকা কালে (১৮৯৮-১৯০৪) শাসনপদ্ধতি ছিল অতি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত। কারণ লর্ড কার্জনের ধারণা ছিল, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মত সীমিত ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। কার্জন

প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন রোধে মর্লি (Morley) বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করলেন ১৯০৭ সালে। হবহাউস (Hobhouse) হলেন এর চেয়ারম্যান। অন্যান্য সুপারিশ ছাড়া কমিশন চৌকিদারী এবং অন্যান্য স্থানীয় কাজকর্মের ভার একটি একক গ্রামীণ সংস্থার ওপর দেবার জন্য সুপারিশ করলেন। কমিশনের মন্তব্য ছিল, সর্বনিম্ন স্তর থেকে গড়ে তোলার দরুনই প্রচলিত গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার এই ব্যর্থতা। কমিশন তাই সুপারিশ করলেন, গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে এক একটি গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে একটি কৃত্রিম ইউনিয়ন নয়। তা না হলে এই শাসনব্যবস্থায় জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সুদৃঢ় প্রশাসনরূপী অট্টালিকা গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তি হিসেবে থাকবে গ্রাম। কারণ গ্রামের প্রাচীনতা নতুন প্রশাসনিক এলাকা থেকে অনেক বেশী। তাছাড়া গ্রামে সবাই সবাইকে চেনেন। কমিশন আরো সুপারিশ করলেন, বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে এবং জনগণকে প্রশাসনের কাজে জড়িত করবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় বিষয়ক প্রশাসন পরিচালনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের প্রয়াস চালানো দরকার।[5]

কমিশনের প্রতিবেদনটি নানাদিক থেকে মূল্যবান। প্রথমতঃ, এই প্রতিবেদনে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সুদক্ষ পল্লী প্রশাসন গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে এতে বিস্তৃতভাবে সমীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু কমিশনের সুপারিশগুলি করা হয়েছিল বিশেষ করে প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশ কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করবার প্রকৃত আগ্রহ এই কমিশনের ছিল না।

বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েক বছর পর বাংলা সরকার ১৯১৪ সালে একটি জেলা প্রশাসন কমিটি গঠন করেন। জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় চলতি অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা এবং এই ব্যবস্থাকে কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করাই ছিল এই কমিটির কাজ। কমিটি দেখলেন ইউনিয়ন কমিটি এবং চৌকিদারী পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত গ্রামীণ বিষয়ক প্রশাসন ভালোভাবে চলছে না। কমিটি আরো দেখলেন এই দুই সংস্থার কাজকর্ম নানাদিক থেকে একই রকম।

তাছাড়া তাদের যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কমিটি তাই সুপারিশ করলেন, পল্লী অঞ্চলের শাসনের জন্য এমন এক প্রশাসন কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যে ইউনিয়ন কমিটি ও চৌকিদারি পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যুক্তভাবে বর্তাবে এবং যাতে একটি পল্লী বিচারব্যবস্থাও থাকবে। জেলা প্রশাসন কমিটির সুপারিশ মত পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা চালু করবার জন্য ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ করা হয়। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই আইনটি কমিটির সুপারিশমত হয়নি। প্রশাসনের ইউনিট হিসেবে ধরা হয়েছিল ইউনিয়নকে এবং ইউনিয়ন বোর্ড ছিল প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ গ্রামকে ইউনিট হিসাবে ধরা হয়নি, ধরা হয়েছে ইউনিয়নকে। আর ইউনিয়ন হল 'বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গ্রামের কৃত্রিম সংযোজন'।[6] অবশ্য জেলা প্রশাসন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৭০ সালের আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালের আইনে ইউনিয়ন কমিটির কাজ ইউনিয়ন বোর্ডে ন্যস্ত হয়। গ্রামবাসীদের সমষ্টিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় কর নির্ধারনেরও ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন চালু হওয়ার পর উল্লিখিত দুই আইনের ধারাগুলি বাতিল করা হল। স্বায়ত্তশাসনকে পল্লীবাসীদের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাবার জন্য এই আইনে সরকার এবং জনগণের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ইউনিয়ন পিছু একজন করে সার্কেল অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হল। এই সার্কেল অফিসার[7] হলেন মহকুমা প্রশাসন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় বিচার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এই আইনে ছোটখাটো ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং ছোট ছোট দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য ইউনিয়ন কোর্ট গঠনের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে থেকে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল।[8]

ব্রিটিশ ভারতে তৎকালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে জেলা বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য হয়ত সফল হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বাংলার পল্লী-বাসীদের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হলেও

জেলা পরিষদ পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বা দুঃখকষ্ট লাঘব করতে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তাদের কাজ সীমিত ছিল প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা, জল সরবরাহ, সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে। কর্মী ও অর্থের স্বল্পতার দরুন জেলা এবং ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে পল্লীবাসীদের ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান অর্জনের উপযোগী সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই ধরনের উন্নতির জন্য আসলে গ্রামবাসীদের নিজেদের আগ্রহ এবং ক্রমাগত সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। সরকারী দপ্তর বা জেলা বোর্ড অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের পক্ষে গ্রামবাসীদের একত্রিত করা এবং কিভাবে গ্রামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা যায় তা বুঝিয়ে বলা মুশকিল হত। সুতরাং এটা সকলেই অনুভব করেছিলেন, জনগণকে জড়িত করবার জন্য চাই এমন একটি সংস্থা প্রত্যেক পল্লীবাসীই হবেন যার সদস্য এবং এই সংস্থাটি হবে স্বশাসিত।

স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েত

এরপর ব্রিটিশ যুগের অবসান হল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন এলো। ব্রিটিশ ভারতে পল্লীবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সহজভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্দেশে তা নিয়ন্ত্রিত হত। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের হাতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তর আসলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের জন-প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনের চাবিকাঠি অর্পণ। গণতন্ত্রের সুফল অবশ্য রাজ্যস্তরের নীচে এখনো পৌঁছুতে পারেনি। সংবিধান রচয়িতারা যে কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রগঠনকে জাতীয় লক্ষ্যরূপে স্থির করেছিলেন তার মূলে ছিল এই উপলব্ধি যে অতি দ্রুত (জ্যামিতিকক্রমে) জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং গণতন্ত্রের মূল নিম্নতর স্তরে গভীরভাবে প্রসারিত করতে হলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। এরপরে স্বাধীন ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নব পর্যায়ের ইতিহাস শুরু হ'ল।

ব্রিটিশ শাসনে পল্লীর জনসমষ্টির মধ্যে যে ক্রমঅবক্ষয় ঘটে তার ফলে পল্লীর পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে যায়। বর্তমান শতাব্দীতে গান্ধীজিই

প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চান। স্বাধীনতার পর তাই ভারতীয় নেতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখাতে থাকেন। স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজির সংগ্রামের ভিত্তি ছিল শহর নয়, পল্লী। তিনি 'স্বরাজের' যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত। তিনি বারবার বলেছেন:

'গ্রাম-স্বরাজ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল এই যে, এটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সাধারণতন্ত্র যে তার নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে প্রতিবেশী গ্রামের ওপর নির্ভর করবে না, অথচ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতায় সংযুক্ত হবে। পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত গ্রামের শাসন চালাবেন। নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রামের বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ প্রতিবছর এই পঞ্চায়েত নির্বাচিত করবেন। এই পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয় সব কর্তৃত্ব ও অধিকারই থাকবে।............ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে এখানে থাকবে এক পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত গণতন্ত্র'।[9] বস্তুত গ্রামগুলি স্ব-শাসিত ইউনিট হিসেবে—ভারতীয় কৃষক গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে,—প্রশাসন-পিরামিডের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

গান্ধীজির নিকট পূর্ণাঙ্গ পঞ্চায়েত গণতন্ত্র রামরাজ্যের সমার্থক। তাঁর কল্পিত রামরাজ্যের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

'ধর্মগত দিক থেকে একে বলা যেতে পারে এই ভুবন ঈশ্বরের রাজ্য। রাজনৈতিক দিক থেকে রামরাজ্য হবে এক পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র যেখানে সম্পত্তি, বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত অসাম্য দূর হয়ে যায়। এখানে ভূমি এবং শাসনব্যবস্থা থাকে জনগণের হাতে। বিচার ব্যবস্থা হবে দ্রুত, নিখুঁত এবং সস্তা। সুতরাং সেখানে আছে ধর্মাচরণ, বাক্‌প্রকাশ এবং সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা আর এসবের মূলে থাকবে নৈতিক আত্ম-সংযমের স্ব-আরোপিত আইনের শাসন। এরকম রাষ্ট্র সত্য ও অহিংসার ওপর ভিত্তি করে এবং সমৃদ্ধ, সুখী এবং স্ব-নির্ভর গ্রাম ও জনসমষ্টি নিয়ে এগুলি গঠিত হবে'।[10]

আগেই বলা হয়েছে, গান্ধীজি ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐতিহ্যের পুণরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। সুতরাং খসড়া সংবিধানে গ্রামকে সঠিক স্থান দেওয়া হয়নি জেনে তিনি মর্মাহত হলেন এবং বললেন, 'আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে

হবে, আমি কনষ্টিটিউয়্যাণ্ট অ্যাসেম্বলীর কার্যধারা অনুধাবন করতে পারিনি।… সংবাদ দাতা জানিয়েছেন, সংবিধানের যে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে তাতে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ বা নির্দেশিকা রাখা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিচ্যুতি, এর প্রতি অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা যত বেশী হবে জনগণের পক্ষে ততই মঙ্গল।'[11]

খসড়া সংবিধানে পঞ্চায়েতকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগের জবাবে ডঃ আম্বেদকরের মন্তব্য হল—'আমি মনে করি এই গ্রাম সাধারণতন্ত্রগুলি (Republics) ভারতের অধঃপতন ঘটিয়েছে। আমি বিস্মিত যে যাঁরা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করেন তাঁরাই এর সমর্থকরূপে এগিয়ে এসেছেন। আঞ্চলিকতা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া গ্রামে আর কি আছে? খসড়া সংবিধানে গ্রামকে বাতিল করে ব্যক্তিকে ইউনিট হিসেবে ধরা হয়েছে বলে আমি আনন্দিত।'[12] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কালমার্ক্সের মত ডঃ আম্বেদকরেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজকেন্দ্রের প্রতি আস্থা ছিল না; কারণ তিনি এগুলিকে আঞ্চলিকতা এবং অজ্ঞতার লালনক্ষেত্র বলে মনে করতেন।

অনেক সমালোচনা ও বাকবিতণ্ডার পর কনষ্টিটিউয়্যাণ্ট অ্যাসেম্বলীর প্রেসিডেণ্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিষয়টি সাংবিধানিক উপদেষ্টা ডঃ বি. এন. রাও-এর কাছে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরো কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সংবিধানের নতুন করে খসড়া করা সম্ভব কিনা। ডঃ রাও উত্তর দিলেন, পঞ্চায়েত পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত করতে হলেও প্রতিটি রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক ও বিস্তৃতভাবে এই পরিকল্পনা স্থির করতে হবে এবং শহরগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তনও করতে হবে। এসব করতে গেলে সময় লাগবে, আর তার ফলে সংবিধান পাশ করতে দেরী হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর অভিমত হল, সংবিধান পাশ হয়ে যাবার পর পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি সহায়ক আইন পাশ করিয়ে নিলেই চলবে।

যাই হোক, ভারতীয় সংবিধান রচয়িতারা কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর ভিত্তি করে পুরো প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলেন নি। কনষ্টিটিউয়্যাণ্ট অ্যাসেম্বলীর যে এক বৃহৎ সংখ্যক সদস্য পঞ্চায়েতী রাজ-এর সংস্থানসহ সংবিধান গড়ার আশা পোষণ করতেন তাঁদের মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার

ফলে যেমন একদিকে এসমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটল তেমনি অপর দিকে স্বাধীন ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের একটি নতুন ধারার সূচনা হল। বোধহয় এই নতুন ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক অধিকার—গ্রামবাসীদের ইহা একটি বড় অধিকার। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (রাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত নির্দেশিকায়) পঞ্চায়েতের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়: 'রাষ্ট্র গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা নেবে এবং এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে তার জন্য এগুলির হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করবে।'[13] এভাবে সংবিধানের সমগ্র ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদই কেবল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সংবিধানের সপ্তম তপশীলে ২নং তালিকায় স্থানীয় শাসনের আর একবার উল্লেখ আছে। স্থানীয় সরকারকে এই তপশীলের তালিকায় রাজ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকার পাঁচ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় সরকার অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা পল্লী প্রশাসনের উদ্দেশ্য পৌর কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, জেলা পরিষদ, খনি উপনিবেশ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গঠন ও ক্ষমতা।'[14] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও বলা হয়েছে, 'যেহেতু রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলির পক্ষে প্রতিটি গ্রামবাসীর নিকট পৃথক-ভাবে পৌঁছুনো সহজ নয়, সেহেতু গ্রামের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে একটি সক্রিয় সংস্থার উপর যে সংস্থা প্রশাসনের সহযোগিতায় জনগণকে এক সাধারণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসবে।'[15]

স্বাধীনতার পর স্থানীয় সংস্থাগুলি কেবল গ্রামাঞ্চলের ছোটখাটো প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত কাজ করবে এই পুরানো ধারণার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। পঞ্চায়েতগুলি এখন গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের কার্যকরী মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বনিয়াদ হিসাবে গণ্য করা শুরু হল। পল্লীগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের ব্রত নিয়ে ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা হল। উদ্দেশ্য গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্যসাধন এবং উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের দ্রুত সম্প্রসারণ। সংক্ষেপে পল্লীর জনসমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি সাধনই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প হল এমন এক সরকার অনুমোদিত প্রকল্প যা জনসমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং সম্ভব হলে তাদের উদ্যোগে সমগ্র জনসমষ্টির জীবন যাত্রার

মান উন্নয়নে প্রয়াসী। এই কর্মসূচী রূপায়ণে গণসংস্থাগুলিকেই সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল কেননা এই জনসংস্থার মাধ্যমই কেবল স্বয়ং-সেবা এবং স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে স্থানীয় মানবিক এবং বৈষয়িক সম্পদ সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে পঞ্চায়েতের বৃহত্তর ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের একটি সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে গ্রামের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে গ্রামীণ সংস্থা দায়িত্ব না নিলে গ্রাম জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটানো কঠিন হবে। কারণ গ্রামের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে গ্রামীণ সংস্থার পক্ষেই কেবল প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব।...আইনগত ব্যবস্থা যে সাহায্য করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের অবস্থার উন্নতি এবং সমবেত প্রয়াসের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের উৎসাহ জাগিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত পল্লীর বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে তাদের সর্বাধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করাতে পারে।[16] এই পরিকল্পনাকালে ভারতের অনেক রাজ্যেই নতুন করে পঞ্চায়েত গঠন করা হয় এবং প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে ব্লক উপদেষ্টা কমিটি (পরবর্তীকালে ব্লক উন্নয়ন কমিটি) স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও জেলার মধ্যেই একটি সুগঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।[17]

এভাবে ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম, ব্লক এবং জেলা স্তরে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এই পুর্ণবিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়া এবং চিরাচরিত কাজকর্ম ছাড়াও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।

মেহতা কমিটি

মেহতা কমিটি সমীক্ষা শুরু করবার আগে গত তিন বছর ধরে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পরেনি বা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। কারণ সরকারের আর পাঁচটা সংস্থার মতো সমষ্টি উন্নয়নও ছিল সরকারের বিভাগীয়

একটি প্রকল্প। মেহতা কমিটির প্রতিবেদনে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যোজনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পর্কিত কমিটি শ্রীবলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় উন্নয়ন সেবা প্রকল্প সম্পর্কে খতিয়ে দেখবার জন্য একটি সমীক্ষক দল গঠন করেন। সমীক্ষকদলের কাজ ছিল, সমষ্টি উন্নয়নের কর্মসূচীর কাজকর্ম পর্যালোচনা করা এবং আরো দ্রুত যাতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ চলে তার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মপ্রণালী সম্পর্কে সুপারিশ করা। সমীক্ষক দল ১৯৫৭ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করেন। সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর সমীক্ষক দলটি তাদের রিপোর্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে সমীক্ষক দলের মন্তব্যের সারাংশ উল্লেখ করা যেতে পারে।

'স্বীকার করতেই হবে, সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে খুব একটা সফল হয়নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরের স্তরে খুব অল্প সংখ্যক স্থানীয় সংস্থাই এ কাজে আগ্রহ দেখিয়েছে। এমনকি পঞ্চায়েতগুলিও এক্ষেত্রে খুব একটা কাজে নামেনি। সাময়িক ভিত্তিতে সংস্থাগুলি গঠিত হয়েছে মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা এবং এগুলি মূলতঃ উপদেষ্টা পর্ষদ হিসেবে কাজ করে থাকে। এই সংস্থাগুলি এ পর্যন্ত কোন জীবনীশক্তির ইঙ্গিত বহন করেনি। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য অনুপ্রেরণা বা শক্তি জোগাবার প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের পরিচয়ও তারা দেখাতে পারেনি।' প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, 'স্থানীয় এলাকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যাতে স্থানীয় উন্নয়নে অর্থ ব্যয় হয় তা দেখবার জন্য এবং যথেষ্ট ক্ষমতা নিয়ে এ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করার দায়িত্ব অর্পণের জন্য এক দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করা পর্যন্ত উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কখনো স্থানীয় জনগণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং তাদের উদ্যোগী করে তুলতে পারবো না।'[18] প্রতিবেদনে এই মন্তব্যের কারণ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু হবার কয়েক বছরের মধ্যেই এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের উদ্যোগ পল্লীবাসীদেরই নিতে হবে। এই ভাবনা থেকেই স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতী রাজের নতুন করে বিকাশ লাভ করল। পঞ্চায়েতী রাজের

বিবর্তনের ইতিহাসে মেহ্‌তা কমিটির প্রতিবেদন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সংবিধানে যা ছিল কেবল মাত্র নির্দেশমূলক নীতি। মেহ্‌তা কমিটির প্রতিবেদনে তার বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত হল।

সমীক্ষকদল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য ত্রিস্তর কাঠামোর প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করেন, গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ১৯৫৮ সালের ১২ই জানুয়ারী মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত রাজ্যই পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সম্মত হয়।

এ কথা সত্যি যে সমস্ত রাজ্যই গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রাজী হল। কিন্তু পরে দেখা গেল ভারতের মত বিরাট দেশে সমস্ত রাজ্যে একই ধরনের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা উচিত হবে না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রীয় পর্ষদ এ কথা উপলব্ধি করেই সুপারিশ করলেন, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক আদর্শ এক রকম হলেও এর সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন রকম কঠোর ও বাঁধা ধরা নিয়ম থাকা উচিত নয়। বস্তুত আমাদের দেশ এত বড় এবং পঞ্চায়েতী রাজ বিষয়টির এত সুদূর প্রসারী গুরুত্ব রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের এবং বিকল্প সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিপূর্ণতম সম্ভাবনা এতে রয়েছে। যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জনগণের হাতে শাসন ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তর। এই ক্ষমতা হস্তান্তর সুনিশ্চিত করা গেলে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থা অনুযায়ী পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ বিভিন্ন হতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পর্ষদের এই সুপারিশ এ ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণ করতে অনেকটা সহায়তা করেছে। এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত রাজ্যে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর দেওয়া হয়নি। বরং কয়েকটি মৌল নীতির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের স্থানীয় অবস্থানুযায়ী সুবিধাজনক পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই মৌল নীতির কয়েকটি হল এই :

(ক) গ্রাম থেকে জেলাপর্যায়ে এক ত্রিস্তর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা গঠন করতে হবে। প্রতিটি স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সাংগঠনিক সংযোগ থাকবে।

(b) এই সংস্থাগুলির হাতে ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের প্রকৃত হস্তান্তর ঘটবে।

(c) এই দায়দায়িত্ব পালনের জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ হস্তান্তর করতে হবে।

(d) সমগ্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কাঠামোটি এমন হবে যার দ্বারা ভবিষ্যতে ক্ষমতা ও দায়িত্বের আরো বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো সম্ভব হবে। পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই এক্ষেত্রে বাস্তবানুগ হয়েছে। কারণ পঞ্চায়েতী রাজের ধারণা ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই কোন নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার কাঠামো কি হবে তা চূড়ান্তভাবে বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। পিরামিডের আকারে এই ত্রি-স্তরের মধ্যে ভিত্তিমূলে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। দুটি বা তিনটি গ্রাম নিয়ে এগুলি গঠিত। শীর্ষস্তরে ছিল জেলা পরিষদ। এক একটি জেলা নিয়ে জেলা পরিষদের গঠন। আর এই দুই স্তরের মাঝখানে ছিল ব্লক সমিতি। ব্লক সমিতির এক্তিয়ার ছিল সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের সমপর্যায়ে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ছিল অবশ্য আলাদা। বর্তমান শতাব্দীর বিশ দশক থেকে বাংলার গ্রামে স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা অতি সুষ্ঠুভাবেই কাজ করে আসছিল। ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছিল। তাই এটা তুলে দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলন করা সমীচীন হবে কি-না এটা সরকারের মনে সন্দেহ জেগেছিল। সেজন্য সরকার পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনে ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় ১৯৫৬ সালে। কিন্তু এখানে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৫০ সাল থেকে। উদ্দেশ্য—পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রামবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহের পরিমাপ করা। সাত আটশত লোক বসবাস করে এমন একটা গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত হবে। গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে হাত তুলে ভোট দিয়ে ঐ পঞ্চায়েতে নয়জন সদস্য ও একজন সভাপতি নির্বাচন করতেন। অফিস খরচা ও গ্রামোন্নয়ন

বাবদ ঐ পঞ্চায়েতকে দেওয়া হত একশত টাকা। ঐ টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামবাসীদের চাঁদা ও কায়িক পরিশ্রম। পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েত কোন আইনগত সংস্থা নয়। তাই এরা কাজ করেছে ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ত্বাধীনে। ফলে সেখানে পথঘাট সংস্কার ও পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি হয়েছে অনেক। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর ব্লক, বীরভূম জেলায় মহম্মদ বাজার, সাঁইথিয়া ও লিহাটি ব্লক, বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় ও গুসখরা ব্লক, মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম ব্লক এবং নদীয়া জেলায় ফুলিয়া ব্লকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল। এই পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য রাজ্যের পঞ্চায়েতী পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা' কাজে লাগিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন প্রণয়নে।

সুতরাং এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধরনও কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় ত্রিস্তর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বদলে চার স্তরের পঞ্চায়েতী রাজ গঠিত হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন বোর্ড চালু ছিল। এগুলি স্বাধীনতার অনেক আগেই ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক সমিতি পশ্চিমবঙ্গে যার নাম আঞ্চলিক পরিষদ, তার মাঝখানে পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রায় সমপর্যায়ের অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। অনেক ইউনিয়ন বোর্ডই জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দেয়া হয়নি। এ রাজ্যে তাই নতুন পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এই পুরোনো সংস্থাগুলির সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের একটি পৃথক ধরন গড়ে ওঠে যা প্রধানত চার স্তরের। এর সর্বনিম্নে রয়েছে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ। আর এই দুয়ের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অঞ্চল পঞ্চায়েত, এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ।

বলবন্ত রায় মেহতা সমীক্ষকদল পরিকল্পিত এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংশোধিত এই পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় ১৯৫৮ সালে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী আইন (১৯৫৭) অনুসারে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আওতাভুক্ত এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ড পর্যায়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত এই দ্বি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। এরপর ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ যুক্ত হয়। ১৯৬৩ সালের আইনের উদ্দেশ্য ছিল, উন্নয়নের কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জড়িত করা এবং 'পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।'[১৬] সংক্ষেপে ১৯৬৩ সালের আইনের তিনটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল :

(a) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ,

(b) স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচী এবং

(c) পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ।

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে ১৯৫৭ সালের এবং ১৯৬৩ সালের আইন দুটি প্রবর্তনের ফলে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনের একটা নতুন রূপ ধারণ করল। পশ্চিমবঙ্গে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এতদিনের অনেক জটিলতা কমিয়ে এনে আনুপাতিকভাবে অনেক সরলীকরণ নির্দেশিত হল। একথা সত্যি যে আমাদের মত বিরাট দেশে সুদূর গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন দিল্লী বা কলিকাতার কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হতে পারে না। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাইই এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রামবাসীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা খুব দরকার। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ—এই নীতির ওপরেই গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং গ্রামীণ জনগণ যারা সংখ্যায় দেশের সর্বাধিক তাদের অবহেলা বা উপেক্ষা করা যায় না। গণতন্ত্র যাতে পল্লীবাসীদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য চাই গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী। গ্রামাঞ্চলের শাসন পরিচালনায় পল্লীবাসীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে এবং নগদ অর্থে এবং শ্রম বা অন্যভাবে সাহায্য বা দানের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে পল্লীর জনগণকে আত্মবোধে জাগ্রত করতে এবং তাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশলাভে সাহায্য করে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলি গঠিত হয়েছিল। প্রথমদিকে উচ্চতর স্তরের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির নিম্নতর স্তরের সংস্থাগুলির পারস্পরিক সংযোগ ছিল না। ফলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ছিল। পুরানো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মতই প্রায় জেলা পরিষদগুলি কাজ করছিল। আঞ্চলিক পরিষদের কাজকর্মও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। আগে ইউনিয়ন বোর্ড যা কাজ করত অঞ্চল পঞ্চায়েতের তার চেয়ে বেশী কিছু কাজ ছিলনা। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, ইউনিয়ন বোর্ডের মত গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজের কোন দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়েতের ছিলনা। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর কিন্তু সুস্পষ্ট কারণেই গ্রাম পঞ্চায়েত শুধু নামেই টিকে ছিল। সংক্ষেপে বলা চলে, ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালের আইন দুটি যথেষ্ট মনে হয়নি। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এই আইন দুটির প্রকৃত রূপায়ণের ব্যাপারে কতটা আশান্বিত হয়েছে তা প্রশ্নের বিষয়।

REFERENCES

1. Sir Herbert Risley quoted by J. P. Suda, Indian Constitutional Development, Jai Prakash Nath and Co., 1960, Merrut, P. 487.

1a. Will Durant quoted by S. R. Nigam, Local Government, S. Chand & Co., New Delhi, 1978, P. 216.

2. Sec. III, Village Chowkidari Act, 1870.
3. Resolution on Local Self-Government, May 18, 1882, Para 5.
4. N. C. Roy. Rural Self-Government in Bengal, University of Calcutta, 1936, P. 61.
5. Report of the Royal Commission on Decentralization, 1909, Para 699.
6. N. C. Roy, op. cit., P. 151.
7. সার্কেল অফিসারগণ ছিলেন রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের সদস্য। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারকি করবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আগে সার্কেল অফিসার নিয়োগ করা হত। 1919 সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন কয়েকটি ইউনিয়নের জন্য একজন করে সার্কেল অফিসার নিয়োগের প্রথা সর্বপ্রথম চালু করে। বি. ডি. ও এবং জয়েন্ট বি. ডি. ও এখন সার্কেল অফিসারের কাজ করেন।
8. Union Board Manual, Vol. I, West Bengal Government Press, 1955, Alipore, Part II, Chapter VII.

9. Harijan, July 26, 1942.
10. The Hindu, Madras, 22. 6. 1944.
11. Harijan, December 21, 1947.
12. Constituent Assembly Debates, November 4, 1948, as quoted in Panchayati Raj as the basis of Indian Polity, P. 4, AVARD, New Delhi, 1962.
13. Art. 40, The Constitution of India.
14. The Constitution of India.
15. The First Five Year Plan, The Government of India, Planning Commission, 1952, P. 133.
16. Ibid, PP. 138-41.
17. Second Five Year Plan, Government of India, Planning Commission, 1957, P. 162.
18. Report of the Team for the Study of Community Projects and National Extension Service, Vol, I, P. 5.
19. West Bengal Zilla Parishads Act, 1963, P 1.

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ : পুরাতন ব্যবস্থা

১৯৫৭ সালের আইন : গ্রাম পঞ্চায়েত

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানটির মূল কাঠামোতে ছিল চারটি স্তর। বুনিয়াদী বা সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পরিষদ, আর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরে পুরাতন ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গে 15টি জেলা পরিষদ, 325টি আঞ্চলিক পরিষদ, 2,926টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং 19,662টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। এইসব গ্রামের মোট 2,57,41,593 জন মানুষ পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার আওতায় এসেছিলেন।[1] প্রতি 1,300 জন লোকের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রতি 10,000 লোকের জন্য একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। গড়ে প্রায় 7 থেকে 10টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ছিল এক একটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকা। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তখন ছিল 335টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক। এর সবগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল না। ব্লক পর্যায়ে মাত্র 325টি আঞ্চলিক পরিষদ ছিল। এর কারণ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার কয়লাখনি এবং শিল্পাঞ্চলের 10টি ব্লকে এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়নি। কয়লাখনি এবং শিল্প কারখানা থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ অঞ্চলে জীবিকার্জনের তাগিদে বহুলোক এসেছে। গড়ে উঠেছে এখানে তাদের অস্থায়ী আস্তানা। এসব দিক বিবেচনা করে রানীগঞ্জ এবং তার পার্শ্ববর্তী নয়টি ব্লককে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের বাইরে রাখা হয়েছিল। এই ব্লকগুলি তার বদলে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

১৯৫৭ সালের আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রামসভা একটি বিধিবদ্ধ সাধারণ সংস্থা। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা গ্রামসভা গঠন করতেন এবং এর এলাকা, নাম এবং এক্তিয়ার স্থির করে দিতেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল ঐ গ্রাম-

সভার কার্যনির্বাহক পরিষদ। আর গ্রামসভা ছিল সেইসব গ্রামবাসীদের নিয়ে গঠিত সাধারণ সংস্থা যাদের নাম চলতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় ছিল।[৪] সুখের কথা, বিধান সভার নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা গঠনেও তা সর্বপ্রথম চালু করা হয়। উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েতী আইনে দেখা যায়, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক লোক গ্রামে থাকেন এবং সেইসব গ্রামে যাদের বাড়ী আছে তাঁরাই ভোট দেবার অধিকারী।[৪] কিন্তু এই নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা তৈরী করেন এক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিহার আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। সেখানে 21 বছর বা তার উর্ধে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কই ভোটার হবার যোগ্য এবং এই ভোটার তালিকা পঞ্চায়েতের নির্দেশে তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের পরিদর্শক কোন নির্দিষ্ট এলাকায় গ্রামসভার জন্য সেই এলাকায় বিধানসভার ভোটার তালিকা থেকে সময়ে সময়ে ভোটার তালিকা তৈরী করতেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েতের এধরনের তালিকা রাখার অধিকার ছিল না।

গ্রামসভার কোন প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে হত না। এটা ছিল শুধু সুপারিশকারী সংস্থা মাত্র। তবে পঞ্চায়েতী আইনে এর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার দেয়া হয়েছিল। গ্রামসভার সদস্য সংখ্যা সাধারণত 1000 থেকে 1400 জন ছিল। তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী 9 থেকে 15 জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাঁদের কার্যনির্বাহক পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করতেন।

১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনের একটি বিধিবদ্ধ ধারা মতে প্রতিটি গ্রামসভাকে একটি বার্ষিক এবং একটি ষান্মাষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করতে হবে। তা ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বিশেষ (extraordinary) সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন, এ ব্যবস্থাও আইনে ছিল। অবশ্য এধরনের বিশেষ বৈঠক আহ্বানের জন্য গ্রামসভার মোট সদস্যের মধ্যে অন্যূন এক-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করলে অধ্যক্ষ এই বৈঠক আহ্বান করতে বাধ্য ছিলেন। অধ্যক্ষই গ্রামসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন। আর দুজনেই যদি

অনুপস্থিত থাকতেন তবে বৈঠকে উপস্থিত কোন একজন সদস্যকে গ্রামসভার বৈঠকের অস্থায়ী সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হত।

এই সাধারণ বার্ষিক বৈঠকে গ্রামসভা পরের বছরের ব্যয়বরাদ্দ এবং আগের বছর কি কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিবেদন বিবেচনা করতেন। তা ছাড়া পরের বছর কি কি কাজ হবে সে সম্পর্কেও বিচার বিবেচনা হত। গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশ দেবার অধিকার গ্রামসভার ছিল। গ্রামসভার ষান্মাসিক সাধারণ বৈঠকে নির্ধারিত নানা বিষয়ে বিচার-বিবেচনা হত। এইসব বৈঠকে গ্রামসভার প্রত্যেক সদস্যেরই গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই খবরা-খবর নেবার অধিকার ছিল।

অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েত আইনে গ্রামসভার বৈঠকের ব্যাপারে কোরামের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে এই কোরামের ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে উদার ছিল বলা চলে। এখানে গ্রামসভার মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত এক-দশমাংশ নিয়ে কোরাম হত। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কোরামের অভাবে অনেক গ্রামসভার বৈঠক বসতে পারেনি। কিন্তু আইন অনুসারে মুলতুবি বৈঠকে কোন কোরামের দরকার ছিল না। এটাও দেখা গেছে, কিছু কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়নি। এবং এর আগের কোন ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব আইন সিদ্ধ করবার জন্য গ্রামসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশের স্বাক্ষর সদস্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রামসভার বৈঠক সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, সভা অনুষ্ঠানের অন্তত 15 দিন আগে অধ্যক্ষ বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ গ্রামসভার বৈঠকের স্থান, তারিখ, সময় এবং আলোচ্যসূচী যতদূর ব্যাপকভাবে সম্ভব ঢাকঢোল পিটিয়ে জনসাধারণকে জানাবার ব্যবস্থা করবেন। এ ছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে এই বৈঠকের একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই নিয়ম প্রায়ই ঠিকমত পালন করা হত না। গ্রামের চৌকিদার ঢাক পিটাইতেন না। তাই গ্রামসভার বৈঠকের তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে খুব কম লোকই অবহিত হতেন। গ্রামসভার বৈঠকে গ্রামবাসীদের অল্পসংখ্যক উপস্থিতির এটা একটা কারণ।[4]

গ্রামসভার ভূমিকা হল গ্রামের সাধারণ পর্ষদরূপে কাজ করা। আর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যনির্বাহক সংস্থা হিসেবে তার কাজকর্মের জন্য গ্রামসভার নিকট দায়ি থাকবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসভাগুলি তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেক গ্রামসভাতেই বছরের পর বছর বৈঠক ডাকা হত না। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও সাধারণত সমালোচনার ভয়ে গ্রামসভার বৈঠক ডাকা থেকে বিরত থাকতেন। বস্তুত গ্রামসভা একটি অচল অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। এর বৈঠকে উপস্থিতির সংখ্যাও ছিল খুবই কম। গড় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল 25 থেকে 45 শতাংশ। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার স্বল্পতাই সম্ভবত এর কারণ। তাছাড়া বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সকলের উপযোগী স্থানের অভাব এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সাধারণ অনীহাও এর কারণ। অনেক গ্রামবাসীই জানতেন না, গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে গ্রামসভার একটা পৃথক অস্তিত্বের কথা।

পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছিল গ্রামসভা বাজেট বরাদ্দ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবে। কিন্তু গ্রামসভা এই ব্যয়ের বরাদ্দ ও প্রতিবেদন পাশ করবে কি না সে সম্পর্কে এই আইন নীরব ছিল। তাছাড়া, গ্রামসভার বৈঠকের সাত দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বৈঠক ডাকবেন যেখানে ঐ বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে গ্রামসভার সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হবে। এই বৈঠকে বাজেটটি চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে।[5] কিন্তু গ্রামসভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাজেট বা বার্ষিক প্রতিবেদন অথবা পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত কর্মসূচী সংশোধন করতে বাধ্য থাকবে কিনা তা আইনে সুস্পষ্ট ছিল না। তা ছাড়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum) এবং পদচ্যুতি (Recall) -এর ব্যবস্থাও এই আইনে ছিল না। এ ছাড়া বাজেট বরাদ্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে পুনর্বিবেচনার পর গ্রামসভার নিকট পুনরায় পেশ করতে হবে কি না সে সম্পর্কেও ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন নীরব ছিল। পক্ষান্তরে উত্তরপ্রদেশ পঞ্চায়েত আইন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। ঐ আইনে গাঁও পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা গাঁওসভাকে দেওয়া হয়েছে।[6]

বস্তুত গ্রামসভার গুরুত্ব অস্বীকার করবার নয়। ১৯৬৩ সালে মহীশূর পঞ্চায়েতী রাজ সম্পর্কিত বাসাপ্পা কমিটি উত্তরপ্রদেশ পঞ্চায়েতী রাজ আইনের

অনুরূপ একটি ধারার সুপারিশ করেছিল যাতে বলা হয়েছিল, পঞ্চায়েতকে গ্রামসভার সুপারিশগুলোকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে।[7]

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামসভার গুরুত্ব খুবই কম ছিল। বস্তুত গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর এর কোন ক্ষমতাই ছিল না। এমন কি বিধি অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভাও ঠিকমত অনুষ্ঠিত হত না। আর যদিই বা তা অনুষ্ঠিত হত তাতে গ্রাম-সভার সদস্যরা শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের রিপোর্ট এবং বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা করতে পারতেন। তা পাশ করতে বা অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। গ্রামসভা কার্যতঃ একটি উপদেষ্টা পরিষদ রূপে পরিণত হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর তার কোন কর্তৃত্বই ছিল না। তাই গ্রামের পরিষদ হিসেবে গ্রামসভার গুরুত্ব গ্রামবাসীদের কাছে প্রায় ছিল না বললেই চলে। এটাই গ্রামসভার বৈঠকে গ্রামবাসীদের উপস্থিতির হার খুব কম হওয়ার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 1300 লোকের জন্য একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। গ্রামসভার এত বেশী সদস্যের পক্ষে সক্রিয়ভাবে পঞ্চায়েতের কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মত একটি ক্ষুদ্রায়তন পর্ষদের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রত্যেক গ্রামসভারই একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। গ্রামসভার সদস্যরা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার বছরের জন্য পঞ্চায়েতকে নির্বাচিত করতেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা গ্রামসভার লোকসংখ্যা অনুযায়ী 9 থেকে 15-এর মধ্যে ছিল। এখানে লক্ষণীয় এই যে, গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই সংস্থার সহযোগী সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারতেন। এই সহযোগী সদস্যরা গ্রামসভার বা এর বাইরের লোকও হতে পারতেন। এ ধরনের সহযোগী সদস্যের সংখ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হবে না। তবে সহযোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বা বাধা আরোপ করা হয়েছিল। এই সদস্যদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদেও নির্বাচিত হতে পারতেন না।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল নীতি অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বশাসন ক্ষমতার অস্বীকৃতি। কিন্তু এর উত্তরে বলা

যেতে পারে, আমাদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এখনো শৈশব স্তরে রয়েছে। তাদের পরিণত এবং পরিপূর্ণ স্তরে নিয়ে যেতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকেই তাদের তদারক করতে হবে। সুতরাং গ্রামপঞ্চায়েতের সঙ্গে কোন একজন মনোনীত ব্যক্তিকে জড়িত রাখার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহেই সঠিক বলা যেতে পারে। যোজনা কমিশনের মন্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যে পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় তাতে দক্ষ চাষী, সমবায় কর্মী, এবং সমাজকর্মীর মত পল্লী পুনর্গঠনের কাজের পক্ষে সুযোগ্য উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি সব সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। এই অভাব মেটাতে ছোট পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে দুজন বা তিনজন এবং বড় পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশের মত সদস্য মনোনীত করবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।'[৪]

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই সমিতিবদ্ধ যৌথ সংস্থার মর্যাদা দেয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির স্থায়ী উত্তরাধিকার ও সাধারণ সীলমোহর ছিল। সুতরাং আইনানুযায়ী যার উপর পঞ্চায়েতের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও অধিকার বর্তেছে এমন ব্যক্তিই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কিংবা তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা যেত। আগেকার খসড়া বিলেও গ্রামসভাকে একটি বিধিবদ্ধ যৌথ সংস্থা করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু যুক্ত নির্বাচনী কমিটি (Joint Select Committee) এই প্রস্তাব বাতিল করে এই যুক্তিতে যে 'একই এলাকায় দুটি যৌথ সংস্থা রাখার প্রয়োজন নেই, ইহা বাঞ্ছনীয়ও নয়।'[৫]

দুঃখের বিষয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলিতে নারী এবং তফসিলী ও আদিবাসী শ্রেণীর কিছু ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পরে অবশ্য ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনে আঞ্চলিক পরিষদে দুজন মহিলা এবং অনগ্রসর শ্রেণীর দুজন ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক মনোনয়নের সংস্থান রাখা হয়। জেলা পরিষদেও সরকার দুজন মহিলা সদস্য মনোনয়ন করতে পারেন বলে এই আইনে বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালের নতুন পঞ্চায়েতী আইনে আগেকার আইনগুলির তুলনায় এদিক থেকে এক বড় পরিবর্তন চোখে পড়ে। এই নতুন আইনে নতুন পঞ্চায়েতী রাজের

ত্রি-স্তর ব্যবস্থায় প্রতিটি স্তরে মহিলাদের জন্য দুটি আসন এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে পঞ্চায়েতের একজন সদস্যকে অধ্যক্ষ এবং আর একজনকে উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করতে হত। এঁরা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। কিন্তু সহযোগী সদস্যদের এ সুযোগ দেওয়া হত না।

পঞ্চায়েতের পরিদর্শককে[10] লিখিত ভাবে জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা তার কোন সদস্য পদত্যাগ করতে পারতেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে অপসারিত করতে পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈঠক ডাকতে হত। তবে আইনে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে অপসারণের কোন কারণ উল্লেখ করা ছিল না।

একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হলে তাদের অপসারিত করার কোন ক্ষমতা গ্রামসভার ছিল না। একমাত্র জেলা পঞ্চায়েত অফিসার বিভিন্ন কারণে তাদের অপসারিত করতে পারতেন।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর তিন ধরনের ক্ষমতা ও কাজকর্ম অর্পণ করা হয়েছিল—বাধ্যতামূলক, অর্পিত এবং ঐচ্ছিক বা বিশেষ বিবেচনামূলক (discretionary)। বাধ্যতামূলক কাজকর্মগুলি ছিল মুখ্যত পৌর দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত। পক্ষান্তরে অর্পিত এবং স্বেচ্ছামূলক কাজ-কর্মগুলি ছিল সাধারণত উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন সংক্রান্ত।

বাধ্যতামূলক কাজকর্ম ছিল সেইসব কাজ যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর আইনানুভাবে বর্তেছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ এসব কাজ করতে বাধ্য ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন বিকল্প ছিল না। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক কাজকর্মগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ করতে বাধ্য ছিলেন না।

বাধ্যতামূলক কর্তব্য সম্পর্কে আইনে বলা হয়েছিল, আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতকে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ময়লানিকাশী ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, মহামারী প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, টীকা ও ইন্‌জেকশন দেবার ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ এবং সমষ্টি উন্নয়ন কাজকর্ম করতে হবে। লক্ষ্য করবার

বিষয়, এই বাধ্যতামূলক কাজকর্মও শর্তসাপেক্ষ ছিল। সেই শর্ত সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'যতটা সম্ভব পঞ্চায়েতের নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে।'[11]

গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেশ কিছু জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনায় তাকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হত তা খুবই সামান্য। এর নিজস্ব কোন আয়ের পথ ছিল না। তাই একে অঞ্চল পঞ্চায়েতের অনুদান ও বরাদ্দের ওপর নির্ভর করতে হত। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত 'অঞ্চল পঞ্চায়েতের ওপর নির্ভরশীল একটি পরগাছা জাতীয় সংস্থায়' পরিণত হয়।[12] নিজস্ব ব্যয় মিটিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত তার তহবিল থেকে জনকল্যাণ ও উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামান্যই অনুদান হিসাবে দিতে পারতেন। সরকারী অনুদান যদি বা কখনো মিলতো তা শুধু কোন বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যেই। তাই সে টাকা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যয় করা যেত না। ফলে গ্রামের লোকের চোখে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবমূর্তি অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছিল।

অঞ্চল পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কাজ শেষ হবার পর অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠনের কাজ শুরু হত। ১৯৫৭ সালের মূল আইন অনুযায়ী গ্রামসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হত। ১৯৬৫ সালে অবশ্য এই আইনটি সংশোধিত হয়। এই সংশোধিত পদ্ধতিতে দুই শ্রেণীর সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হত : (a) অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষগণ এবং (b) গ্রামসভার সদস্যদের ভেতর থেকে ঐসব গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য।[13] এভাবে পদাধিকার বলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষদের অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নিম্নতর দুই স্তরে একটা সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রথম বৈধ বৈঠকে তার কোন একজন সদস্যকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হত। অন্য একজন সদস্য হতেন উপ-প্রধান। উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই পদে থাকতেন। দুঃখের বিষয়, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত স্থাপনের পর দ্বিতীয়বার কোন নির্বাচন হয়নি।

অঞ্চল প্রধান বা উপ-প্রধান কিংবা অঞ্চল পঞ্চায়েতের কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারতেন। আবার অঞ্চল পঞ্চায়েতের কোন সদস্যকে পঞ্চায়েতী আইনের 20 ধারায় বর্ণিত সাতটির যে কোন একটি কারণে অপসারিত করবার ব্যবস্থা ছিল। অপরদিকে কোন নির্বাচিত প্রধান বা উপ-প্রধানকে অঞ্চল পঞ্চায়েতের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারিত করা যেত। তা ছাড়া, দুই-তৃতীয়াংশের কম এবং অর্ধেকের বেশী ভোটে অপসারণের প্রস্তাব সমর্থিত হলে জেলা শাসক উপযুক্ত বিবেচনা করলে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করতে পারতেন।

গণতান্ত্রিক উপায়ে অপসারণ ছাড়াও, লিখিত আদেশ ক্রমে নির্দিষ্ট-কর্তৃপক্ষ অযোগ্যতার দায়ে বা অনুরূপ কারণে যে কোন প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করতে পারতেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পৌর উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজকর্মের তুলনায় অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজকর্ম খুব কম হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ কাজগুলি ছিল—

(a) 55 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা ;

(b) কর, ট্যাক্স বা ফি নির্ধারণ এবং সংগ্রহ ;

(c) এলাকাভুক্ত দফাদার ও চৌকিদারদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ;

(d) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও পরিচালনা ; এবং

(e) রাজ্য সরকার অর্পিত কর্তব্য পালন।[14]

স্থানীয় সমস্যা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট তার সমাধান কল্পে কোন সুপারিশের জন্য গ্রাম এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত যে কমিটি গঠন করবেনই এমন কোন বাধ্য-বাধকতা পঞ্চায়েত আইনে ছিল না। অবশ্য দুটি বা তার বেশী গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে উভয়ের যৌথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কাজ রূপায়ণের জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠন করতে পারতেন। কিন্তু যতদূর জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গে এধরনের গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কমিটি কখনো গঠন করা হয়নি।

এছাড়া, ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছিল কাজের সুবিধায়

জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েত কোন কমিটি গঠন করতে পারে এবং এধরনের এক-একটি কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবেন তাও স্থির করতে পারে।

প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য একজন করে সচিব ছিলেন। তিনি প্রধানকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য ও পরামর্শ দিতেন।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের একটি বড় দায়িত্ব ছিল তার এলাকায় দফাদার ও চৌকিদারদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। তবে একটি অঞ্চল পঞ্চায়েতে দফাদার ও চৌকিদারের সংখ্যা কত হবে, তাদের কত বেতন দেওয়া হবে, তাদের সাজ-সরঞ্জাম কি এবং কত দামের হবে, তাদের নিয়োগ, চাকরীর শর্ত, ক্ষমতা ও কর্তব্য, অবসরের বয়স, শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং পদচ্যুতি— এ সমস্ত ব্যাপারই আইন অনুসারে রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ধারাগুলি আসলে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের 21 (1) ধারারই অনুবর্তন : "একটি ইউনিয়নে দফাদার ও চৌকিদারের সংখ্যা কত হবে, তাদের বেতন ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম কি হবে এসবই সময়ে সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্থির করবেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে ইউনিয়ন বোর্ডের মতামত বিবেচনা করবেন।"

১৯৬৩ সালের আইন : আঞ্চলিক পরিষদ

মেহতা সমীক্ষক দলের প্রস্তাব এবং ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন অনুসারে প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেছিলেন। এটি একটি যৌথ সংস্থা যার নিজস্ব কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। এর সম্পত্তি অর্জন করা, রক্ষা করা এবং বিক্রী করবার অধিকারও ছিল।

কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য এবং একজন সহযোগী সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হত। সহযোগী সদস্যের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের বি. ডি. ও সমষ্টি উন্নয়ন অফিসার (আধিকারিক) ছিলেন এই সহযোগী সদস্য। বি. ডি. ও ছাড়া নিম্নলিখিত সদস্যরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ছিলেন :

(1) অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ব্লকের এলাকায় কোন ইউনিয়ন বোর্ড থাকলে তার প্রেসিডেন্ট। এঁরা সবাই পদাধিকার বলে সদস্য।

(2) প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষদের মধ্য থেকে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ।

(3) ব্লকের বা তার কোন অংশ নিয়ে গঠিত নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী নন এমন কোন লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য। ব্লক এলাকায় বাড়ী রয়েছে এবং মন্ত্রী নন এমন রাজ্যসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য।

(4) রাজ্য সরকার মনোনীত ব্লক এলাকায় বাড়ী রয়েছে এমন দুজন মহিলা ও দুজন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্য ; এবং

(5) ব্লকে নিজেদের বাড়ী রয়েছে এবং সমাজসেবা ও গ্রামীণ উন্নয়নে ধারণা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এমন দুজন ব্যক্তি।[15]

আঞ্চলিক পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত কোন সদস্য ছিল না। এর কিছু সদস্য হয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত অথবা পদাধিকার বলে নির্বাচিত। আর অন্যান্য সদস্যরা হয় সরকার মনোনীত নয়ত সরকারী কর্মচারী হিসেবে অথবা আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচিত সহযোগী সদস্য। আঞ্চলিক পরিষদে গড়ে 27 জন সদস্য ছিলেন। তাঁদের স্বাভাবিক কার্যকাল ছিল চার বছর।

জেলা পরিষদের সদস্যদের মত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যের একই ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন ছিল। জেলা পরিষদের মত আঞ্চলিক পরিষদেরও কোন ব্যক্তি সদস্যপদের অযোগ্য বলে নির্বাচিত হতেন, যদি দেখা যেত ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালের আইন অনুযায়ী ধার্য কোন রকম কর বা ফি— তাঁর এক বছরেরও বেশী বাকী পড়ে আছে অথবা তিনি যদি জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদের কর্মী অথবা তিনি যদি অঘোষিত দেউলিয়া বা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ থাকতেন। অসদাচরণের দায়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের চাকুরী থেকে বরখাস্ত কোন কর্মী অথবা নৈতিক অসচ্চরিত্রতার অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য পদের অযোগ্য ছিলেন।

এছাড়া অযোগ্যতা ও দুর্ব্যবহারের দায়ে বা আঞ্চলিক অথবা জেলা পরিষদের পর পর ছয়টি বৈঠকে অনুপস্থিতির কারণে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের যে কোন সদস্যকে অপসারিত করবার ক্ষমতা রাজ্যসরকারকে দেয়া হয়েছিল।

প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদে একজন প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁরা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচিত হতেন। সাধারণত তাঁরা চার বছর এই পদে বহাল থাকতেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মত আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টকেও রাজ্যসরকার একই কারণে তাঁদের পদ থেকে অপসারিত করতে পারতেন।[16]

আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুরূপ।

প্রতি তিন মাসে একবার আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা বৈঠকে বসতেন। সমস্ত সিদ্ধান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নেওয়া হত। জেলা পরিষদের মত আঞ্চলিক পরিষদের কয়েকটি বিধিবদ্ধ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ছিল।

স্থানীয় উন্নয়ন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন অফিসার পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসার ছিলেন।

১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনের দশম অধ্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা, কর্তব্য এবং দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রধানত এইসব কাজকর্মের মধ্যে ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব। জেলা পরিষদের ওপরে ন্যস্ত কাজকর্মের থেকে এগুলির পার্থক্য বড় একটা ছিল না।[17] তাছাড়া কাজকর্মের ভাগাভাগির দিক থেকে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কোন প্রকল্প গ্রহণ বা রূপায়ণের অধিকার আঞ্চলিক পরিষদের ছিল না। আর্থিক বা অন্যান্য কারণে এধরনের প্রকল্প রূপায়ণে সক্ষম না হলে অবশ্য আঞ্চলিক পরিষদ তার ভার নিতে পারতেন। আঞ্চলিক পরিষদ তার স্থানীয় এলাকার ভেতরে একাধিক অঞ্চল জুড়ে কোন প্রকল্প গ্রহণ বা রূপায়ণ করতে পারতেন।

জেলা পরিষদের মত আঞ্চলিক পরিষদকে কিছু প্রকল্প গ্রহণের ও অর্থ সাহায্যদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলি ছিল কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায় পল্লীগণ, জলসরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, প্রাথমিক বয়স্ক শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ সংক্রান্ত।

রাজ্য সরকার বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদের ওপর কোন প্রকল্প রূপায়ণ বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার দিলে পরিষদ সে কাজও করতেন।

এসব কাজ ছাড়াও, আঞ্চলিক পরিষদকে তার এলাকাভুক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ পরীক্ষা করে তা অনুমোদন করতে হত।

জেলা পরিষদ

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হওয়ার ফলে পল্লী প্রশাসনের মজবুত ভিতটা মুখ্যত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওপরেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হিসেবে এটা ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম উদ্ভাবন। সমষ্টির স্বার্থের বনিয়াদের ওপর এটা দাঁড়াতে পারেনি। এটা ছিল স্থানীয় সরকারের একটি প্রশাসনিক ইউনিট মাত্র। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রশাসনিক ইউনিট করা ভুল হয়েছিল। সমগ্র পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রতর ইউনিটগুলির জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না করে তাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দাক্ষিণ্যের ওপর ফেলে রাখাও ঠিক হয়নি। এর ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চালু করা হয়েছিল ভ্রান্তভাবে,—ওপর থেকে নীচে। আসলে এই শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার ছিল নীচে থেকে ওপরে।[18] এজন্যই ১৮৮৫ সালের আইনটির বদলে ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন চালু করা হয়। উন্নয়নের কাজে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনই ছিল এই নতুন আইনের উদ্দেশ্য। এর ফলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে জনগণের মধ্যে অংশগ্রহণের মনোভাব গড়ে উঠবে এটাই আশা করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে একমাত্র কোচবিহার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 15টি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বাতিল করে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। দেশীয় রাজ্য হিসেবে কোচবিহারে এর আগে কোন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ছিল না। কাজেই কোচবিহার জেলা পরিষদ ছিল সম্পূর্ণ নতুন সংগঠন। এইসব জেলা পরিষদের আওতায় ছিল 325টি আঞ্চলিক পরিষদ, 2,926টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং 19,662টি গ্রাম পঞ্চায়েত।

প্রতিটি জেলা পরিষদের এক্তিয়ারে ছিল সেইসব জেলার প্রশাসনিক বা রাজস্ব এলাকা। অবশ্য পৌরসভা (কর্পোরেশন), মিউনিসিপ্যালিটি,

বিজ্ঞাপিত এলাকা, নোটিফায়েড এরিয়া এবং ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা জেলা পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে।

সদস্য এবং সহযোগী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত ছিল। এই সদস্য ও সহযোগী সদস্যগণ সাধারণত চার বছরের জন্য পদাভিষিক্ত থাকতেন। সহযোগী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কিছু সরকারী কর্মচারী। যেমন মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েত অফিসার প্রভৃতি। তাঁদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের পদেও তাঁরা নির্বাচন প্রার্থী হতে পারতেন না। সহযোগী সদস্য ছাড়া জেলা পরিষদে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ছিলেন :

(a) জেলার আঞ্চলিক পরিষদগুলির প্রেসিডেন্টগণ (পদাধিকার বলে) ;

(b) জেলার প্রতিটি মহকুমা থেকে ঐ মহকুমার সমস্ত অধ্যক্ষদের দ্বারা নির্বাচিত দুজন অধ্যক্ষ ;

(c) জেলার বা জেলায় কোন অংশের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত কিংবা ঐ জেলায় বাড়ী রয়েছে এমন এম. পি., এম. এল. এ বা এম. এল. সি। তবে এদের মধ্যে কেহ কোন মন্ত্রী হলে তিনি জেলা পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না ;

(d) রাজ্য সরকার মনোনীত জেলার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ;

(e) জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট (পদাধিকার বলে) ;

(f) ১৯৬৩ সালের আইনের চার নম্বর ধারা অনুযায়ী কোন মহিলা জেলা পরিষদের সদস্য না হলে জেলায় বাস করেন এমন দুজন মহিলাকে রাজ্য-সরকার জেলা পরিষদে সদস্য নিযুক্ত করতেন।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদের আয়তন এত বড় ছিল যে তা পরিচালনার পক্ষে অসুবিধাজনক। রাজসরকারের মনোনীত সদস্যর সংখ্যা ছিল খুব বেশী। পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্যের সংখ্যাও বেশী। ফলে এ রাজ্যে একটি জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা 39 থেকে 125এর মধ্যে ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে চব্বিশ পরগণা জেলার কথাই ধরা যাক। এ জেলার পরিষদে 125 জন সদস্য ছিলেন। অথচ পুরানো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র 40 জন।

প্রতিটি জেলা পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনজন করে সদস্য মনোনীত করতেন। এছাড়া ছিলেন সরকার মনোনীত দুজন সরকারী অফিসার যাঁরা ছিলেন জেলা পরিষদের সহযোগী সদস্য। এর ফলে রাজ্যের সদর দপ্তরে ক্ষমতাসীন দল পেছনের দরজা দিয়ে পরিষদে দলীয় সদস্য ঢোকাবার সুযোগ পেতেন। এইসব সদস্য মনোনীত করবার ক্ষমতা যদি জেলা পরিষদকেই দেওয়া হত তাহলে ভালো হত।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাতেই এটা সুস্পষ্ট যে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সদস্যরা সম্পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুকরণ করা হয়নি। গ্রামসভার সদস্যরা সরাসরিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচিত করতেন। কিন্তু উচ্চতর পঞ্চায়েতগুলির গঠনে এইরকম প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না।

সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এ আইনে আর একটা ত্রুটি থেকে গেছে। সেটা হল, তফসিলী ও আদিবাসীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এতে ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালের আইনে একটা বড় রকমের বিচ্যুতি হল সমবায় সংস্থার প্রতিনিধিদের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে।

জেলা পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের মেয়র বা জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এইসব পদে নির্বাচিত হতে পারতেন না। অযোগ্যতা, কর্তব্যে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা অন্যান্য যে সব কারণে জেলা পরিষদের কোন সাধারণ সদস্য অপসারিত হতে পারেন সেসব কারণে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকেও রাজ্য সরকার অপসারিত করতে পারতেন। জেলা পরিষদের মোট সদস্যর অর্ধেকের বেশী সদস্য চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে তাঁদের অপসারিত করবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের ছিল।

চেয়ারম্যানের ক্ষমতা, কাজ ও দায়িত্ব আইন ও নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট

করে দেওয়া ছিল। পরিষদের সমস্ত রেকর্ড তিনি দেখতে পারতেন। পরিষদের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়দায়িত্ব সাধারণ ভাবে তাঁর ওপরে ছিল। কার্যনির্বাহক অফিসারের (Executive Officer) কাজের ওপর পুরো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ তাঁর ছিল। জরুরী অবস্থায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে তিনি জেলা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন এমন যে কোন কাজ সম্পাদন করবার বা বন্ধ করবার বা বিরতির জন্য নির্দেশ দিতে পারতেন। জেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্যবর্গ, কার্য-নির্বাহক অফিসার এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির বেসরকারী সদস্যদের ভ্রমণভাতা সংক্রান্ত বিল পাশের ব্যাপারে তিনিই নিয়ামক অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। তিনি অর্থ এবং প্রতিষ্ঠান (Establishment) কমিটির সুপারিশ ক্রমে অনধিক 300 টাকা মাসিক বেতনের অফিসার বা কর্মচারীর চাকরী থেকে অপসারণ, বরখাস্ত বা পদাবনতির আদেশ জারী করতে পারতেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সমস্ত ষ্টাণ্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে অর্থ ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

জেলা পরিষদের নীতি ও প্রস্তাব রূপায়ণের দায়দায়িত্ব ছিল একটি প্রশাসন যন্ত্রের ওপর। এই প্রশাসন যন্ত্রের শীর্ষে ছিলেন কার্যনির্বাহক অফিসার। এই কার্যনির্বাহক অফিসারকে নিযুক্ত করতেন রাজ্যসরকার এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিসের সদস্য। কার্যনির্বাহক অফিসার (একজিকিউটিভ অফিসার) ছাড়া জেলা পরিষদে আর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন, তিনি হলেন এর সচিব। তিনিও পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য।

তাছাড়া, প্রত্যেকটি জেলা পরিষদে একজন করে জেলা ইঞ্জিনীয়ার, একজন মেডিকেল অফিসার, উচ্চপদস্থ কারিগরী কর্মী প্রভৃতি ছিলেন।

জেলার বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদে রচিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সমন্বয় এবং সুসংহতিসাধন করা ছিল জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মূল্যায়ন

অঞ্চল পঞ্চায়েত পুরোনো দিনের ইউনিয়ন বোর্ডেরই উত্তরাধিকারী। ইউনিয়ন বোর্ডের যেসব কাজ ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েতকে তার চেয়ে বেশী কিছু

করতে হত না। পার্থক্য শুধু এই যে, ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামের কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পাদন করবার দায়িত্ব নিতে হত। কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা ন্যস্ত কোন ক্ষমতা ছাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েতকে শুধুমাত্র তিনটি কাজ করতে হত— কর ধার্যকরণ (Taxation), গ্রামীণ আরক্ষাবাহিনীর (Police) রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরল বিচারব্যবস্থা সংগঠন। পক্ষান্তরে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর দেওয়া হয়েছিল পৌর এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ভার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রাম পঞ্চায়েত শুধু নামেই টিকে ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিম্নস্তরে থাকায় অর্থের জন্য তাদের অঞ্চল পঞ্চায়েতের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত। অঞ্চল পঞ্চায়েত থেকে যতটা অর্থ পাওয়া যেত ততটুকুই গ্রাম পঞ্চায়েত তার বিধিবদ্ধ দায় দায়িত্ব পালন করতে পারতো।

বিধিবদ্ধ এবং উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম সম্পাদনে পঞ্চায়েত সদস্যদের এই ব্যর্থতা সমগ্রভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই তুলে ধরেছে। সদস্যদের অংশগ্রহণ না থাকায় গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেনি। 'পশ্চিমবঙ্গে 19,662টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এর শতকরা দশ ভাগও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে কি না সন্দেহ।'[19]

সাংগঠনিক এবং আর্থিক দিক থেকে বলতে গেলে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্বয়ম্ভর ইউনিট ছিল না। আর্থিক দিক থেকে এগুলি ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েতের ওপর নির্ভরশীল। তাদের কর বসানোর ক্ষমতাও ছিল না এবং আয়ের স্বতন্ত্র উৎসও ছিল না। সাংগঠনিক দিক থেকেও গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিকল্পনার দায়দায়িত্ব বহনের পক্ষে খুবই দুর্বল ছিল।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ পঞ্চায়েতী ব্যাপারে মনোযোগ দেবার যথেষ্ট সময় পেতেন না। আবার এ কাজ দেখবার জন্য সহকারী নিযুক্ত করবার মত আর্থিক সংস্থানও গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিল না। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম অবহেলিত হত।

তাছাড়া গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের মত দুটি প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য যথেষ্ট দক্ষ কর্মীর অভাবও গ্রামাঞ্চলে ছিল। ফলে পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক

কাজের ভারপ্রাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত যেন সেখানে অনেকটা আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাসঙ্কুল সমুদ্রে নাবিক বিহীন জাহাজের মত চলছিল।

১৯৫৮ সালে এ রাজ্যে যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা চালু হল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পল্লী প্রশাসনের ভার গ্রামীণ প্রতিনিধিদের অর্পণ করা। এই নতুন ব্যবস্থা চালু করবার ফলে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পাদনের অনেকটা উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি গ্রামীণ উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের কর্মসূচী রূপায়ণে কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। কেন না পল্লীবাসীদের জন্য বিরাট উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয় মেটানোর পক্ষে একটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের গড় মাথাপিছু আয় ও ব্যয় (অনেক ক্ষেত্রে এক টাকারও কম) অত্যন্ত কম ছিল। নীচের সারণী থেকে এটা বোঝা যাবে (1 নং সারণী) :

সারণী সংখ্যা—1

১৯৬৯-৭০ সালের মাথাপিছু আয়ব্যয়

অঞ্চল পঞ্চায়েতের নাম	টাকায় মাথাপিছু আয় (১৯৭১ সালের আদমসুমারী ভিত্তিতে)	টাকায় মাথাপিছু ব্যয় (১৯৭১ সালের আদমসুমারী ভিত্তিতে)
1. বীরগাছি	0 99	1·05
2. চাঁপাডাঙ্গা	0·76	0·57
3. দলুই বাজার	0·68	0·66
4. ইসলামপুর	1·05	1·19
5. কেসবগড	0·04	0·01
6. মান্দাবাড়ি	1·40	1·04
7. পুলুন্দং	1·01	1·30
8. রামচন্দ্রপুর	0·58	0·80
9. সিংখি	0·76	0·83
10. তিলখোজা	0·55	0·20

(উৎস : মূল্যায়ন অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুস্পষ্ট কারণে অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি তাদের আয়ের সূত্র অর্থাৎ কর, মাশুল প্রভৃতি উৎসগুলির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন নি। তাই সাধারণ কাজকর্মের জন্যও তাদের সরকারের কাছ থেকে অনুদান এবং মঞ্জুরীর ওপর নির্ভর করতে হত। লক্ষ্য করা দরকার যে ১৯৬৭ সালে অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি মোট যা ব্যয় করেছে তার শতকরা 52 ভাগেরও বেশী এসেছিল সরকারী অনুদান ও মঞ্জুরী হিসেবে। পরের বছরে এ পরিমাণ ছিল আরো বেশী—শতকরা 57 ভাগ। কিন্তু সরকারী অনুদানের সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া থাকতো। এই শর্ত হলো, অনুদানের একাংশ অঞ্চল সচিব ও গ্রামের চৌকিদারদের (Police) বেতন বাবদ ব্যয় করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং সচিব ও গ্রামের চৌকিদারদের বেতনবাবদ ব্যয় মেটাবার পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে বরাদ্দ করবার মত অঞ্চল পঞ্চায়েতের হাতে আর প্রায় কিছুই থাকতো না।

মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় তাই অত্যন্ত অল্প ছিল। আর এই সামান্য টাকা থেকে উন্নয়নের অগ্রগতি হওয়া যে অসম্ভব তা সহজেই বোঝা যায়। কেন না গড় হিসেবে দেখা যায়, একটি গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ গড়ে বছরে 300 টাকা থেকে 400 টাকার বেশী পাওয়া যেত না। যে পরিমাণ দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর দেওয়া হয়েছিল সে তুলনায় টাকার অঙ্কটি একেবারেই কম।

এ রাজ্যের 2,926টি অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র 52টি অঞ্চল পঞ্চায়েত ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। এর মধ্যে 41টি ছিল বর্ধমান বিভাগে এবং 11টি জলপাইগুড়ি বিভাগে। অথচ ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 70 ধারা অনুযায়ী অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান কাজই হল ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও চালনা করা। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, সে সময় পঞ্চায়েত সম্পর্কে জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা যথেষ্ট জাগ্রত করা হয়নি।

১৯৬৪ সালের মধ্যেই এ রাজ্যের সব জেলাকেই পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। ১৯৫৯-৬৪ সালের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এরপর প্রতি চার বছরে একবার করে পঞ্চায়েতী নির্বাচন হবার কথা। কিন্তু পনের বছর পরেও কোন পঞ্চায়েতী সংস্থাতেই দ্বিতীয়বার নির্বাচন হয়নি। ফলে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির

কার্যনির্বাহকদের মনোবল এতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তার ফলস্বরূপ জরুরী অবস্থা জারীর দরুন ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এখানে পঞ্চায়েতী নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসে তাঁদের ইচ্ছা ছিল পঞ্চায়েতী নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে পঞ্চায়েতী আইন সংশোধন করা। এই সরকার ভেঙ্গে যাবার আগে আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে তাদের জায়গায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরে রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন কালে রাজ্য প্রশাসন পঞ্চায়েতী নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তাঁরা যে কোন কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। তাই রাজনৈতিক টানাপোড়েনে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির ক্ষতি হয়। সুতরাং এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন বাঞ্ছনীয় যাতে পঞ্চায়েতগুলি রাজ্যসরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজ করতে পারে।

দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সুস্থ পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা চালু রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে অধিকাংশ পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানই নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দীর্ঘদিন আগে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় 15 বছর আগে বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় যাঁরা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই পদে ছিলেন। ফলে জনগণের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের কোন বৈঠকই বসেনি। অনেক ক্ষেত্রে আবার কোরামের অভাবে এই বৈঠক বসতে পারেনি। পঞ্চায়েতী সংস্থার সদস্যদের আগ্রহের অভাবই এতে সূচিত হয়। কালক্রমে নিম্নতর পর্যায়ের দুটি পঞ্চায়েতী সংস্থার সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা এবং পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জনগণের উদাসীনতা অত্যন্ত চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ফলে এই দুটি সংস্থা প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় টিঁকে ছিল। একদশক আগে যেসব প্রতিনিধি পঞ্চায়েতী সংস্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন জনগণের দৃষ্টিতে তাঁরা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ অবস্থায় পঞ্চায়েতকে জনগণ আর তাঁদের নিজস্ব সংস্থা বলে গ্রহণ করতেন না। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সদস্য এবং জনগণ উভয়েই এইসব প্রতিষ্ঠানের

ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। ফলে অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায় হত না। পঞ্চায়েতের কর আদায় না হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচীই বন্ধ হয়ে যায়। দেয় করের 50 শতাংশ আদায় হত না। আর এই বকেয়া কর আদায়ের জন্য কার্যত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি তখন। এইসব আর্থিক টানাটানি সত্বেও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি তাদের যতটুক সহায় সম্পদ ছিল তা দিয়ে গ্রামীণ পয়ঃপ্রণালী তৈরী, পানীয় জল সরবরাহ, গ্রামের রাস্তা তৈরী ও সংস্কার প্রভৃতি ছোট ছোট সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছিল। তারা পল্লীবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী, পল্লীকারিগর এবং গ্রামের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অবস্থার উন্নতি করতে পঞ্চায়েতগুলি সক্ষম হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থার পুনর্গঠনের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো। বস্তুত সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের হাত থেকে গ্রাম পর্যায়ে জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দ্রুত ও সুষ্ঠ হস্তান্তকরণের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির চাবিকাঠি রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তর বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিয়েছিল। 1A সারণীতে (সারণী সংখ্যা—1A) এই প্রকল্পগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এইসব প্রকল্পের প্রায় সবগুলিই ক্ষুদ্র এবং এগুলির জন্য বরাদ্দও বেশী ছিল না।

১৯৬৪-৬৫ সালে অর্থাৎ যে বছর আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ গঠন করা হয় সে সময় এদুটি পঞ্চায়েতী সংস্থার কাজ করবার সুযোগ খুবই কম ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে অবশ্য তাদের কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যে সরকার ক্ষমতায় আসেন তারা বিভিন্ন দপ্তরের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির হাত থেকে ফিরিয়ে নেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের দিক থেকে এটা একটা পশ্চাদগামী পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থা নেবার কারণ হিসেবে সরকারী অভিমত হল, পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলি তার আগের বছরে ত্রাণের টাকা ঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত চালানো হয়েছিল। কিন্তু কোন মারাত্মক অনিয়ম চোখে পড়েনি।

যাইহোক, জেলা পরিষদগুলিও কিছু কাজের ভার আঞ্চলিক পরিষদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এইসব কাজকর্মের জন্য তাঁরা কিছু অর্থ আঞ্চলিক পরিষদের হাতে দিতেন এবং সময়ে সময়ে কারিগরী সাহায্যও। এইসব কাজ উন্নয়নমূলক এবং উন্নয়নবহির্ভূত দুই-ই ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জেলা পরিষদই কয়েকটি কাজ ছাড়া আর কোন উন্নয়নমূলক কাজ তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থ দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের ওপর রূপায়ণের দায়িত্ব দেয়নি। যে কাজগুলি দিয়েছিল সেগুলি হল নলকূপ বসানো এবং মেরামত করে পুনরায় বসানো প্রভৃতি। এইসব কাজের ভার আঞ্চলিক পরিষদের ওপর দিতে গিয়ে জেলা পরিষদ প্রধানত সরকারী অর্থ সাহায্যের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল।

কখনো কখনো জেলা পরিষদ নিম্নতর পঞ্চায়েতের হাতে কাজের ভার না দিয়ে ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার পেছনে যে দর্শন রয়েছে এ ধরনের কাজে তার প্রতি চরম উপেক্ষাই দেখানো হয়েছিল বলা যেতে পারে।

সারণী সংখ্যা—1A

	প্রকল্পের নাম	উদ্যোক্তা দপ্তর	যে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল	কার্যনির্বাহী পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা
1.	গ্রামীণ জল সরবরাহ	স্বাস্থ্য বিভাগ	জেলা পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
2.	কাঁচা সড়ক প্রকল্প	কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ	আঞ্চলিক পরিষদ	অঞ্চল পঞ্চায়েত
3.	চাষীদের শিক্ষা-মূলক ক্ষেত প্রদর্শনী	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
4.	পুকুর সংস্কার প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত

	প্রকল্পের নাম	উদ্যোক্তা দপ্তর	যে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল	কার্যনির্বাহী পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা
5.	জোড় বাঁধ সেচ প্রকল্প	ঐ	জেলা পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত
6.	বিবিধ কৃষি প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত
7.	পাম্পের সাহায্যে সেচ প্রকল্প	ঐ	জেলা পরিষদ/ আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত
8.	পল্লী কারু ও অন্যান্য শিল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
9.	মহা জলাশয় (পুকুর) সংস্কার প্রকল্প	মৎস্য বিভাগ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত
10.	পুকুরে মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
11.	সমাজকল্যাণ ও ত্রাণ কর্মসূচী	ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগ	জেলা পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ অঞ্চল পঞ্চায়েত
12.	বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প	শিক্ষা বিভাগ	জেলা পরিষদ/ আঞ্চলিক পরিষদ	অঞ্চল পঞ্চায়েত
13.	পাঠশালা প্রকল্প	শিক্ষা বিভাগ	জেলা পরিষদ	জেলা পরিষদ/ আঞ্চলিক পরিষদ
14.	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ

	প্রকল্পের নাম	উদ্যোক্তা দপ্তর	যে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে	কার্যনির্বাহী পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা
15.	সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্প	শিক্ষা বিভাগ	আঞ্চলিক পরিষদ/ রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ	আঞ্চলিক পরিষদ/ রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ
16.	বিনোদনমূলক প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
17.	শিশু উদ্যান খেলার মাঠ ইত্যাদি প্রকল্প	ঐ	আঞ্চলিক পরিষদ	আঞ্চলিক পরিষদ
18.	পঞ্চায়েত ঘর	পঞ্চায়েত দপ্তর	আঞ্চলিক পরিষদ	অঞ্চল পঞ্চায়েত

সূত্র : পঞ্চায়েত দপ্তর (অধিকার) পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উৎপাদন ও সমাজকল্যাণমূলক যেসব কাজ আগে রাজ্যসরকার করতেন এখন রাজ্যসরকার ও জেলা পরিষদের অনুরোধে আঞ্চলিক পরিষদকে সেসব উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। নিজেদের উদ্যোগেও আঞ্চলিক পরিষদগুলি কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদের নিজেদের কোন কারিগরী কর্মী ছিল না। কেবলমাত্র কৃষি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তারা ব্লকের কারিগরী কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রতিটি ব্লকে কৃষি বিভাগের যেসব কারিগরী কর্মী ছিলেন তাঁদের কেবল কৃষি কাজের ব্যাপারেই আঞ্চলিক পরিষদকে সাহায্য করতে হত। কিন্তু কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে ব্লকের কর্মীদের সাহায্য পাওয়া যেত না।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকার বলে মুখ্য কার্যনির্বাহক হিসেবে কাজ করলেও ব্লক কর্মীরা সকলেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। তাছাড়া কেবলমাত্র কয়েকটি ছোট প্রকল্প আঞ্চলিক পরিষদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলি হল :

1. বিবিধ কৃষি প্রকল্প
2. কাঁচা সড়ক প্রকল্প
3. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন
4. সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র এবং বিনোদনমূলক কর্মসূচী
5. গ্রামীণ চারু ও কারু শিল্প
6. সুফল ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী
7. পল্লী জল সরবরাহ
8. একজন শিক্ষকের পাঠশালা প্রভৃতি

কৃষি, পশুপালন, সেচ, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি বৃহৎ প্রকল্পগুলি কখনোই আঞ্চলিক পরিষদের আওতায় ছিল না। প্রায় সব রাজ্যেই জাতীয় উন্নয়ন সেবা ব্লকের স্থান ও কাজকর্মের ভার নিয়েছে ব্লক সমিতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কাজকর্ম চালাবার দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের ওপর কখনো অর্পণ করা হয়নি। ফলে ব্লকের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যা কাজ তারা এ পর্যন্ত করেছিল তা সরকারের এজেন্ট হিসেবেই করেছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে তারা শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। নিজস্ব তহবিল থেকে তারা কার্যত কোন কাজই করেনি। আঞ্চলিক পরিষদগুলি পরিচালনার জন্য প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় 19 লক্ষ টাকা অনুদান দিতেন।

আঞ্চলিক পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (Establishment Charges) এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটাও কম ব্যাপক নয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে আঞ্চলিক পরিষদের মোট ব্যয়ের যথাক্রমে 25 ও 44 শতাংশ এই দুই খাতে ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে এই ব্যয় দাঁড়ায় যথাক্রমে 31 ও 49 শতাংশ। প্রতিষ্ঠান চালনার এই অধিক ব্যয়ের কারণ হল আঞ্চলিক পরিষদের হাত থেকে ত্রাণমূলক ও অন্যান্য প্রকল্পের রূপায়ণের ভার রাজ্য-সরকার নিজের হাতে ফিরিয়ে নেওয়ায় মোট ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশই কমে যাচ্ছিল। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় বাড়লেও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়েনি। এ থেকে বোঝা যায়, উন্নয়নমূলক-

কর্মসূচীগুলি যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা ততটা পায়নি। অনুরূপভাবে জেলা পরিষদও আঞ্চলিক উন্নয়নের অছি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়নি।

জেলা পরিষদের যা আয় হত তার তুলনায় তাদের প্রতিষ্ঠান রক্ষণা-বেক্ষণের মোট ব্যয় ছিল খুবই বেশী। ১৯৬৭-৬৮ সালে জেলা পরিষদগুলির মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়ই ছিল 20 শতাংশ। এই অধিক ব্যয় হারের কারণ জেলা পরিষদগুলির ওপর অর্পিত কিছু কিছু প্রকল্প রূপায়ণের ভার রাজ্যসরকার ফিরিয়ে নেওয়ায় আলোচ্য বছরের মোট ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ তার আগের বছরের চেয়ে কম ছিল।

2নং এবং 3নং সারণী থেকে দেখা যাবে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ এবং তাদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি নিয়মানুযায়ী যতবার বসবার কথা ততবার বৈঠকে বসেনি। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতির হার কোথাও সন্তোষজনক ছিল না।

তাছাড়া, জেলা পরিষদের আয়ের উৎস খুবই সামান্য ছিল। আর আঞ্চলিক পরিষদের আয়তো সত্যিকারের বলতে গেলে একেবারেই ছিল না। সরকারী মঞ্জুরী বা অনুদানই ছিল এইসব সংস্থার আয়ের প্রধান উৎস। আর এইসব টাকা দেওয়া হত নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প বাবদ। কাজেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে এইসব উচ্চতর পঞ্চায়েতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না।

সারণী সংখ্যা—২ : ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে জেলা পরিষদ এবং তাদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির (জেলাওয়ারী) বৈঠকের সখ্যার তুলনামূলক চিত্র

জেলা পরিষদের নাম	সাধারণ সভা			অর্থ ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বৈঠক			জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত			পূর্তসংক্রান্ত		
	১৯৬৬-১৯৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	১৯৬৮-১৯৬৯	১৯৬৬-১৯৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	১৯৬৮-১৯৬৯	১৯৬৬-১৯৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	১৯৬৮-১৯৬৯	১৯৬৬-১৯৬৭	১৯৬৭-১৯৬৮	১৯৬৮-১৯৬৯
১	২(ক)	২(খ)	২(গ)	৩(ক)	৩(খ)	৩(গ)	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)
বাঁকুড়া	১০	৯	১৩	১৬	২৩	২১	৫	৭	৪	৮	৭	৯
বীরভূম	৩	৪	৪	৬	৫	৮	৪	৩	৩	৪	৩	৯
বর্ধমান	৭	৮	৬	৭	১০	১০	৮	১০	৭	৮	১০	১১
হুগলী	১২	১১	১১	১০	১৪	১১	১২	১৪	৯	১২	১২	১৩
মেদিনীপুর	৪	১০	৫	১০	৯	৫	৬	৫	৩	৭	৬	৬
পুরুলিয়া	৪	৯	৮	১৯	১২	৭	৩	৭	—	৫	২	৩
হাওড়া	১৩	১৪	১৪	১৩	১৩	১২	১২	১০	৯	১৩	১২	১২
মুর্শিদাবাদ	৯	৭	৫	১১	১০	১২	৯	২	—	৩	১১	৭
নদীয়া	১১	১১	১৩	১১	১৪	১৫	৩	১	১	১০	৯	১১
চব্বিশ-পরগণা	৭	১১	৯	১৫	১২	৯	১৩	৫	৬	৮	৫	৮
কোচবিহার	৭	৭	৮	৬	৯	২	৬	২	২	৫	৬	৩
দার্জিলিং	৮	৪	৪	১০	১০	৯	৪	২	২	১১	৮	১০
জলপাইগুড়ি	৪	৬	৭	৬	৯	৮	৫	২	১	৬	৬	৯
মালদা	৮	৩	৬	৮	৬	৯	৬	২	৪	৪	২	৩
পশ্চিম দিনাজপুর	৬	৯	১০	৮	১৭	৮	৮	৯	৬	১২	৬	৫

জেলা পরিষদের নাম	কৃষি ও সেচ			শিল্প ও সমবায়			জনসমাজকল্যাণ			প্রাথমিক শিক্ষা		
	১৯৬৬-১৯৬৭ ৬(ক)	১৯৬৭-১৯৬৮ ৬(খ)	১৯৬৮-১৯৬৯ ৬(গ)	১৯৬৬-১৯৬৭ ৭(ক)	১৯৬৭-১৯৬৮ ৭(খ)	১৯৬৮-১৯৬৯ ৭(গ)	১৯৬৬-১৯৬৭ ৮(ক)	১৯৬৭-১৯৬৮ ৮(খ)	১৯৬৮-১৯৬৯ ৮(গ)	১৯৬৬-১৯৬৭ ৯(ক)	১৯৬৭-১৯৬৮ ৯(খ)	১৯৬৮-১৯৬৯ ৯(গ)
বাঁকুড়া	৩	২	১	২	—	—	৬	৫	৫	—	—	—
বীরভূম	৫	২	৫	৪	—	—	১	৪	৪	৮	৮	৪
বর্ধমান	৯	১০	৫	৭	৮	৩	৮	৮	৬	—	—	—
হুগলী	১৩	১২	৬	১১	১২	৭	১২	১২	৫	—	—	—
মেদিনীপুর	৪	২	২	২	৩	—	২	৪	৩	—	—	—
পুরুলিয়া	১	২	৩	১	৪	—	—	—	২	—	—	—
হাওড়া	১২	৯	৮	১	৪	—	—	—	২	—	—	—
মুর্শিদাবাদ	৫	২	—	৫	৪	—	৯	৮	৮	—	—	—
নদীয়া	১১	২	৪	৬	২	২	৮	৩	২	—	—	—
চব্বিশ-পরগণা	৬	৩	১	৩	৪	৬	৭	২	৪	—	—	—
কোচবিহার	৭	—	২	৭	—	—	৬	—	১	১৫	—	—
দার্জিলিং	৭	২	—	৩	২	—	৫	৪	৩	৫	৪	৪
জলপাইগুড়ি	৭	৩	১	২	১	—	৩	২	২	—	—	—
মালদা	৫	১	১	৫	৩	২	৫	২	৩	—	—	—
পশ্চিম দিনাজপুর	৫	৪	২	৩	২	১	৫	৬	২	—	—	—

সূত্র : পঞ্চায়েত অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সারণী সংখ্যা—৩ : ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সালে আঞ্চলিক পরিষদ ও ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির (জেলাওয়ারী) বৈঠক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

জেলার নাম	সাধারণ সভা		অর্থ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত		জনস্বাস্থ্য		পূর্ত		কৃষি ও সেচ		শিল্প ও সমবায়		জন ও সমাজ কল্যাণ		প্রাথমিক শিক্ষা		অন্য যে কোন কমিটি	
	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
বাঁকুড়া	৭৬	৬৫	৭৮	৬০	৩৮	২৩	২০	২৩	৪১	৪১	১৩	১৩	২২	১৩	৯	৩	—	—
বীরভূম	৬৫	৮০	৮২	৬৩	৫৫	৪২	১২	২৪	৪০	৩৯	২০	১৮	২৬	১৪	৬	২	—	—
বর্ধমান	১০৮	৯২	১১১	৯৪	৭১	৫৩	৪৩	৫৬	৪৭	৬৬	২৩	২৮	৩২	৪২	১৪	৫	—	—
হুগলী	১৪৩	১১২	১০০	৯৩	৫১	৩৬	৬১	৩৫	৭০	৮৪	২৮	২৪	৩৩	২৮	২৯	১৯	৩	—
মেদিনীপুর	১৪২	১৬২	১৬০	১৩৩	৯২	৫৬	৪৮	৫৪	১২৮	১৭৫	৩৫	১৮	৬৩	৫৫	৪৬	২৬	১	১
পুরুলিয়া	৬৮	৭৫	৬৩	৪৪	২০	১৩	১০	২২	৩৩	৫০	২৩	১৪	৫	১১	১১	৬	—	—
হাওড়া	৫৬	৬০	৫৩	৫২	২৬	২০	২০	১৯	৪১	৩৭	২৫	১১	২২	১৯	২৫	১০	—	—
মুর্শিদাবাদ	৮৫	১২১	৯৯	৯০	৬২	৬৮	১৭	২৯	৪২	৬৭	১৫	১৬	২৬	১৪	৭	৩	—	—
নদীয়া	৫৮	৬৫	৬২	৫১	২৩	১৫	১৮	২৯	৫৪	৫৫	১৮	২৫	২৩	১১	১৬	২৬	—	১
চব্বিশ-পরগণা	১৫১	১৪৩	১৬৮	১২৩	৫৩	৩৯	৭৬	৫৬	৯০	৯৩	২৯	১৯	৫৩	৫৫	৪৪	২০	৮	৪
কোচবিহার	৪৯	৩৬	৫৭	৫৬	২৭	৫	৩৮	২২	২৮	১৪	১০	৫	১৯	২৯	৭	১১	২	১
দার্জিলিং	৩৮	৩৬	৩৫	২৭	১৮	৯	৯	১৩	১৯	১৭	১০	—	১৩	৬	৯	২	১	—
জলপাইগুড়ি	৪৯	৭৫	৪০	৪১	৩০	১২	১০	১০	২৭	২৩	৯	৮	১৮	১৮	১০	৯	৩	—
মালদা	৫৫	৪৮	৬২	৪৩	১৭	১৩	১৬	২১	৫০	৬৪	১৫	১৩	১৫	১৯	৯	৬	১	—
পঃ দিনাজপুর	৫১	৬৪	৬১	৪৮	২৭	২১	১৯	৩১	৫২	৪৭	১৬	১৭	২১	৩০	১১	৭	৫	৬

সূত্র : পঞ্চায়েত অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

REFERENCES

1. Figures at a Glance, Panchayati Raj Bodies in West Bengal, 1969-70, Unpublished, Directorate of Panchayats, Government of West Bengal.
2. West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 7.
3. U. P. Panchayat Raj Act, 1947, Sec. 5.
4. Field Investigation.
5. West Bengal Panchayat Rules, 1958, Rule 137.
6. U. P. Panchayat Raj Act, 1947, Sec. 41 (1) (2).
7. Report of the Committee on Panchayati Raj, Bangalore, 1963.
8. Second Five Year Plan, Planning Commission, Government of India, 1957, P. 154.
9. Report of the Committee, Calcutta Gazette extraordinary, February 14, 1956, P. 221.
10. West Bengal Panchdyat Act, 1957, Sec. 17 ; সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিদর্শক হিসাবে কাজ করেন।
11. West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 31.
12. Shri B. D. Mahapatra, West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Vol. XV, No. 3, P. 27.
13, West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 26 (1).
14. Ibid, Sec. 46.
15. West Bengal Zilla Parishads Act, 1963, Sec. 52.
16. Ibid, Sec. 57 ; West Bengal Zilla Parishads (Amendment) Act, 1967, Sec. 9,
17, West Bengal Zilla Parishads Act, 1963, Secs. 17, 18, 64 & 65.
18. District Administration Report, 1912-13, Government of Bengal, P. 83.
19. Annual Administrative Report of Panchayati Raj Bodies, 1967-68, (unpublished), Directorate of Panchayats, Government of West Bengal, 1970, Preface, P. 2.

চতুর্থ অধ্যায়

নয়া পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও গঠন

১৯৭৩ সালের আইন : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের মূল কাঠামো ছিল চার স্তরের। ১৯৫৭ সালের আইন অনুসারে স্থাপিত হয়েছিল সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তার ওপরে পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় অঞ্চল পঞ্চায়েত। আর উচ্চতর দুটি স্তর—ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী। পরবর্তীকালে এই আইন দুটির বদলে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ নামে একটি নতুন ব্যাপক আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের দ্বারা পল্লী প্রশাসনের চার-স্তরের কাঠামো ত্রিস্তর কাঠামোতে পরিণত করা হয়। এই তিনটি স্তর হল পুরাতন অঞ্চল স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।

এ রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে। এর পর প্রতি চার বছর অন্তর সমস্ত সংস্থাগুলির নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে নতুন আইনের কাঠামোতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন একই দিনে তিন স্তরের পঞ্চায়েত সংস্থায় (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) প্রত্যক্ষ নির্বাচন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলভিত্তিক এই প্রত্যক্ষ নির্বাচন শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এক স্বচ্ছতাপূর্ণ ও শান্তিময় পরিবেশে গ্রাম বাংলায় 2·5 কোটি ভোটার অসীম উৎসাহে 30 হাজার নির্বাচনী এলাকায় 56 হাজার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক কাঠামো
গ্রাম পঞ্চায়েত:
নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য
প্রধান
উপ-প্রধান
সচিব ও
অন্যান্য কর্মিবৃন্দ
স্থায়ী সমিতি
কর্মাধ্যক্ষ
সচিব
অর্থ ও সংস্থা
পূর্তকার্য
কৃষি, সেচ,
সমবায়
অঞ্চল পঞ্চায়েত:
নির্বাচিত পদাধিকার বলে
ও মনোনীত সদস্য
সভাপতি
সহকারী সভাপতি
নির্বাহী অধিকারিক
(পদাধিকার বলে বি, ডি, ও)
সচিব
(পদাধিকার বলে
ই, ও, পি)
বিভিন্ন বিভাগ
স্থায়ী সমিতি
কর্মাধ্যক্ষ
সচিব
শিক্ষা
ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ
জনকল্যাণ
উন্নয়ন
পরিকল্পনা
ভূমি সংস্কার
মৎস্য ও
পশুপালন
(ক্রমশঃ)

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা পরিষদ
নির্বাচিত পদাধিকার বলে ও মনোনীত সদস্য
স্থায়ী সমিতি
কর্মাধ্যক্ষ
সচিব
অর্থ ও সংস্থা
জনস্বাস্থ্য
পূর্তকার্য
কৃষি, সেচ, সমবায়
সভাধিপতি
সহকারী সভাধিপতি
নির্বাহী আধিকার
(পদাধিকার বলে ডি, এম)
সহকারী নির্বাহী আধিকার
(ডি, এম পদমর্যাদার)
সচিব
(সরকার প্রেরিত)
বিভিন্ন বিভাগ
স্থায়ী সমিতি
কর্মাধ্যক্ষ
সচিব
শিক্ষা
ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ
উন্নয়ন, পরিকল্পনা ভূমি সংস্কার
মৎস্য ও পশুপালন

সারণী সংখ্যা—4
জেলা ভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান

	জেলার নাম	পরিষদের সংখ্যা	সমিতির সংখ্যা	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা (Under injunction)
1.	বাঁকুড়া	1	22	190	—
2.	বীরভূম	1	19	169	1
3.	বৰ্দ্ধমান	1	23	224	—
4.	হুগলী	1	17	201	—
5.	মেদিনীপুর	1	52	515	—
6.	পুরুলিয়া	1	20	169	—
7.	হাওড়া	1	14	165	—
8.	মুর্শিদাবাদ	1	26	251	2
9.	নদীয়া	1	16	182	—
10.	২৪-পরগণা	1	50	549	1
11.	কোচবিহার	1	11	128	—
12.	দার্জিলিং	1	10	76	—
13.	জলপাইগুড়ি	1	13	122	—
14.	মালদহ	1	15	144	—
15.	পশ্চিম দিনাজপুর	1	16	157	2
	মোট		324	3242	6

উৎস : পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে 15টি জেলা পরিষদ, 324টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। এই সব এলাকার মোট 330 লক্ষ লোক বর্তমানে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে। গড়ে প্রতি 8 হাজার লোকের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সমগ্র

পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে 335টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক। এর সবগুলোতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নেই। ব্লক পর্যায়ে মাত্র 324টি পঞ্চায়েত সমিতি আছে। এর কারণ যাদবপুর-বেহালা ব্লক এলাকায় সম্প্রতি পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে এবং বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার কয়লাখনি এবং শিল্পাঞ্চলের 10টি ব্লকে এখনো পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়নি। সম্প্রতি সরকার ঘোষণা করেছেন যে যতশীঘ্র সম্ভব ঐ সব এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ সারণী নং 4 থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত

সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিটি জেলা কয়েকটি ব্লকে এবং প্রতিটি ব্লক কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে 'গ্রাম' বলতে বোঝায় যে কোন মৌজা বা মৌজার অংশ বা পাশাপাশি কয়েকটি মৌজা।[1] প্রতিটি গ্রামে ঐ গ্রামের নামে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। পঞ্চায়েত হল একটি যৌথ সংস্থা যার স্থায়ী পারম্পর্য এবং একটি সাধারণ শীলমোহর আছে। এই সংস্থা আদালতে মামলা করতে পারে এবং আদালতে একে অভিযুক্ত করা যায়। এর সদস্য সংখ্যা অনধিক পঁচিশ এবং সর্বনিম্ন সাতজন। পাঁচ বছরের জন্য এই সংস্থা নির্বাচিত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনী তালিকায় নাম রয়েছে এমন ব্যক্তিরা এই সংস্থার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। নির্বাচনের সুবিধার জন্য একটি গ্রামের এলাকাকে তিন থেকে চৌদ্দটি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত হবে তা নিম্নোক্ত ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।[2]

(1) দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলিতে প্রতি একশো পঁচিশ ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য এবং একশো পঁচিশ জনের কম ভগ্নাংশ পিছু একজন অতিরিক্ত সদস্য;

(2) অন্যান্য এলাকায় প্রতি পাঁচশো ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য এবং পাঁচশো জনের কম ভগ্নাংশ পিছু একজন অতিরিক্ত সদস্য।

মনে রাখা দরকার যে কোন ব্যক্তি ন্যায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্য হলে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবেন না।

অন্যভাবে বলা যায়, একসঙ্গে এক স্তরের বেশি স্তরে কোন ব্যক্তি নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন না। তিনি সরকারী বা কোন পঞ্চায়েতী সংস্থায় কর্মচারী হতে পারবেন না। কিংবা কোন পঞ্চায়েতের ঠিকাদারের কর্মচারী হতে পারবেন না। তাছাড়া দায়মুক্ত হয়নি এমন দেউলিয়া, অপরাধী বা অপ্রকৃতিস্থ মনের ব্যক্তি কিংবা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্ধারিত কর, অভিকর, শুল্ক বা মাশুল বকেয়া রেখেছেন এমন ব্যক্তি পঞ্চায়েতের কোন সংস্থার সদস্য হতে পারেন না।[৪]

একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হলে তাদের অপসারিত করবার কোন ক্ষমতা প্রায় পঞ্চায়েতের বা ভোটদাতাদের নেই। একমাত্র মহকুমা শাসক তাঁদের বিভিন্ন কারণে অপসারিত করতে পারেন। এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হলে, পর পর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে, কর বা ফি না দিলে প্রভৃতি। এইসব কারণে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অভিযুক্ত হলে তাকে কেন অপসারিত করা হবে না তার কারণ দর্শাবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাতে তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে রাজ্যসরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রিশ দিনের মধ্যে তাঁর আপীল করবার অধিকার আছে এবং ঐ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।[4]

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রত্যাহার বা অনাস্থা প্রস্তাব আনার পদ্ধতিটি একটি গণতন্ত্র সম্মত বিশেষ অধিকার বলে স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির মত ১৯৪৮ সালে আসাম গ্রামীণ পঞ্চায়েত আইনেও এই সদস্য প্রত্যাহারের পদ্ধতিটি গৃহিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৭ অথবা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে এরকম কোন বিধি সংযুক্ত হয়নি। হয়তো এই মনে করেই যে, দলাদলি কিংবা জাতি বা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে এই প্রত্যাহার বা অনাস্থা আপনের ক্ষমতা গ্রামবাসীরা অপব্যবহার করতে পারেন। ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব গ্রাম পঞ্চায়েত আইনে কিন্তু এই বিশেষ ধারাটি রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক মনোভাব যাতে ভালোভাবে সক্রিয় থাকে তার জন্য মনে হয় পশ্চিমবঙ্গেও এক ধরনের সীমিত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তবে একটি উচ্চ পর্যায়ের সরকারী সংস্থার তত্ত্বাবধানেই এই পদ্ধতিটি বলবৎ করতে হবে।

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত তার প্রথম কোরামবিশিষ্ট সভায় তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান এবং অপর একজনকে উপ-প্রধান পদে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের এই ধারাগুলির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ পঞ্চায়েত আইনের ধারাগুলির এক তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উত্তরপ্রদেশে গ্রামসভার সদস্যদের দ্বারা গাঁও-পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের জন্য। আর উপ-প্রধানকে গাঁও-পঞ্চায়েত তার সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রতি বছর নির্বাচিত করেন।

উত্তর প্রদেশের মত রাজস্থান, বিহার, আসাম এবং হিমাচল প্রদেশেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টকে সরাসরি নির্বাচিত করেন গ্রামসভা। এই সরাসরি নির্বাচনের জন্যই এসব রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এই পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন হন। ফলে গ্রামের জনসাধারণের ওপর প্রধানের কর্তৃত্বও বেড়ে যায়। তাই অনেকে মনে করেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গ্রামের জনগণের প্রতি যাতে দায়িত্বশীল হন তার জন্য এই সরাসরি নির্বাচন দরকার। পরোক্ষ নির্বাচনের তুলনায় এই পদ্ধতিটিতে অসাধুতার অবকাশও কম থাকে। কিন্তু এর ফলে হয়ত সাংগঠনিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কর্তৃত্বের দিক থেকে অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় প্রধানের ক্ষমতা বেশী হওয়ায় সদস্যদের উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এমন একটা অবস্থা দেখা দিতে পারে যখন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য প্রধানের ওপর আস্থা হারাতে পারেন বা নানামত পোষণ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে তাই প্রধান পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্য থেকে এ রাজ্যে তিনি নির্বাচিত হন। সমান পদাধিকারীদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থানের অধিকারী।

পদাধিকারীদের দক্ষতার ওপরেই এই বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার সুষ্ঠ পরিচালনা নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামের মানুষ নিরক্ষর বটে কিন্তু তারা সবাই অশিক্ষিত নয়, অনেক রাজনৈতিক সচেতন। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যপদের জন্য যদি কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় তা হলে এই পল্লী-প্রশাসন সংস্থায় যথেষ্ট স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-সম্পন্ন উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটবে। অবশ্য সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের কোন নিরক্ষর গ্রাম

পঞ্চায়েত প্রধান নেই। সম্ভবত এইজন্যই কোন রাজ্যের পঞ্চায়েতী আইনে এই বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার সদস্যদের জন্য কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা হয়নি। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান এবং সদস্যদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা নেই। অন্য কোন যোগ্যতার কথাও এই আইনে বলা হয়নি। তার বদলে এই আইনে সদস্যপদের পক্ষে অযোগ্যতার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বি. ডি. ও.) কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান বা তার কোন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন। বি. ডি. ও. তা গ্রহণ করবার পরেই কেবলমাত্র তা বলবৎ হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈঠক ডাকতে হয়।[5] তবে আইনে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নি। সুনির্দিষ্ট প্রমাণযোগ্য কারণে এদের অপসারণের ব্যবস্থা আইনে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। সেটা উল্লেখ না থাকায় পঞ্চায়েত সদস্যগণ যে কোন অজুহাতে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণের সুযোগ পাবেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সুযোগের ব্যবহার ঘটতে পারে।[6]

গণতান্ত্রিক উপায়ে অপসারণ ছাড়াও লিখিত আদেশক্রমে রাজ্যসরকার অযোগ্যতার দায়ে বা অনুরূপ কারণে যে কোন প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করতে পারেন। অপসারণের কোন আদেশ জারি করার আগে রাজ্যসরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিয়ে থাকেন।[7] এ ক্ষমতাটি নিঃসন্দেহে রাজ্যসরকারের এক বড় ক্ষমতা। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনেও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে অপসারণের ধারাগুলি ছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে যেমন আপীলের সুযোগ আছে ১৯১৯ সালের আইনে তা ছিল না। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌর আইনে কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন পৌরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারিত করবার ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আশঙ্কা করা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন দল বিরোধী

দলভুক্ত কোন প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারিত করবার জন্য এই অগণতান্ত্রিক ধারাটির অপব্যবহার করতে পারে এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি বৈঠক ডাকতে হয়। এই মাসিক বৈঠক ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত চারজন সদস্য সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে প্রধানের নিকট বৈঠক আহ্বানের দাবি করতে পারেন এবং এ জাতীয় দাবি জানালে প্রধান সাত দিনের মধ্যে এই বৈঠক আহ্বান করতে বাধ্য।[৪] কর্ণাটকে গ্রামসেবক ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হয়। সেখানে তাঁদের ভোট দেবার অধিকার না থাকলেও তাঁরা আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। এটা অগনতান্ত্রিক হলেও এর স্বপক্ষে বলা যায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালাতে প্রথম দিকে গ্রামের লোকদের সাহায্য করবার ব্যাপারে গ্রামসেবকদের জড়িত করাই বাঞ্চনীয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, গ্রামসেবকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করবেন।

এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠকে ন্যূনতম চারজন সদস্য সাপেক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের দ্বারা সভার কোরাম গঠিত হয়।[৭] সরেজামিন সমীক্ষায় দেখা গেছে, কোরামের অভাবে অনেক সময়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এ খবরও পাওয়া গেছে যে, প্রয়োজনীয় কোরাম ছাড়াই অনেক সময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরে সে বৈঠকের বৈধতা রক্ষার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলির স্বপক্ষে অনুপস্থিত সদস্যদের বাড়ী থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে। গণ-তান্ত্রিক দায়িত্ব ও অধিকারের প্রতি জনসাধারণের কতদূর অনীহা রয়েছে তা এথেকেই বোঝা যায়। সুতরাং গ্রামীণ জনসাধারণের এই মনোভাব বদলাতে হবে।

পঞ্চায়েত সমিতি

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের বর্তমান কাঠামোয় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্লকের এলাকা এমন বৃহৎ যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে তার সব কাজকর্ম

সম্পাদন করা সম্ভব নয়। অথচ এমন ছোট যাতে ব্লকের সমস্ত বাসিন্দারাই এর কাজর্ম ও পরিচালনায় আগ্রহী হয়। যে উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল তা হয়তো সফল হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদের এলাকা এত বেশী বড় হয়েছে যে এই সংস্থাটি গ্রামবাসীর যথেষ্ট দৃষ্টি বা মনোযোগ পায়নি। তাছাড়া সাধারণ গ্রামবাসীর কাছ থেকে অনেক দূরে এর অধিষ্ঠান। সুতরাং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের এক কার্যকরী ইউনিট জেলা পরিষদ হতে পারে না। ব্লকের জনসংখ্যা বা আয়তন এমন ছোট নয় যাতে আর্থিক দিক থেকে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক সংস্থাগঠনের মূল উদ্দেশ্য তাতে ব্যহত হয়। সুতরাং গ্রামের মানুষের কাছাকাছি হওয়া এবং তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার দিক দেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে ব্লকই উপযুক্ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা দরকার, একটি ব্লকে সাধারণত একশটি গ্রাম থাকে। আর এর লোকসংখ্যা হয় ষাট থেকে সত্তর হাজার। অর্থাৎ ব্লকের আয়তন অনেকটা একটি থানার আয়তনের মত। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর ভিত্তিতে কোন থানার লোকসংখ্যা যদি এক লক্ষ বা তার বেশী হত তাহলে কম বেশী সমান সংখ্যক অঞ্চল নিয়ে দুটি ব্লক গঠিত হত। কিন্তু গত তিন দশকে প্রতিটি ব্লকের জনসংখ্যা প্রায় 20 শতাংশের বেশী বেড়ে গিয়েছে। ফলে ব্লক অফিসের পক্ষে তার আওতাভুক্ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য যা দরকার তা' হল ব্লকের আয়তন নতুন করে নির্ধারণ করে দেওয়া। এটা করতে গিয়ে ব্লকের সীমা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে তাও স্থির করতে হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক আগে থেকেই একটি উন্নয়নের ইউনিট হিসেবে কাজ করে চলেছে। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী ব্লকে রয়েছে। প্রশাসন ও পরিকল্পনার একটি ইউনিট হিসাবে উন্নয়ন ব্লকে ব্যবস্থা যে অব্যাহত থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। পল্লীর জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীন অগ্রগতিই এই উন্নয়ন ব্লক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য।

প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেছেন ঐ ব্লকের নামে।[10] এটি একটি যৌথ সংস্থা যার নিজস্ব কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর সম্পত্তি অর্জন করা, রক্ষা করা এবং বিক্রয় করবার অধিকার আছে। আছে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা। পঞ্চায়েত

সমিতি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং এর বিরুদ্ধেও আদালতে অভিযোগ পেশ করা যায়।

প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি তিন প্রকারের সদস্য নিয়ে গঠিত।[11] তাঁরা হলেন: (a) ব্লকের প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, পদাধিকার বলে; (b) প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে অনধিক তিনজন গ্রামের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য; (c) ব্লক বা ব্লকের কোন অংশ থেকে নির্বাচিত লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য। এদের কেউ মন্ত্রী হলে সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নতুন পঞ্চায়েত কাঠামোয় সহযোগী সদস্যপদের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহক অফিসার হিসাবে সমিতির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। রাজ্যসরকার প্রতি গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ধার্য করে দেন। যে উপায়ে এই সদস্য সংখ্যা নিরূপিত হয় তা হল নিম্নরূপ।[12]

ভোটদাতার সংখ্যা	প্রতি গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা	পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার সংখ্যা
(a) দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলির জন্য 800	1	1
এবং তার নীচে 801 থেকে 1200 পর্যন্ত,	2	2
1201 থেকে তদূর্দ্ধে।	3	3
(b) পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য 3,000	1	1
এবং তার নীচে, 3,001 থেকে 6,000 পর্যন্ত,	2	2
6,001 থেকে তদূর্দ্ধে	3	3

জেলা পরিষদ

কলকাতা বাদে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ রয়েছে। পরিষদের এক্তিয়ারে রয়েছে সেই জেলার প্রশাসনিক বা রাজস্ব এলাকা। অবশ্য কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকা পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে। সমিতির মত পরিষদও একটি যৌথ সংস্থা এবং তার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার ও একটি শীলমোহর আছে।

পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদ তিন প্রকার সদস্যদের নিয়ে গঠিত[13] : (1) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পদাধিকার বলে; (2) জেলার প্রতি ব্লক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত দু'জন প্রতিনিধি ; এবং (3) জেলা থেকে বা জেলার কোন অংশ থেকে লোকসভা বা বিধানসভায় নির্বাচিত এবং জেলায় বসবাসকারী রাজ্য-সভার সদস্যগণ যারা মন্ত্রী নন।

যাদের নাম চলতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় আছে, তারাই সমিতি বা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে এবং নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন। তবে একই সঙ্গে তিন স্তরের নির্বাচন প্রার্থী হওয়া যায় না, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি পরিষদের সদস্যপদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তিনি যদি পঞ্চায়েতের কোন স্তরে বা সরকারী কর্মচারী হন অথবা তিনি যদি অঘোষিত দেউলিয়া বা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হন। অসদাচরণের দায়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের চাকুরী থেকে বরখাস্ত কোন কর্মী অথবা নৈতিক দুষ্প্রবৃত্তিজনিত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিও সদস্যপদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ঐ সমিতি বা পরিষদ বা নির্বাচকমণ্ডলী ঐ সদস্যকে অপসারিত করতে পারেন না। তবে সমিতির ক্ষেত্রে জেলা শাসক এবং পরিষদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার সদস্যদের অপসারিত করতে পারেন। অপসারণের কারণগুলি আইনে উল্লেখ করা আছে এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কোন সদস্য ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হলে, পর পর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে, বকেয়া কর বা ফি না দেওয়া হলে, প্রভৃতি। এইসব কারণে কোন সদস্য অপসারিত হলে ঐ সদস্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ দানের ত্রিশ দিনের মধ্যে

আপীল করতে পারেন এবং এরকম আপীলের ক্ষেত্রে ঐ কর্তৃপক্ষের আদেশই চূড়ান্ত।[14]

প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিতে একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি থাকেন। ঠিক তেমনই জেলা পরিষদে থাকেন একজন সভাধিপতি ও একজন সহকারী সভাধিপতি। তাঁরা সমিতি বা পরিষদের প্রথম বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে থেকে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণ ঐ পদগুলির জন্য প্রার্থী হতে পারেন না।

সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি সাধারণত পাঁচ বছর নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। তবে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এঁরা পদত্যাগ করতে পারেন। অথবা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব গ্রহণ করে এঁদের অপসারিত করতে পারেন। এজন্য অবশ্য একটি বিশেষ বৈঠক ডাকতে হয়। তবে আইনে এঁদের অপসারণের কোন কারণ উল্লেখ করবার কথা বলা হয়নি। তাই অন্যভাবে বলা যায়, সমিতি বা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারালে ঐ সংস্থাগুলির প্রধানদের সরে যেতে হয়।

এছাড়া, পঞ্চায়েত আইনের কোন বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করলে অথবা পালন করতে অস্বীকার করলে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে রাজ্য সরকার যে কোন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি কিংবা যে কোন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারিত করতে পারেন। অবশ্য অপসারণের কোন আদেশ জারী করার আগে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিয়ে থাকেন।[15]

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুরাতন আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে যেমন ছিল তেমন কমিটি ব্যবস্থাই চালু রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রত্যেক সমিতি বা পরিষদে আটটি করে স্থায়ী কমিটি আছে—(1) অর্থ ও সংস্থা, (2) জনস্বাস্থ্য, (3) পূর্তকার্য, (4) কৃষি, সেচ ও সমবায়, (5) শিক্ষা, (6) ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ, (7) উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার, এবং (8) মৎস্য ও পশুপালন। প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে সমিতি বা পরিষদ আরও স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে।[15a]

পশ্চিমবঙ্গে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতী রাজ গঠনতন্ত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমান আইনে সর্বস্তরে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাতেই এটা সুস্পষ্ট যে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সদস্যরা সম্পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। এই গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা মনে করেই পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাছাড়া পঞ্চায়েত আইনের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মহিলাদের জন্য দুটি আসন এবং তফসিলী ও আদিবাসী শ্রেণীর জন্য দুটি আসন প্রতিটি পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানে মনোনয়নের ব্যবস্থা। বাস্তবিকই তফসিলী ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও তাদের মধ্যে থেকে সদস্য নির্বাচন সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই করা দরকার। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদে মহিলা ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান আইনে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটি স্তরে তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং মহিলা সদস্য সরাসরি নির্বাচিত না হলে রাজ্য সরকার তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুজনকে এবং মহিলাদের মধ্য থেকে দুজনকে ঐ স্তরের পঞ্চায়েতের সদস্য নিযুক্ত করবেন।[16] এই বিধানটি রাজ্যস্তরে ক্ষমতাসীন দলকে পেছনের দরজা দিয়ে তাঁদের পার্টির লোকজনকে যথেষ্ট সুযোগ এনে দিতে পারে। 'গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মনোনয়নের ক্ষমতা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানেরই থাকা বাঞ্ছনীয়।'[17] তাই বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আইনটি সংশোধন করেছেন এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই এই মনোনয়নের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করেছেন।[18] কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের এক বিরাট অংশ—গ্রামীণ কারিগর ও কারুশিল্পীদের কোন প্রতিনিধি পঞ্চায়েতে নেই। সুতরাং তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত এই সম্প্রদায়ের জন্যও পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ করা দরকার বলে মনে হয়।

সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে জেলা পরিষদ একদিকে নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে যুক্ত এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সঙ্গেও জড়িত। ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে একটা

কার্যকরী সংযোগ জেলা পরিষদের মাধ্যমে ঘটেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য থাকায় তিন স্তরের মধ্যে যোগাযোগের একটা সেতু রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রধানগণকে জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য জেলা পরিষদের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের, সমিতির ন্যায় সরাসরি যোগাযোগের কোন সুবিধা নেই। জেলা পরিষদে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া সঙ্গত হত। প্রতি মহকুমা থেকে একজন বা দুজন প্রধানকে জেলা পরিষদে সদস্য হিসাব রাখা যেতে পারে।

গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উচ্চতর দুটি স্তরে সংসদ ও রাজ্য বিধান-মণ্ডলীর সদস্যদের নির্বাচিত করবার নীতিটি এই যুক্তিতে সমর্থন করা হয়েছে যে এসব নেতাদের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সঙ্গে সংসদ বা বিধানসভার একটা সংযোগ গড়ে উঠবে এবং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উচ্চতর স্তরে সদস্যদের অর্পিত অভিজ্ঞতাগুলি এইসব ব্যবস্থার কাজে লাগবে। এই যুক্তিতে প্রথম দিকেই কেবল পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা-গুলিতে পদাধিকার বলে এম. এল. এ. ও এম. পি-র সদস্যপদ সমর্থন করা চলে। কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্বকে উৎসাহিত করাই যদি পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাঁদের এখন আর এইসব সংস্থার সদস্য থাকা উচিত নয়। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে পদাধিকার বলে এম. এল. এ. ও এম. পি.-রা সদস্য হবেন এই ধারাটি আসলে সেই নীতিরই বিরোধী যাতে বলা হয়েছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যত তাঁদের কাছা-কাছি থাকবেন গণতান্ত্রিক নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা ততই গুরুত্বপূর্ণ হবে। পদাধিকার বলে নির্বাচিত এইসব সদস্যগণের পুরো ভোটাধিকার রয়েছে। অপরদিকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের দায়িত্বের পরিধি বেড়ে চলেছে। ফলে একই সঙ্গে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের পক্ষে জনগণের প্রতি সুবিচার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আইনসভার সদস্যদের কর্মক্ষমতা এর ফলে ক্ষুণ্ণ হয়। তা ছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে আইনসভার সদস্যদের যোগদানের ফলে এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে আর এক ধরনের অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় দলাদলি।

আনুকূল্য বণ্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাত এবং প্রশাসনিক দলাদলির দরুন নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তাঁরা তাঁদের প্রভাবের দ্বারা এইসব সংস্থার কর্মীদের মনোবল ক্ষুণ্ণ করেন। পক্ষান্তরে তাঁরা যদি না থাকেন তা হলে পঞ্চায়েত কর্মীরা অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরাও তার ফলে খুব বেশী সুযোগ পাবেন না। এছাড়া তাঁদের অনুপস্থিতি স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশের সহায়ক হবে। সুতরাং পঞ্চায়েতকে দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে হলে এম. এল. এ এবং এম. পি.-দের পঞ্চায়েতের সদস্যপদ দেওয়া এবং এই সংস্থাগুলির প্রশাসনে হস্তক্ষেপ বন্ধ করা দরকার। কিংবা প্রারম্ভিক পর্যায়ে তাঁদের "সহযোগী সদস্য" করা যেতে পারে।[19] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহারাষ্ট্রে আইনসভার সদস্যদের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালের আইন দুটির মত বর্তমান আইনে বড় রকমের বিচ্যুতি হল, সমবায় সংস্থার প্রতিনিধিদের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠাগুলির থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় বিকাশের স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সুসংহত উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি-গুলির পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের সর্বস্তরে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। যদি বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলেই এটা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে পাঁচটি বৃহৎ ফেডারেল সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানদের জেলা পরিষদের সহযোগী সদস্য করা হয়েছে।[20]

১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের সবচেয়ে উল্লেখজনক বৈশিষ্ট্য হল এই যে "গ্রামসভা" সম্পর্কে কোন বিধান এতে নেই। ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রামসভার সদস্যদের বৈঠকের সংস্থান ছিল। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও ত্রিপুরায় অনুরূপ আইনে গ্রামসভাগুলির বছরে দুবার বৈঠক অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এই বৈঠকে গ্রাম পঞ্চায়েত তার কাজকর্মের হিসাব দেয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী পেশ করে। অবশ্য একথা সত্য, কমবেশী আট হাজার লোক নিয়ে গঠিত অপরিমিত আয়তনের গ্রামসভার বৈঠকে ঐ এলাকার সমস্যাদি নিয়ে কোন ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে

তাই প্রস্তাব করা হচ্ছে, জনগণকে জড়িত করা এবং মূল বনিয়াদ থেকে কর্মসূচী উদ্ভাবন করবার জন্য বর্তমান বৃহত্তর গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের বিধান রাখা দরকার। আলোচনা যত ব্যাপকতর হবে সমষ্টিগত প্রয়াসের সাফল্যের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। এভাবে গ্রামবাসীদের দেওয়া সামাজিক অনুমোদন পঞ্চায়েত কার্যনির্বাহের হাত শক্তিশালী করবে। গণতন্ত্র তাহলে সত্যিই গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হবে। ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ইউনিট হিসাবে গ্রামসভা যাতে এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য তাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ অবশ্যই করতে হবে। এই কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল :

(a) খসড়া বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(b) পঞ্চায়েতের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা ও অভিমত দেওয়া।

(c) সমষ্টি সেবা সংগঠন, স্বেচ্ছাশ্রম অথবা বার্ষিক বা অতিরিক্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোন নির্দিষ্ট কাজে স্থানীয় জনগণকে সমবেত করবার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনা করা।

(d) নতুন কর বসানো অথবা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং বার্ষিক কর্মসূচীর বাজেটের বাইরে কোন নতুন কর্মসূচী নিয়ে বিবেচনা করা।

(e) পঞ্চায়েতের বার্ষিক হিসাব পরীক্ষার প্রতিবেদন বিবেচনা করা।"[21]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি পঞ্চায়েত বিভাগ নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কাজের জন্য কত টাকা পঞ্চায়েত পেয়েছে এবং কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার তালিকা জনগণকে দেখাতে হবে। তাছাড়া, পঞ্চায়েত যে সব উন্নয়ণমূলক কাজ করবে এখন থেকে জনগণকে তা' জানাতে হবে এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।[22] কিন্তু জনগণের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ কি ভাবে হবে তা' ঐ নির্দেশে বলা হয়নি।

REFERENCES

1. ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে 41,392 মৌজা আছে। তবে এর মধ্যে 38,074 মৌজায় জনবসতি আছে।
2. **West Bengal Panchayat Election Rules, 1974, Rule 8.**

3. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 8.
4. Ibid, Sec. 11.
5. উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই পদ্ধতিটি চালু রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের মহীশূর (কর্ণাটক) গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় পরিষদ আইনে অনুরূপ একটি ধারা তুলনায় বেশ কঠোর। কর্ণাটকে পঞ্চায়েতের মোট সদস্যদের অনূন্য দুই-তৃতীয়াংশের ভোটেই চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যানকে অপসারিত করা যায়। ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপ-প্রধানকে দুই-তৃতীয়াংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারিত করা যেত।
6. ক্ষেত্রীয় সমীক্ষার সময় অসংঘটিত আলোচনায় এ ধরনের তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।
7. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 213.
8. Ibid, Sec. 16(1).
9. Ibid, Sec. 16(3).
10. Ibid. Sec. 94(1)
11. Ibid, Sec. 94(2)
12. West Bengal Panchayat Election Rules, 1974, Rule 11.
13. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 140(2)
14. Ibid, Sec. 100.
15. Ibid, Sec. 213.

15a. কমিটি-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব অনুভূত হওয়ায় ঐ বিষয় সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত ও পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

16. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 210.
17. এই লেখকের, 'পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের নবীকরণ', পঞ্চায়েতী রাজ, সংখ্যা 12(9), সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ 13.
18. The West Bengal Panchayat Amending Act, 1978, Scc. 7.
19. এই লেখকের, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩, ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৭৯, ভূমিকা, পৃঃ (iii)
20. Maharastra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act, 1961. Sec. 9(1).
21. Panchayati Raj, The Ten Point Test, Dept. of C. D., Government of India, 1961, PP. 17-18.
22. G. O. No. $\frac{\text{7800-Panch}}{\text{1P-29/80.}}$ dt. 10tht April, 1980, Dept. of Panchayats & C. D.

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চায়েতের প্রশাসন ও কর্মচারীবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জেলা ও জেলার নিম্নতর পর্যায়ে সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র করা সম্ভব হয়েছে। অতীতে নীতি নির্ধারণ ও তার রূপায়ণে সরকারী কর্মচারীদের প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ কাজ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বর্তেছে। সে কারণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের সংস্থাগুলি পরিচালনায় সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য অসামরিক কৃত্যকের (সিভিল সার্ভিস) প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা এবং দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করা এই পঞ্চায়েতী কর্মচারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যভাবে বলা যেতে পারে পঞ্চায়েতের দায়দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থায় নয়া আমলাতন্ত্র (bureaucracy) সৃষ্টি হতে চলেছে, এবং এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়।

গ্রামীণ স্তর ঃ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে সচিব আছেন।[1] তাছাড়া রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসার ও কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারেন।[2] এ ছাড়া রাজ্য সরকার তাঁর বিবেচনা মত অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারীদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করবার জন্য রাখতে পারেন। এঁরা রাজ্য সরকারের শৃঙ্খলামূলক নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে কোন প্রস্তাব পাশ হলে এরকম অফিসার বা কর্মচারীদের রাজ্য সরকার ফিরিয়ে নেন।[3]

পঞ্চায়েতের সচিব প্রধানকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম

সম্পর্কে সরেজমীন সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রধানই গ্রামের ভবিষ্যৎ নেতা এবং তাঁর সচিব গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী।

প্রধান ও উপ-প্রধানের ক্ষমতা ও কর্তব্য

১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৮১ সালের গ্রামপঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীতে[4] প্রধান ও উপ-প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল, নথি ও দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রধানের। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ও কার্যনির্বাহক পরিচালনার জন্য সাধারণভাবে দায়ী থাকেন। তাঁকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের এবং রাজ্য-সরকারের যেসব অফিসার ও কর্মচারীকে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের কাজকর্মের ওপর প্রশাসনিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হয়। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতকর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসার বা কর্মচারীকে অসদাচরণ বা কর্তব্যের অবহেলার জন্য সাসপেণ্ড করতে পারেন। অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য তা পাঠাতে হয়। তাছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসার বা কর্মচারীর কৃত্যক (services) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রয়োজন না হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান তাঁদের তিন মাসের নোটিশ বা তার পরিবর্তে তিন মাসের বেতন দিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকলে তিনি ঐ অফিসার বা কর্মচারীদের অনধিক এক মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত করবার আদেশ দিতে পারেন।

প্রধান বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ক্ষমতা ও কাজের দায়িত্ব লিখিতভাবে অর্পণ করেন উপ-প্রধান তা প্রয়োগ করে থাকেন। অবশ্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন ছাড়া কোন আর্থিক ক্ষমতা বা কর্তব্য প্রধান উপ-প্রধানের ওপর হস্তান্তর করতে পারেন না। তাছাড়া, প্রধানের অনুপস্থিতিতে প্রধানের সমস্ত ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার উপ-প্রধান গ্রহণ করেন এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিয়োগ, চাকরীর শর্ত, বেতন ও ভাতা এবং অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন।[5] তিনি নিযুক্ত হন রাজ্যসরকারের দ্বারা। মহকুমাস্তরে নিযুক্ত একটি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমূহের অধিকর্তা তাঁকে নিযুক্ত করেন।

সচিবের পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল, তাঁকে অবশ্যই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা বা তার সমতুল্য অন্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পদে অন্যান্য দিক থেকে যোগ্য বিবেচিত হলে রাজ্যসরকার শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত শিথিল করতে পারেন। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ শেষ না করলে তাঁকে এই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে না। সচিবের ছুটি ও শাস্তি সংক্রান্ত চাকুরীর শর্তাদি মহকুমা শাসকের অফিসের নিম্নতম শ্রেণীর কর্মচারীদের মতই। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সচিবকে ক্যাজুয়াল ছুটি মঞ্জুর করেন। কিন্তু ক্যাজুয়াল ছুটি ছাড়া অন্যান্য ছুটি মঞ্জুর করেন পঞ্চায়েত ইনস্পেক্টর অর্থাৎ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে। সচিবের বিরুদ্ধে কোন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে হলে অবশ্য গ্রাম-প্রধানকে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হয়। ঐ অফিসার এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। অবশ্য জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কোন আদেশের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের কাছে আপীল করা যায় এবং তাঁর রায়ই চূড়ান্ত।

সরকারী কর্মচারীদের মত সচিবরাও গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরো সময়ের কর্মী। তাঁরা অন্যত্র কোন কাজ করতে পারেন না।[6] তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের মতই তাঁরা কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।[7]

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের মিল এপর্যন্তই। পার্থক্য যা তা আইনের একটি ধারায় সুস্পষ্ট। এই ধারায় বলা হয়েছে যে সচিব, অফিসার এবং কর্মচারীদের দেয় বেতন, ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটিসহ তার নিজস্ব প্রশাসনের ব্যয় মেটাবার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিবৎসর অর্থ আলাদা করে রাখবেন। অন্যভাবে বলা যায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে সচিবের বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়।[8] অবশ্য সচিবের বেতন ও ভাতা মেটানোর জন্য রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য দেন। পক্ষান্তরে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা দেওয়া হয় রাজ্যসরকারের তহবিল থেকে। সুতরাং সচিবরা সরকারী কর্মচারী নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হন। যদিও রাজ্যসরকার তাঁদের নিয়োগ করেন এবং তাঁদের বেতন ও ভাতা পুরোটাই পরোক্ষভাবে রাজ্যসরকারই দেন।

এমনকি তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলীও নিরূপণ করেন রাজ্যসরকার। কিন্তু তা হলেও তাঁরা সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হন না।

অনেক রাজ্যেই (যেমন, বিহার, রাজস্থান, কেরালা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র) পঞ্চায়েতের সচিবকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনের খসড়া বিলটিতে পঞ্চায়েতের সচিবকে সরকারী কর্মচারী করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী সদস্যরা এর বিরোধীতা করেছিলেন। কারণ তাঁদের মতে, সচিব যদি সরকারী কর্মচারী হন তবে তিনি অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে মর্যাদায় বড় বলে নিজেকে ভাবতে পাবেন এবং সেভাবে কাজ করতে পারেন। তৎকালীন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান বিরোধী সদস্যদের এই যুক্তি ভিত্তিহীন বলে বিবেচনা করেন। শ্রীজালান যুক্তি দেখান পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের অফিসার। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁরা কাজ করেন রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে। অনুরূপভাবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের সচিবদের তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চল প্রধানের অধীনে কাজ করতে হবে। এক প্রধান চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী এই পদে যোগ দেন। কিন্তু সচিবদের তাদের সকলের অধীনেই কাজ করতে হবে। মন্ত্রী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তি। কিন্তু রাজ্যের বিভাগীয় দপ্তরের সচিব এবং জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসাররা সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অথচ অঞ্চল পঞ্চায়েতের সচিব সরকারী কর্মচারী ছিলেন না। তখনকার বিরোধী সদস্যরা চেয়েছিলেন, অঞ্চল সচিবরা অঞ্চল পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত হোন। কিন্তু এরকম পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত হত না, কারণ অঞ্চল পঞ্চায়েতকে যদি সচিব নিযুক্তি ও অপসারণের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে সেই নিযুক্তি ঘটবে দল, জাতি, সম্প্রদায় বা অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে। এর ফলে অঞ্চল পঞ্চায়েতে দলাদলির সৃষ্টি হবে। কার্যত তা অঞ্চল পঞ্চায়েতের মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করবে। ফলে সচিবের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকবে না। থাকবে না পদোন্নতির সম্ভাবনা।

অবশ্য শ্রীজালান বিরোধী সদস্যদের দাবী কিছুটা স্বীকার করে নিয়ে একটি

আপোষ-সূত্র স্থির করেন। এই সূত্রে বলা হয়, সচিবরা রাজ্যসরকারের দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং তাঁদের বেতন ও ভাতা রাজ্যসরকার বহন করবেন।[৪৯] তবে এ বাবদ টাকাটা অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা দেওয়া হবে। ফলতঃ সচিব অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর্মচারী হবেন এবং তার তহবিল থেকে তাঁকে বেতন দেওয়া হবে। অঞ্চল সচিবকে দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণে রাখবার কারণ এটাই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের বর্তমান অবস্থাটাও এইরকম। এবিষয়ে ১৯৫৭ ও ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করতে হবে।

তাছাড়া এইসব ত্রুটি ও অসুবিধা দূর করতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার কর্মচারীদের নিয়ে একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সার্ভিস গঠন করা যেতে পারে। এই সার্ভিসের কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সার্ভিস কমিশন। কলকাতা পৌরসভায় যেমন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন রয়েছে সেরকম। প্রস্তাবিত এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সার্ভিসের চাকুরীর শর্তাবলী সুনির্দিষ্ট থাকবে। পদোন্নতির সুযোগও এতে থাকবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এর সবগুলিতেই বেতনভুক কর্মচারী রয়েছে। সচিব গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ভারপ্রাপ্ত। পঞ্চায়েতের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ তৈরী, আগের বছরের হিসেব এবং পরের বছর যেসব কাজ হাতে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে পঞ্চায়েত-সচিব সেসব কাজের জন্য দায়ী থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র প্রস্তুত করা, নথিপত্র নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা, হিসাব পরীক্ষকের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করা সচিবেরই দায়িত্ব। তাছাড়া, প্রধান, উপ-প্রধান বা রাজ্যসরকার নির্দেশ দিলে গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ তাঁকে করতে হয়।[৫] গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সচিবদের ওপর তাদের কাজকর্মের ভার দিতে পারেন। এছাড়া সচিবকে খাদ্য ও সরবরাহ, ত্রাণ, চাষ, সেচ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য অনেকগুলি কাজই করতে হয় যদিও এগুলি তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

প্রধান হলেন জনগণ ও সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র। কিন্তু পর্দার অন্তরালে সচিবই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সবকিছু কাজ করেন। সেখানে প্রধান শুধু নাম সই করেন। প্রধান যদি দুর্বল, অলস ও অযোগ্য হয় তবে

তিনি সচিবের হাতের যন্ত্র হয়ে পড়েন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও সদস্যরা যদি নিরক্ষর বা অশিক্ষিত হন সচিবই তখন প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা যদি শিক্ষিত, সক্রিয়, বিচক্ষণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হন তবে পঞ্চায়েতের নীতিগ্রহণ ও রূপায়ণে তাঁরা সক্রিয়-ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে তখন সচিব তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন।

সচিবকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহক অফিসার হিসাবে কাজ করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সাফল্যর জন্য তিনি এক সুস্পষ্ট ভূমিকা নিতে পারেন। সংেজমিন তদন্তে দেখা গেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এও দেখা গেছে প্রধানের সঙ্গে সচিবের সম্পর্ক ভালো বা মধুর নয়। প্রধান সচিবকে কেবল একজন করণিক হিসেবে দেখেন। আবার সচিব নিজেকে প্রধানের চেয়ে উচ্চপদস্থ মনে করেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরা পঞ্চায়েত উন্নয়ন অফিসার বা সমষ্টি উন্নয়ন অফিসারের কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

অবশ্য সচিব যদি সুদক্ষ এবং সুশিক্ষিত হন তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানটিকে আরও ভালোভাবে চালাতে জনগণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সাহায্য করতে পারেন। দেখা গেছে, অনেক সচিবেরই গ্রামাঞ্চলের সর্বসাধারণের কল্যাণে তাদের সবাইকে একত্র করবার মত ক্ষমতা বা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোনটাই নেই। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ব্যর্থতার এটা অন্যতম কারণ। গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবদের নিয়মিতভাবে কিছুদিন পর পর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। অন্যান্য পাঠক্রম ছাড়াও গ্রামসেবকদের যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁদেরও সে ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গ্রাম সেবকদের মতই তাঁদের মর্যাদা এবং সুযোগ দিতে হবে।

তাছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত একজন করে জব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছেন। এদের বিষয় পঞ্চায়েত আইনে কিছু উল্লেখ নেই। সম্প্রতি রাজ্যসরকার এপদের সৃষ্টি করেছেন। ব্লকস্তরে নিযুক্ত একটি কমিটির সুপারিশক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এদের নিয়োগ করেন। এদের নিয়োগ, চাকুরীর শর্ত, বেতন, ভাতা, অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত নিয়মাবলী গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের মতই। তবে এদের কাজ মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করা।

অর্থাৎ সচিবের কাজ পঞ্চায়েত ঘরে। আর কার্যসহায়কের কাজ পঞ্চায়েত ঘরের বাইরে।

নবগঠিত পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যদিয়ে পশ্চিম বাংলার পল্লীসমাজে এক নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয় হয়েছে। গ্রামের মাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু এই দশকের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নূতন নূতন চিন্তাধারা ও কলাকৌশলের সাথে তাঁদের পরিচয় নেই। তাই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে গেলে প্রথম থেকেই অভিজ্ঞ কর্মচারী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটার কথা মনে রেখে সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন যার ফলে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তর প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কর্মচারীদের সহায়তা পাবেন। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে গ্রাম-সেবকদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পেশ করা হয়েছে। গ্রামসেবক তাঁর নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সদস্যদের সাথে যুক্তভাবে কাজ করবেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরী, রূপায়ণ ও হিসাব রক্ষণের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করবেন। আমাদের মনে হয়, গ্রাম সেবককে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী অফিসার (Executive Officer) হিসেবে নিয়োগ করলে পঞ্চায়েত এলাকায় কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সহজ হবে।

এছাড়া প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে আছেন কয়েকজন চৌকিদার ও দফাদার এবং কর আদায়কারী। গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বড় দায়িত্ব হল তার এলাকায় দফাদার ও চৌকিদারদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দফাদার ও চৌকিদারদের সংখ্যা কত হবে, তাদের বেতন, তাদের নিয়োগ, চাকুরীর শর্ত, অবসরের বয়স, পদচ্যুতি প্রভৃতি বিষয় পঞ্চায়েত আইন অনুসারে রাজ্যসরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধারাগুলি ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 51 নম্বর ধারা অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালের আইনের মত ১৯৭৩ সালের আইনেও দফাদার ও চৌকিদারদের রাজ্যসরকার ও গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনমত এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণের সমর্থক নন। গ্রামীণ পুলিসের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাধীনভাবে কোন ব্যবস্থা নেবার সুযোগ খুব কম

রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত দফাদার ও চৌকিদারবাহিনী রাখার খরচ বহন করেন, কিন্তু তাদের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের 23 নম্বর ধারা এবং পুরাতন পঞ্চায়েত আইনের 53 নম্বর ধারার অনেকটা বজায় রেখে বর্তমান আইনে চৌকিদারের বিভিন্ন দায়িত্ব ও ক্ষমতার এক বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে। তার কাজ দিনরাত সর্বসময়ের। অথচ তা সত্ত্বেও চৌকিদারকে একজন আংশিক সময়ের কর্মী বলে বিবেচনা করা হয়। তার বেতন হাস্যকরভাবে কম। এই বেতন অনেক সময়েই বকেয়া থাকে। নিয়মিত বেতন খুব কমই দেওয়া হয়।[10]

অপরদিকে কর আদায়কারীদের নিয়োগ করেন গ্রাম পঞ্চায়েত। এঁদের কাজ এলাকায় নির্ধারিত কর, অভিকর প্রভৃতি সংগ্রহ করা। ঐ বাবদ সংগৃহিত অর্থের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা কমিশন পেয়ে থাকেন। এছাড়া, প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে তাঁদের ভাতা দেওয়া হয়।

এছাড়া, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত অঞ্চল উন্নয়ন কর্মী এখন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করে থাকেন। সরকার কর্তৃক ন্যস্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে কাজের পরিমাপ, টোকেন বিলি ও হিসাব রক্ষার জন্য দৈনিক বারো টাকা মজুরীর ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত একজন করে কর্মসহায়ক নিয়োগ করতে পারেন।

সমিতি স্তর

প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কর্মকর্তা হলেন এর সভাপতি। এই সমিতিতে একজন কার্যনির্বাহক অফিসার ও একজন সচিব আছেন। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহক অফিসার।[11] তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভায় সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে ঐ কার্যনির্বাহক অফিসারকে সরিয়ে নেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রাজ্যসরকার তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সম্পাদক।[12]

সভাপতি ও সহকারী সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিচালনার সাধারণ দায়িত্ব সভাপতির। তিনি সমিতির নথি ও দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকেন। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের এবং পঞ্চায়েত সমিতির কাজে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রেরিত অফিসার এবং কর্মচারীদের কাজকর্মের উপর সভাপতি প্রশাসনিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সভাপতি তাঁর ক্ষমতা, কাজকর্ম ও কর্তব্য সহকারী সভাপতির হাতে লিখিতভাবে হস্তান্তর করলে সহকারী সভাপতি তা পালন করে থাকেন। সভাপতির অনুপস্থিতে তার সমস্ত ক্ষমতা সহকারী সভাপতি প্রয়োগ করেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য কার্যনির্বাহক অফিসার দায়ী থাকেন। তিনি সমিতির সভাপতির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করেন। তিনি সভাপতিকে ব্লক এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রগতি সম্পর্কে এবং কার্যকালীন যে সকল সমস্যা অথবা অসুবিধার উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে অবহিত রাখেন। তিনি সমিতির পক্ষে সকল পত্র বিনিময় (correspondence) করে থাকেন। সমিতির নথিপত্র (records) তাঁর জিম্মায় থাকে। সমিতির যথাযথ হিসাব রক্ষণের জন্য তাঁকে দায়ী থাকতে হয়। সমিতির অফিসের ব্যবস্থাপনার (management) জন্য তিনি সভাপতির নিকট এবং তার মাধ্যম পঞ্চায়েত সমিতির নিকট দায়ী থাকেন। পঞ্চায়েত সমিতি ও তার স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং কার্যসমূহ সম্পাদন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্লক পর্যায়ের সকল অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব কার্যনির্বাহক অফিসারের। তাই তিনি কার্য সম্পাদনের জন্য ঐ অফিসারদের উপর আবশ্যকীয় নির্দেশ দিতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে উক্ত পরিকল্পনা ও কার্যসমূহ সম্পাদন সম্পর্কে প্রগতি প্রতিবেদন (progress report) সংগ্রহ করে নিজ মন্তব্যসহ তা পঞ্চায়েত সমিতি এবং স্থায়ী কমিটিগুলিতে পাঠিয়ে থাকেন। প্রাত্যহিক ক্যাশ বই সই করা, খসড়া বাজেট প্রস্তুত করা পঞ্চায়েত সমিতি এবং সম্ভব হলে স্থায়ী সমিতির সভায় যোগদান করা, প্রভৃতি নানাবিধ দায়িত্ব কার্যনির্বাহককে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তিনি কিছু কিছু দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির সচিবের নিকট হস্তান্তর করতে পারেন।

কার্যনির্বাহক অফিসার পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন এবং ঐ অফিসার বা কর্মচারীর পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনতির জন্য অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির কাছে সুপারিশ করতে পারেন। দুইশত টাকা বা তার অধিক মাসিক বেতনের কোন অফিসার বা কর্মচারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির। কার্যনির্বাহক অফিসার কোন কর্মচারী সম্পর্কে শাস্তির আদেশ দিলে এই আদেশ জারির এক মাসের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আপীল করা যায়। অপরদিকে পঞ্চায়েত সমিতি কোন শাস্তির আদেশ দিলে তার বিরুদ্ধে আপীল করতে হয় বিভাগীয় কমিশনারের কাছে।

পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে একজন বি. ডি. ও-র পক্ষে এককভাবে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহক অফিসার, গ্রাম পঞ্চায়েত-গুলির পরিদর্শক ও ব্লক প্রশাসনের প্রধান হিসাবে কাজ করা অসম্ভব। বি. ডি. ও-র দায়িত্ব লাঘব করবার জন্য এবং যাতে করে তিনি সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী বিষয়ে বেশী সময় দিতে পারেন সেজন্য প্রতি ব্লকে একজন করে জয়েণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। তার কাজ হচ্ছে মূলতঃ উন্নয়ন বহির্ভূত বিষয় তত্ত্বাবধান করা।

এছাড়া, কার্যনির্বাহক অফিসারের দায়িত্ব লাঘব করবার জন্য একটি সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অফিসার (Extention Officer for Panchayats) পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সচিব। তিনি কার্যনির্বাহক অফিসারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করেন। তাঁর কার্যাবলীর জন্য তিনি পঞ্চায়েত সমিতির নিকট দায়ী থাকেন। তাছাড়া, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সচিব। তাঁকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিদর্শক ও হিসাবপরীক্ষক হিসাবেও কাজ করতে হয়।

তিনি পঞ্চায়েত সমিতির নিয়মমাফিক পত্র বিনিময় করে থাকেন। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভা আহ্বান করেন এবং কার্যনির্বাহক অফিসার, সভাপতি ও সহকারী সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ সভার আলোচ্য বিষয়সূচী প্রস্তুত করেন। তাছাড়া, কার্যনির্বাহক অফিসার কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে সচিবকে তা সম্পাদন করতে হয়। পরিশেষে,

কার্যনির্বাহক অফিসারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সকল প্রকার সাহায্য করা সচিবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

উপরিউক্ত অফিসারগণ ব্যতীত প্রত্যেক সমিতির নিজস্ব কারনিক ও পিওন আছেন। রাজ্যসরকারও সরকারী অফিসার বা কর্মচারীদের পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে কাজ করবার জন্য ন্যস্ত করতে পারেন। পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে যে যে সরকারী কর্মচারীকে পেশ করা হয়েছে তার একটা তালিকা (5 নম্বর সারণী) নীচে দেওয়া হল :

সারণী সংখ্যা—5

	কর্মচারীবৃন্দের পদমর্যাদা	যে বিভাগ কর্মচারীদের ন্যস্ত করেছেন
1.	ব্লক উন্নয়ন পরিদর্শক (Supervisor)	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
2.	ব্লক উন্নয়ন পরিদর্শকের অধস্তন কারণিক	„
3.	উপ-সহকারী বাস্তুকার	„
4.	অ্যাকাউণ্টস্ ক্লার্ক	„
5.	ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট	„
6.	ত্রাণ ও জনকল্যাণের পরিদর্শক	ত্রাণ ও জনকল্যাণ
7.	অধস্তন কারণিক-কাম-টাইপিষ্ট	পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন (সমষ্টি উন্নয়ন শাখা)
8.	পিওন	„
9.	ক্যাসিয়ার-কাম-স্টোরকিপার	„
10.	(Correspondence) কারণিক	„
11.	টাইপিষ্ট-ক্লার্ক	„
12.	পিওন	

দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি কয়েকটি স্থায়ী সমিতির (standing committee) মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

রাজ্যসরকারের অনুমতি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি যে কোন স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারে। বর্তমানে প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির আটটি স্থায়ী সমিতি আছে :

1. অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ;
2. জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি ;
3. পূর্তকার্য স্থায়ী সমিতি ;
4. কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি ;
5. শিক্ষা স্থায়ী সমিতি ;
6. ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি ;
7. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি এবং
8. মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতি।

এই স্থায়ী সমিতিগুলি পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কাজকর্ম সম্পাদন এবং কর্তব্য পালন করে থাকে। প্রত্যেক স্থায়ী সমিতিতে মোট চার থেকে আট জন সদস্য থাকেন। সভাপতি পদাধিকার বলে সকল স্থায়ী সমিতির সদস্য। তাছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে অন্যূন তিন এবং অনধিক পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত করেন, এবং রাজ্যসরকার অনধিক তিনজন অফিসারকে প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্য নিযুক্ত করেন। অবশ্য এইসব অফিসাররা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবেন না এবং তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে না। প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে কর্মাধ্যক্ষ (chairman) নির্বাচিত করেন। তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে অর্থ ও সংস্থা সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। আর ব্লকের পঞ্চায়েত অফিসার পদাধিকার বলে ঐ সমিতির সম্পাদক।[13]

পরিষদ স্তর

পঞ্চায়েত সমিতির মত প্রত্যেক জেলা পরিষদেরই নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সভাধিপতির নেতৃত্বে একটি প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিষদের দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকেন। পরিষদের আর্থিক ও কার্যনির্বাহী প্রশাসনের সাধারণ দায়িত্ব তাঁর। তিনি জেলা পরিষদের সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী এবং পরিষদের নিকট অর্পিত

রাজ্যসরকারের অফিসার ও কর্মচারীদের ওপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা সহকারী সভাপতিকে লিখিতভাবে অর্পণ করতেও পারেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি তাঁর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, কর্মসম্পাদন ও কর্তব্যপালন করেন।

পরিষদের প্রশাসন যন্ত্রের শীর্ষে আছে একজন কার্যনির্বাহক অফিসার (Executive Officer)। এই কার্যনির্বাহক অফিসারকে নিযুক্ত করেন রাজ্যসরকার।[14] তিনি ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সারভিসের প্রবীন সদস্য এবং সেই এলাকার জেলা শাসক বা ডেপুটি কমিশনার। কার্যনির্বাহক অফিসার ছাড়া জেলা পরিষদে আর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার রয়েছেন। তিনি হলেন এর সচিব। তাঁকেও নিয়োগ করেন রাজ্যসরকার।[15] তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের প্রবীন সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে অবশ্য পরিষদের এই দুইজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কাজ ও দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়নি। তা দেওয়া হয়েছে নিয়মাবলীতে। তবে কার্যনির্বাহক অফিসারকে তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সচিব সব রকমের সাহায্য করেন। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসারের পক্ষে পরিষদের সভায় যোগদান করা ও সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া, স্থায়ী সমিতিগুলির সভাতেও তাঁকে যোগদান করতে হয়। জেলা পরিষদ ও স্থায়ী সমিতিগুলির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। জেলা পরিষদের তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার সমস্ত আদেশ ও চেকে স্বাক্ষর করবার অধিকারী একমাত্র কার্যনিবাহক অফিসারের।

যাইহোক, জেলা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে কাজ করেন। জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসার সভাধিপতিকে জেলার ভিতরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর প্রগতি সম্পর্কে এবং কার্যকালীন যে সকল সমস্যা অথবা অসুবিধার উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে অবহিত রাখেন।

তাছাড়া, জেলা পরিষদের সকল প্রকার পত্রবিনিময় কার্যনির্বাহক অফিসার

করে থাকেন। পরিষদের নথিপত্র তাঁর হেপাযতে থাকে। জেলা পরিষদের অফিসের ব্যবস্থাপনা (management) করা, পরিষদ বা স্থায়ী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পরিষদ, স্থায়ী সমিতিগুলি ও জেলা পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, ঐ অফিসারদের উপর আবশ্যকীয় নির্দেশ দেওয়া, তাদের কাছ থেকে প্রগতি প্রতিবেদন (Progress Report) সংগ্রহ করা এবং তা নিজ মন্তব্যসহ পরিষদ ও স্থায়ী সমিতিগুলির নিকট প্রেরণ করা জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসারের দায়িত্ব। এছাড়া, তাঁকে জেলা পরিষদের ব্যয়ের ত্রৈমাসিক বিবরণ প্রস্তুত করে অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির নিকট প্রেরণ করতে হয়। অধিকন্তু, তাঁকে ব্যাখ্যা সমন্বিত বিবরণসহ একটা খসড়া বাজেট প্রস্তুত করতে হয় এবং তার নকল সংস্থা স্থায়ী সমিতির সদস্যগণকে বাজেট অধিবেশনের তারিখের আগে পাঠাতে হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে জেলা শাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রধান করা হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানে জেলা শাসকের ভূমিকা এককভাবে চিন্তা করা যায় না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ এবং জেলা শাসককের দায়িত্ব ও পদমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করতে হবে। জেলা হচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু এবং জেলা শাসক হলেন ঐ প্রশাসনের মধ্যমণি। জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁর মূল দায়িত্ব। তাছাড়া, তাঁকে রাজস্ব সংগ্রহ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। জেলায় নির্বাচন, মহামারি, বন্যা, খরা প্রভৃতি বিষয়েই তাঁকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগের অফিসার ও কর্মচারী জেলায় রয়েছেন এবং এঁরা তাঁদের কাজের জন্য নিজ নিজ বিভাগের কাছে দায়ী থাকেন। কিন্তু জেলার সামগ্রিক দায়িত্ব জেলা শাসকের। তিনি জেলায় সরকারের প্রতিনিধি। তাই তিনি কোন বিভাগীয় কাজকর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। তাছাড়া, জেলায় বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা তাঁর একটা বিরাট দায়িত্ব। সংক্ষেপে বলা যায়, জেলা শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি বহুবিধ এবং বিচিত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে জেলা শাসককে পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা ঠিক হয়নি বলা যেতে পারে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁর ভূমিকা হবে প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক অঙ্গ হিসাবে নয়, ঘনিষ্ঠ ও কার্যকরী সহযোগির মত।

এখানে জেলা শাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসনের প্রধান করবার ফলে, তিনি পরিষদের কাজে মনোনিবেশ করবার সময় পান খুবই কম। তাছাড়া, পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁকে সাধারণ প্রশাসনের অনেক ক্ষেত্রে হয়ত নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হবে না এবং তিনি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়তে পারেন যেটা রাজ্যসরকার বা পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোটেই কাম্য নয়। তাই জেলা শাসককে জেলা পরিষদের বাইরে রাখাই ভালো। তবে তাঁকে দেখতে হবে যাতে জেলা প্রশাসন পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করে। অবশ্য জেলা শাসক হিসাবে এটা দেখা তাঁর অন্যতম কর্তব্য। তাছাড়া, জেলা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ তো জেলা পরিষদের সদস্য। ফলে জেলা পরিষদকে উপেক্ষা করা জেলা শাসকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

জেলা শাসকের মত একজন কর্মব্যস্ত অফিসারের পক্ষে সর্বদা জেলা পরিষদের বা তার স্থায়ী সমিতিগুলির সভায় যোগদান করা, পরিষদের সকল আদেশে স্বাক্ষর করা এবং সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সর্বদা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে রাজ্যসরকারও সচেতন। তাই বর্তমান পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে বলা হয়েছে যে জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক অফিসার পরিষদের সচিবের নিকট তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।[16] তাছাড়া জেলা পরিষদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যসরকার সম্প্রতি পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একজন করে অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী অফিসার প্রত্যেক জেলা পরিষদে নিযুক্ত করা হবে এবং তিনি হবেন অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদমর্যাদাভুক্ত অফিসার।[17]

এছাড়া রাজ্যসরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য সরকারী অফিসার বা কর্মচারীর জেলা পরিষদের অধীনে কাজ করবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। অবশ্য পরিষদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এরকম কোন অফিসার বা কর্মচারীকে এমনকি কার্যনির্বাহক অফিসারকেও, সরিয়ে নেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রাজ্যসরকার তাঁকে প্রত্যাহার করে নেন। যাইহোক, পঞ্চায়েত আইনের এই ব্যবস্থা অনুসারে রাজ্যসরকার কয়েকজন কর্মচারীকে জেলা পরিষদে ন্যস্ত করেছেন। নীচের তালিকা (সারণী সংখ্যা 6) থেকে তা' বুঝতে পারা যাবে:

সারণী সংখ্যা—6

কর্মচারীবৃন্দের পদমর্যাদা	যে বিভাগ কর্মচারীদের ন্যস্ত করেছেন
1. উপ-সহকারী বাস্তুকার	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
2. ঊর্ধ্বতন কারণিক	"
3. ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট	"
4. পিওন	"

জেলা পরিষদ তার প্রয়োজনমত অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারী নিয়োগও করতে পারেন, এবং নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন নির্ধারন কববার ক্ষমতাও পরিষদের আছে। তবে রাজ্যসরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া পরিষদ কোন পদ সৃষ্টি বা বিলোপ করতে পারে না। যাইহোক, প্রত্যেকটি জেলা পরিষদে সাধারণত একজন করে জেলা ইঞ্জিনিয়ার, একজন মেডিকেল অফিসার, উচ্চপদস্থ কারিগরী কর্মী, কারণিক, পিওন প্রভৃতি রয়েছেন। এইসব কর্মী-বৃন্দের বিন্যাস (staffing pattern) এক এক জেলা পরিষদে এক এক রকম। এক পরিষদ থেকে অন্য পরিষদে এইসব অফিসার বা কর্মচারীদের যোগ্যতা ও বেতন-কাঠামোর রকমফের ঘটে থাকে। একথা পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, প্রতিটি পঞ্চায়েত, সমিতি বা পরিষদই হল আলাদা আলাদা "আবদ্ধ ইউনিট"। ন্যূনতম যোগ্যতার মান বেঁধে না দিলে এবং একই রকম বেতনসহ পদোন্নতির ব্যবস্থা না করলে উন্নত মানের একই ধরনের কাজ আশা করা যায় না। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কর্মচারী বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তাদের কোন কেন্দ্রীভূত ক্যাডার নেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থার সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একই ধরনের চাকুরীর শর্ত ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করা দরকার এবং এই সংস্থাগুলিতে সমস্ত নিয়োগ একটি "পঞ্চায়েতী রাজ সার্ভিস কমিশন"-এর মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের চাকুরীর নিয়মাবলী, বেতনক্রম প্রভৃতি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ হবে। তাতে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের মনোবল বাড়বে এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সার্ভিসে আরো ভালো কর্মচারী পাওয়া

যাবে। যতদিন না এই ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন জেলা পরিষদগুলি রাজ্যসরকারের কাছ থেকে কয়েকজন যোগ্য অফিসারকে কিছুদিনের জন্য চেয়ে নিতে পারেন।

জেলা পরিষদের কাজকর্ম, পঞ্চায়েত সমিতির মতই, কয়েকটা স্থায়ী সমিতির (standing committee) মাধ্যম হয়ে থাকে। বর্তমানে পরিষদের আটটি স্থায়ী সমিতি আছে:

1. অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ;
2. জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি ;
3. পূর্তকার্য স্থায়ী সমিতি ;
4. কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি ;
5. শিক্ষা স্থায়ী সমিতি ;
6. ক্ষুদ্র শিল্প ত্রাণ, ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি ;
7. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি-সংস্কার স্থায়ী সমিতি এবং
8. মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতি।

রাজ্যসরকারের অনুমোদন নিয়ে পরিষদ অন্যান্য স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারে। আর প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির গঠন পদ্ধতি, সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির মত।[18]

রাজ্য স্তর

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সুষ্ঠ পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। তাই আমাদের জেনে রাখা দরকার রাজ্যসরকার কোন প্রশাসনিক কাঠামোর সাহায্যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করেন। পঞ্চায়েত অধিকার (Directorate of Panchayats) এবং পঞ্চায়েত বিভাগের (Department of Panchayats) সহায়তায় সরকার একাজ করেন। পঞ্চায়েত আইন পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পঞ্চায়েত অধিকারের। এই অধিকার পঞ্চায়েত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পঞ্চায়েত বিভাগের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে এবং নীতি নির্ধারনে পঞ্চায়েত বিভাগকে সাহায্য করে। এই অধিকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হলেন পঞ্চায়েত অধিকর্তা (Director of Panchayats)। সিনিয়র আই. এ. এস.-এর সদস্যদের মধ্য থেকে এই

পদে নিয়োগ করা হয়। পঞ্চায়েত বিভাগ নীতি নির্ধারণ করেন এবং সেটা রূপায়িত করাই তাঁর দায়িত্ব। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পঞ্চায়েত অধিকারে আছেন দুজন যুগ্ম-অধিকর্তা এবং তিনজন সহ-অধিকর্তা। একজন রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন অফিসারও আছেন। তাঁর কাজ পঞ্চায়েতের নির্বাচন পরিচালনা করা। এছাড়া আছেন প্রশিক্ষণের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার এবং একজন মহিলা পঞ্চায়েত অফিসার। মহিলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাজ গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের পঞ্চায়েতী শাসনে আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করা।

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিভাগে—প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি—তিনজন আঞ্চলিক সহ-অধিকর্তা আছেন। এঁরা পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য। এঁদের কাজ জেলা শাসক ও বিভাগীয় কমিশনারকে পঞ্চায়েত আইন রূপায়ণে সহায়তা করা। এছাড়া, প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা পঞ্চায়েত অফিসার আছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো তত্ত্বাবধান করা এবং পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ। ব্লক পর্যায়ে বি. ডি. ও-র অধীনে কাজ করেন একজন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অফিসার।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে এই প্রথম জেলা ও জেলার নিম্নতর পর্যায়ে বেশ ব্যাপকভাবে সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্র কাজ করেছেন। অতীতে নীতি নির্ধারণ ও তার রূপায়ণে সরকারী কর্মচারীদের প্রধান ভূমিকা নিতে হ'ত। কিন্তু পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে নীতি নির্ধারণের কাজ এখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর গিয়ে বর্তেছে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যেই তাই, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ সরকারী কর্মচারীদের হাত থেকে জনগণের হাতে দিয়ে দেওয়া এবং যখন প্রয়োজন কর্মচারীদের সাহায্য করতে বলা। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী ও পঞ্চায়েতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পর্কটা জনস্বার্থের কল্যাণে সহযোগী সহ-কর্মীর সম্পর্ক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনীতিক ও অসামরিক কৃত্যকের (civil service) প্রশাসকদের মধ্যে সম্পর্কটা এখনো পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে প্রাথমিক অবস্থায় রয়ে গেছে। এই সম্পর্কটা এখনো পর্যন্ত সমিতির সভাপতি এবং মুখ্য কার্যনির্বাহক আধিকারিক

অর্থাৎ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে রয়ে গেছে। সমস্ত ব্লকেই পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দ ও সরকারী আধিকারিকদের মধ্যে সুষম সম্পর্কের অভাব রয়েছে সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা চলে না। তবে কোন কোন ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মধ্যে সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর তার ফলে পরিষদের স্বাভাবিক কাজকর্ম অচল হতে পারে এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।[19] সরকারী কর্মচারীগণ এতদিন পর্যন্ত যে কর্তৃত্ব ভোগ করে আসছিলেন তা হস্তান্তর করতে তারা অনাগ্রহী। তাঁরা পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের হাতে আরো বেশী কর্তৃত্ব হস্তান্তর করবার ব্যাপারে অনীহা বোধ করেন এই যুক্তিতে যে, বিধিনিয়ম অনুযায়ী কীভাবে নীতি নির্ধারণ করতে হয় সে সম্পর্কে এই নেতাদের সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই। তাঁদের মতে, নীতি রচনায় পঞ্চায়েতের নেতাদের যদি অধিকতর সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তাতে আইনগত বিভ্রান্তি দেখা দেবে। বিধিনিয়মের রক্ষক হিসাবে এবং একজন অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী হিসাবে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কর্তব্য হবে নীতি ও কর্মসূচী রচনায় পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থায়ী কমিটিগুলির সদস্যদের পথ-নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া। তাঁর কাজ হচ্ছে সমিতির সিদ্ধান্তগুলি আইন মাফিক বা বিধিসম্মত হচ্ছে কিনা তা দেখা। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে স্পষ্ট বক্তা ও নির্ভীক হতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির বেসরকারী কর্মীদের অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অকপট পরামর্শকে স্বাগত জানানো। কিন্তু মনে হয়, এ ধরনের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এখনো পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিতে পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। কোন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমিতির নির্ধারিত কোন কর্মসূচীর আইনগত ও প্রয়োগগত বিষয়গুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে অসহযোগী এবং আমলাতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা হয়। সরকারী কর্মচারীরা নীতি ও কর্মসূচী রচনায় দক্ষ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবার মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রামবাসীদের নেই। পক্ষান্তরে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকেরাও সবসময় এটা গুরুত্ব সহকারে মানতে রাজী নন যে গ্রামের লোকেরা প্রধানত নিরক্ষর হলেও গ্রাম ও এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা ও রূপায়ণে তাঁরা বাড়তি দায়িত্ব বহন করতে পারেন। তবে ব্লকে কর্মরত সম্প্রসারণ আধি-

-কারিকের পদ থেকে পদোন্নতি লাভের ফলে যেসব ব্যক্তি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হয়েছেন তাঁরা অবশ্য গ্রামীণ নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। অতএব পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয় শ্রেণীর কর্মীদের ভূমিকাই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা দরকার এবং নূতন পাঠক্রমের সাহায্যে তাঁদের প্রশিক্ষণ দানের এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি, ব্লক কর্মচারীদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের অভাব, ব্লক প্রশাসনে বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে বেতন ও মর্যাদার অসামঞ্জস্য, বহুমুখী আনুগত্য—এ সমস্ত কারণও প্রধানত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জন্য দায়ী। এইসব ত্রুটিও সংশোধন করা দরকার। পঞ্চায়েতী রাজ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সকল পদাধিকারী, সকল স্তরের কর্মী ও সংগঠনকে তাদের নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। একথা মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির নিবাচনের পর অনেকগুলি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছিল। এখানে শিক্ষার্থী হিসাবে ছিলেন প্রত্যেক ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক যিনি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী অফিসার, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক যিনি পঞ্চায়েত সমিতির সচিব, এবং ঐ সমিতির সভাপতি। জেলা পরিষদ স্তরেও এজাতীয় সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের নিয়ে যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একই পরিবেশে রেখে একই শিক্ষণীয় বস্তুর উপর পঠন-পাঠন এবং আলোচনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পঞ্চায়েত সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব থেকে পঞ্চায়েত বিভাগের ডাইরেক্টর পর্যন্ত সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্মচারীগণকে যদি পঞ্চায়েতী আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে এঁরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যদের উৎসাহিত করতে এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণকে পরিচালনা করতে সমর্থ হবেন।[20]

REFERENCES

1. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 35 (1),
2. Ibid, Sec. 36(1) ; West Bengal Panchayat (Gram Panchayat Administration) Rules, 1981, Rule 36.
3. Ibid, Sec. 36(2)
4. Ibid, Sec. 34 ; Ibid. Rule 29.
5. Ibid, Sec. 35(3) ; Ibid, Rules 30-35.
6. G. O. 1100/D.F./2E-31/60(48), Calcutta Gazette, 28th March, 1960.
7. G. O. 2645/D.P./6A-7/59(67), Calcutta Gazette, 23rd October, 1959.
8. Ibid, Sec. 45(2) (c).
8a. West Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1956, Vol. XV. No. 1., PP 481-82.
9. West Bengal Gram Panchayat Adm. Rules. 1981, Rule 35.
10. অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
11. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 119(1).
12. Ibid, Sec. 119(1A).
13. সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
14. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 166(1).
15. Ibid, Sec. 166(2).
16. G. O. No. 342 AZP, January 29, 1979.
17. West Bengal Panchayat (Amendment) Act, 1980, Sec. 2.
18. সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
19. ক্ষেত্রীয় সমীক্ষার সময় অসংগঠিত (unstructured) আলোচনায় এ ধরনের তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।
20. Asok K. Mukhopadhyay, The Panchayat Administration in West Bengal, World Press, Calcutta, 1977, PP. 53-54.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা, কার্যপরিচালনা ও ভূমিকা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক এলাকার বিস্তৃতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শের প্রসারের ফলে স্বভাবতই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম বেড়েছে। কিন্তু এদেশে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির সংবিধানিক কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্য আইনসভা প্রণীত পঞ্চায়েতী আইনে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা শুধু সেগুলিকেই প্রয়োগ করতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্থানীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে জনগণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করা, তাদের উদ্যোগী করে তোলা, এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দেওয়া পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। নগদে বা জিনিসপত্রে অথবা দৈহিক শ্রম দিয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের রূপায়ণ বাবদ ব্যয়ের কিছু অংশ যোগানোই কেবল জনগণের অংশগ্রহণ নয়। সমষ্টি উন্নয়নের সমস্ত দিক তাদেরই ব্যাপার, সরকার কেবল যেখানে প্রয়োজন তাদের সাহায্য দেবেন মাত্র। পরিপূর্ণভাবে এই উপলব্ধিটাই জনগণের অংশ-গ্রহণ। আর এই অংশগ্রহণ তাদের মনোনীত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর থেকেই গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং অনেকটা এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কর্তব্য

পুরাতন আইন দু'টির মত ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির কর্তব্য ও কার্যাবলী বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। নূতন ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নিজস্ব এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও ও রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বাধ্যতামূলক

(obligatory), ঐচ্ছিক (discretionary), ও ন্যস্ত (assigned)। বাধ্যতামূলক কাজকর্ম মুখ্যত পৌর দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত। এগুলি হল সেইসব কাজকর্ম যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর আইনানুগভাবে বর্তেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এসব কাজ সম্পাদন করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ন্যস্ত এবং স্বেচ্ছামূলক কাজকর্মগুলি সাধারণত উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন সংক্রান্ত। ঐচ্ছিক কাজকর্মগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত করতেও পারেন নাও করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, আইনে বাধ্যতামূলক কার্যাবলী আবশ্যিক, বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং নির্দিষ্ট আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে করণীয় কার্যাবলী ঐচ্ছিক এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে যেসব কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সংস্থাকে অর্পণ করা হয় তা হচ্ছে ন্যস্ত কর্তব্যের অন্তর্গত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে আইনের 19 নম্বর ধারায়। ঐ তালিকায় আছে: স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের পক্ষে বিরক্তিকর দুষ্কৃতি নিবারণের ব্যবস্থা করা; ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা অথবা অন্যান্য মহামারী নিরাময় ও নিবারণের ব্যবস্থা করা; পানীয় জলসরবরাহ এবং জলসরবরাহের উৎস ও জলসংরক্ষণস্থল পরিষ্কার ও রোগজীবাণুমুক্ত রাখা; জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণের এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; জনপথ বা সার্বজনীন স্থানে বেআইনী দখল অপসারণ করা; গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাভুক্ত সমস্ত দালান ও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা করা বা মেরামত করা; বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী সার্বজনীন পুষ্করিণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও গোচারণ ক্ষেত্র, শ্মশান এবং কবরখানার তত্ত্বাবধান করা; যে এক্তিয়ারভুক্ত স্থানীয় সীমানার মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পরিষদ অথবা পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রয়োজনমত তথ্য সরবরাহ করা; এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মী সংগঠিত করা; এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা; এই আইন অনুযায়ী ধার্যকর, অভিকর বা ফি-আরোপ, নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা; এর এক্তিয়ারভুক্ত দফাদার ও চৌকিদারদের ওপরে যেসব কর্তব্য বর্তেছে, সেগুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় তা নিশ্চিত করা; এই আইন অনুযায়ী গঠিত ন্যায় পঞ্চায়েতের

সংগঠন ও প্রশাসনের ব্যবস্থা করা; এবং ১৮৭১ সালের ক্যাটল-ট্রেসপাস অ্যাক্টের 31 ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তান্তরিত কাজকর্ম চালনা করা।

মূখ্যত রাজ্যসরকারেরই দায়িত্ব এমন কিছু কাজও গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর সরকার অর্পণ করতে পারেন। এগুলি রাজ্যসরকার অর্পণ করলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে পালন করা বাধ্যতামূলকও বটে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে এ কাজগুলি করতে হয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে। সরকার যদি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোন কাজ করতে বলেন তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত তা করবেন সরকারের নির্দেশ ও শর্ত অনুসারে। রাজ্যসরকার অর্পিত যেসব কাজকর্ম গ্রাম পঞ্চায়েতকে অবশ্যই পালন করতে হবে তা হ'ল: প্রাথমিক, সমাজ-বিষয়ক, কারিগরী বা বৃত্তিশিক্ষা; পল্লী চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র; ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ফেরী আইন অনুযায়ী বারোয়ারী খেয়াঘাটের পরিচালনা; সেচ; অধিক-খাদ্য-ফলাও অভিযান; অক্ষম ও অনাথদের দেখাশোনা; উদ্বাস্তু পুনর্বাসন; উন্নতমানের গবাদি পশু প্রজনন, গবাদি পশুর চিকিৎসা এবং গবাদি পশুর রোগ নিবারণ; গ্রামে সরকারী সাহায্য পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন; অনুর্বর, অকর্ষিত জমি আবাদের অন্তর্ভুক্তি; গ্রামের বাগিচা-চাষের উন্নতি; পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা; গ্রামের জমি ও অন্যান্য সম্পদ সমবায় প্রথায় পরিচালনার ব্যবস্থা; নিজ নিজ এলাকায় ভূমি সংস্কারের সুষ্ঠু রূপায়ণের ব্যবস্থা; রাজ্যসরকার রচিত প্রকল্প রূপায়ণ এবং যেসব কাজের ভার রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর অর্পণ করেছেন তার রূপায়ণ; এবং রাজ্যসরকারের উন্নয়নমূলক বা অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজকর্মের বিষয়ে ক্ষেত্রীয় প্রচার।[1]

এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু স্বেচ্ছামূলক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব রয়েছে। 21 নম্বর ধারায় তা' উল্লেখ করা হয়েছে। নিজে ইচ্ছা করলে বা সরকার নির্দেশ দিলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই কার্যগুলি সম্পাদন করা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাধীন কিন্তু এক বা একাধিক বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য রাজ্যসরকার যদি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেন তাহলে এই স্বেচ্ছামূলক কর্তব্যের রূপ পাল্টে গিয়ে তা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, সরকার যদি কোন কর্তব্য সম্পাদনের ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের

ওপর অর্পণ করেন, তবে আবশ্যকীয় অর্থের ব্যবস্থাও সরকারকেই করতে হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত সম্পাদনের ভার সরকার পঞ্চায়েতের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। যাইহোক, গ্রাম পঞ্চায়েতকে যেসব ঐচ্ছিক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল : সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা ; জলপথের দু'ধারে কিংবা এর স্বত্বাধীন সার্বজনীন স্থানে বৃক্ষ-রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ; কূপ বসানো এবং পুকুর ও দীঘি খনন ; সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ, সমবায় ভাণ্ডার এবং সমবায় উদ্যোগ ; ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত পেশা প্রবর্তন এবং প্রসার ; বাজার নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ, মেলা ও হাট বসানো ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় কৃষিপণ্য এবং স্থানীয় হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প-জাত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শন ; সার মজুত করার জন্য স্থান নির্দিষ্টকরণ ; সরকারী ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে চাষীদের পরামর্শ দেওয়া এবং এই ঋণ বন্টন ও পরি-শোধের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা ; অস্বাস্থ্যকর নীচু জমি ভরাট করা এবং অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল পরিষ্কার করা ; কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধান এবং উৎপাদন ; বেওয়ারিশ বা পাগলা কুকুর মেরে ফেলা ; নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন এবং বন্টন নিয়ন্ত্রণ করা ; সরাইখানা, ধর্মশালা, বিশ্রামাগার, খাটাল এবং গরুর গাড়ী রাখার স্থান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ; বেওয়ারিশ গবাদি পশু সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া ; গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ; আখড়া, ক্লাব এবং অন্যান্য বিনোদন ও খেলাধূলার স্থানের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ; আদমসুমারী, শস্য-সুমারী, গবাদি, পশু-সুমারী ও বেকার-সুমারী এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান সম্পর্কিত নথিপত্র-সংরক্ষণ ; গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত জনসাধারণের উপকারার্থে জেলা পরিষদের পূর্বানুমতিক্রমে পরিষদের কোন কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা ; আগুন নেভাতে এবং অগ্নিকাণ্ড থেকে জনজীবন রক্ষা করতে সাহায্যদান ; চুরি এবং ডাকাতি নিবারণে সাহায্য করা ; এবং এই আইনে উল্লেখ করা হয়নি, এরকম অন্য যে কোন স্থানীয় জনহিতকর কাজ বা সেবা।

আমরা দেখেছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে —বাধ্যতামূলক, সরকার অর্পিত এবং স্বেচ্ছামূলক। বর্তমান অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক কর্তব্যের কৃত্রিম পার্থক্য অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই পার্থক্যটা তুলে দেওয়া দরকার। সুষ্ঠুভাবে কাজের

পক্ষে এ পার্থক্যটা সহায়ক নয়। কারণ প্রায়ই দেখা গেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক কাজকর্মের ওপর জোর বেশী দেন এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে একদম হাত দেন না। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হচ্ছে জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। তাই বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কর্তব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি যাতে নিজেরাই নিজেদের কর্তব্যের অগ্রাধিকারের ক্রমপর্যায় স্থির করতে পারে এবং যত বেশী সম্ভব কাজ হাতে নিতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা দরকার। সেজন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পুনরায় সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের রচিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির সমন্বয় ও সংহতিসাধন (co-ordination and integration) করা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ওপর তদারকি করার দায়িত্ব (general powers of supervision) পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে এবং এলাকার মধ্যস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাজেট বরাদ্দ পরীক্ষা ও মঞ্জুর করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির আছে।[1a] তাই উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি বা পরিকল্পনা রূপায়ণে পঞ্চায়েত সমিতির আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর করা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে বাধ্যতামূলক বলা চলে। এছাড়া, কৃষি, গবাদি পশু, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, পল্লী ঋণ, জলসরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য এবং দাতব্য ঔষধালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ছাত্র-কল্যাণসহ প্রাথমিক বা বয়স্ক শিক্ষা, সমাজ-কল্যাণ এবং অন্যান্য সাধারণ লোকহিতকর প্রকল্পের উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতি নিজে গ্রহণ করতে পারেন এবং অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। ব্লকের অন্তর্গত কোন বিদ্যালয়, জন প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণকর সংস্থার সাহায্যার্থে পঞ্চায়েত সমিতি সহায়ক অনুদান প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া, রাজ্যসরকারের অনুমোদনক্রমে ব্লকের অন্তর্গত পৌরসভাকে জলসরবরাহ বা মহামারী প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যয়

নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান এবং জেলা পরিষদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান প্রদান করবার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির আছে।[2]

রাজ্যসরকারে ন্যস্ত যে কোন সড়ক, সেতু, ফেরী, খাল, দালান বা অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার ভার রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত সমিতির ওপর ন্যস্ত করতে পারেন। অপরদিকে পঞ্চায়েত সমিতিও তাঁর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীন কোন সড়ক বা অন্য কোন সম্পত্তি রাজ্যসরকার বা জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করতে পারেন।

এগুলি ছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীন কোন পথ সাময়িকভাবে দিক পরিবর্তন করতে বা বন্ধ করে দিতে পারেন। কিছু ক্ষতি-জনক বা বিপজ্জনক ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ করে দেওয়া বা তার লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। আবার পঞ্চায়েত সমিতি কোন হাট বা বাজারের মালিক বা ইজরাদারকে পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে ফি দিয়ে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত কোন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। তবে সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামর্থের বাইরে হলে পঞ্চায়েত সমিতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[3] আর একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় বিস্তৃত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা রূপায়ণের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতি করতে পারেন।[4] তাছাড়া, রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত সমিতির হাতে স্থানীয় বা বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। এছাড়া কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ, কাজকর্ম সম্পাদন অথবা কর্তব্যপালনের নির্দেশ রাজ্যসরকার দিলে পঞ্চায়েত সমিতির কর্তব্য তা পালন করা।[5]

ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যেই জেলা পরিষদগুলি মূলতঃ উপদেষ্টা পর্ষদের মত। অবশ্য নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম তদারক ও সমন্বয় করবার কাজও তাদের করতে হয়। এদিক থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যগুলি একটু স্বতন্ত্র। এসব রাজ্যে জেলা পরিষদ শুধু পরামর্শদানের এবং তদারকীর কাজই করেন না, কিছু কার্যনির্বাহী বা প্রশাসনিক কাজকর্মও তাঁরা করে থাকেন। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য, মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জেলা পরিষদ হল সবচেয়ে

বেশী শক্তিশালী। পরিকল্পনা ও উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সেখানে জেলা পরিষদের রয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মত এ রাজ্যেও জেলার উন্নয়নে জেলা পরিষদ রাজ্যসরকারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন।[5a] প্রসঙ্গত একথাও বলা দরকার, সম্প্রতি প্রত্যেক রাজ্যে জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাজকর্মের ওপর গুরুত্বদানের প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদগুলি জেলাবোর্ডের বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠার দরুণ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডকে যেসব কাজকর্ম করতে হত সেসব কাজ ১৯৬৩ অথবা ১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে গঠিত জেলা পরিষদের ওপর বর্তেছে। কিন্তু ব্লক পর্যায়ে একটি নতুন স্থানীয় সংস্থা আঞ্চলিক পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতি স্থাপন করবার ফলে দুটি উচ্চতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতী সংস্থার মধ্যে এসব দায়-দায়িত্ব নূতন করে বণ্টন করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব চিরাচরিত স্থানীয় সরকারী কাজকর্ম ছাড়াও তাদের ওপর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ভার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মোটের ওপর বলা যেতে পারে ১৯৬৩ সাল বা ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বস্তুত তারা একই ধরনের ক্ষমতা ভোগ করেন। বর্তমানে জেলা পরিষদের এক্তিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এইসব সংস্থার হাতে উন্নয়নের কাজকর্ম বণ্টনের ব্যাপারে জেলা পরিষদকে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[6] ফলে জেলা পরিষদ বা নিম্নতর পর্যায়ের কোন পঞ্চায়েত সংস্থাই স্বশাসিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে কাজ করতে পারেন না। আবার, বুনিয়াদী স্তরে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতকে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার শীর্ষে জেলা পরিষদ শুধু সেইসব প্রকল্পই রূপায়িত করতে পারেন যেসব প্রকল্প একাধিক ব্লক নিয়ে অথবা যথেষ্ট অর্থ, লোকবল বা কারিগরী সাহায্যের অভাবে যেসব প্রকল্প পঞ্চায়েত সমিতি রূপায়ণে সক্ষম নন।[7] সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদ সরাসরি কাজ করবার সুযোগ খুবই কম পান।

পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

পঞ্চায়েতী আইনে জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ সম্পত্তি অধিকার, রক্ষা বা বিক্রী করতে পারেন এবং চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন।[৪] 153 নম্বর ধারাতে পরিষদের সাধারণ ক্ষমতাগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদও কৃষি, গবাদি পশু পালন, শিল্প উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন, পল্লী ঋণ, জলসরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য বিধান, চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, যোগাযোগ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, ছাত্রকল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রকল্প রূপায়ণের ভার নিতে পারেন বা অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। জেলার আওতাভুক্ত পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে এবং কোন স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার, জনপ্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণ সংস্থাকে অর্থ সাহায্যও করে থাকেন জেলা পরিষদ। রাজ্যসরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ জেলার কোন মিউনিসিপ্যালিটি গৃহীত কোন জলসরবরাহ বা মহামারীরোধী প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় বরাদ্দ অর্থ মঞ্জুর করবার এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান প্রদানের ক্ষমতাও জেলা পরিষদের রয়েছে। জেলার বাসিন্দাদের পক্ষে খুবই উপযোগী অথচ জেলার বাইরে অবস্থিত এমন কোন প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের খরচের বাবদও জেলা পরিষদ অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। এছাড়া জেলা পরিষদ দুর্গত ত্রাণের ব্যবস্থা নেন, কারিগরী ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার জন্য ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। গ্রামের হাট ও বাজারের স্বত্ব গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষদে ন্যস্ত কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্পিত কোন প্রকল্প রূপায়ণ করবার ক্ষমতা জেলা পরিষদের আছে। তাছাড়া, জেলা পরিষদ একাধিক ব্লকে প্রসারিত যে কোন প্রকল্প গ্রহণ বা সম্পাদন করতে পারেন।

এছাড়া, জেলা পরিষদের সম্মতি নিয়ে রাজ্যসরকার ঐ জেলায় অবস্থিত কোন সড়ক, সেতু, খেয়াঘাট, খাল, দালান বা অন্য সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করবার দায়িত্ব ঐ পরিষদকে দিতে পারেন। আবার রাজ্য-সরকার নির্দেশ দিলে কোন পৌরসভার মধ্য দিয়ে গিয়েছে এমন রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা পরিষদকে গ্রহণ করতে হয়। জেলা পরিষদ তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন কোন সড়ক ঘুরিয়ে দিতে বা বন্ধ করে

দিতে পারেন অথবা রাজ্যসরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করতে পারেন। যৌথভাবে এবং যৌথব্যয়ে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও কার্যকর করবার ক্ষমতা পঞ্চায়েত আইনে দুই বা ততোধিক সংলগ্ন জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ কোন জেলার মালিক বা ইজারাদারকে পরিষদের কাজ থেকে লাইসেন্স গ্রহণের এবং ঐ লাইসেন্স বাবদ ফি দেবার জন্য বাধ্য করতে পারেন। সর্বশেষে, রাজ্য-সরকার জেলা পরিষদের হাতে স্থানীয় বা বিশেষ আইন অনুসারে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। তাছাড়া, রাজ্যসরকার কোন আদেশ বা নির্দেশ দিলে সেসব ক্ষমতা প্রয়োগ বা সম্পাদন করা জেলা পরিষদের অন্যতম কর্তব্য।

জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি রচিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির সমন্বয় এবং সুসংহতিসাধন (co-ordinate and integrate) করা জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।[9] আওতাভুক্ত সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক বাজেট-বরাদ্দ পরীক্ষা করে তা মঞ্জুর করবার ক্ষমতাও জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতই সমন্বয়সাধনের পক্ষে এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য পথ। এছাড়া, জেলার উন্নয়ন এবং নিম্নতর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ব্যাপারে জেলা পরিষদ রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া, এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর তদারকী করবার সাধারণ ক্ষমতাও (general powers of supervision) জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে।[10] উন্নয়নসংক্রান্ত নীতি বা পরিকল্পনা রূপায়ণে জেলা পরিষদের যে কোন নির্দেশ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যকরী করতে বাধ্য। সুতরাং নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েত সংস্থা-গুলির কাছ থেকে যে কোন তথ্য, প্রতিবেদন, রেজিষ্টার বা রেকর্ড জেলা পরিষদের কোন একজন অনুমোদিত অফিসার নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতগুলির অফিস বা কাজ দেখাশোনা করতে যেতে পারেন। অতএব স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্ত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এজন্য জেলা পরিষদগুলির প্রশাসনযন্ত্রকে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হবে।

কার্যপরিচালনা ও ভূমিকা

প্রায় বিশ বছর অকেজো হয়ে থাকবার পর ১৯৭৮ সালের জুন মাসে গ্রাম বাংলার আড়াই কোটি মানুষ এক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন করে গড়ে তুললেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী সংগঠন। তাঁরা নির্বাচন করলেন ছাপ্পান্ন হাজার প্রতিনিধি। গঠিত হল 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 324টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 15টি জেলা পরিষদ। পঞ্চায়েত বর্তমানে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষের সবচেয়ে নিকটতম সংগঠন। কিন্তু পঞ্চায়েতী রাজের এই পুনর্গঠন পর্ব শেষ না হতেই দেখা দিল দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলায় এক বিধ্বংসী বন্যা এবং উত্তরবঙ্গের চারটি জেলায় প্রচণ্ড খরা।

সুতরাং কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে বন্যার্ত ও খরাক্রান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী, সড়ক ও বাঁধ পুনর্গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। পরবর্তীকালে সরকারী ত্রাণসামগ্রীও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের ত্রাণ ও উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে চারটি কর্মসূচি রূপায়ণের ভার দিলেন (সারণী নং 7) এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনটি প্রকল্প—গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প এবং গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্প। এই প্রকল্প তিনটি নেওয়া হয়েছে গ্রামের দরিদ্র মানুষের ঘরবাড়ী পুনর্নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্থ সামাজিক সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং গ্রামের বেকার ও আধাবেকার মানুষের কাজ সৃষ্টির লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করা। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নানারকম কাজ করা যায় যেমন, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য খাল কাটা, পুষ্করিণী খনন, বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট সংস্কার, নূতন রাস্তাঘাট নির্মাণ, ভূমি সংরক্ষণ, বিদ্যালয় গৃহের সংস্কারসাধন, সরকারী বাড়ী, পঞ্চায়েতের বাড়ী বা কমিউনিটি সেণ্টার ইত্যাদির সংস্কারসাধন। এই প্রকল্পগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোন কাজ করা হবে সেটা ঠিক করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতই নিজেদের এলাকার মধ্যে কাজগুলি করাবেন নিজেদের তত্ত্বাবধানে। কোন কন্ট্রাকটর নিয়োগ করা যাবে না। কারিগরী সাহায্য দেবেন স্থানীয় সমষ্টিউন্নয়ন আধিকারিকের অফিস।

সারণী নং—7

পঞ্চায়েত সংস্থার নাম		প্রকল্পের নাম	যে বিভাগ ন্যস্ত করেছে
গ্রাম পঞ্চায়েত	1.	গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
	2.	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প	ত্রাণ ও কল্যাণ
	3.	গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্প	ত্রাণ ও কল্যাণ
	4.	খাস বা সরকারে ন্যস্ত জলাশয়ের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন	রাজস্ব পর্ষদ্
পঞ্চায়েত সমিতি	1.	সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
	2.	প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ-নির্মাণের বিশেষ প্রকল্প	শিক্ষা (প্রাথমিক)
	3.	ইউনিসেফের সহায়তায় বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ('বি' ও 'সি' টাইপ)	ঐ
	4.	জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	ঐ
	5.	খাস বা সরকারে ন্যস্ত খেয়াঘাট নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন	রাজস্ব পর্ষদ্
	6.	ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটির কাজ	ঐ
	7.	ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক প্রভৃতির জন্য গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ	পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন (সমষ্টি উন্নয়ন)
	8.	গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল-সরবরাহ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
	9.	বেকারভাতা প্রাপকদের সাময়িক কর্মসংস্থান	শ্রম
	10.	ভোগ্যপণ্যের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র	কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প
	11.	বার্ধক্য ভাতা সুপারিশ	ত্রাণ ও কল্যাণ

পঞ্চায়েত সংস্থার নাম		প্রকল্পের নাম	যে বিভাগ ন্যস্ত করেছে
	12.	মহিলা সমিতি সংগঠন	পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন (সমষ্টি উন্নয়ন)
জেলা পরিষদ	1.	বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ ('এ' টাইপ)	শিক্ষা (প্রাথমিক)
	2.	ইউনিসেফের সাহায্যে বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ ('এ' টাইপ)	ঐ
	3.	বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ	মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর
	4.	বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় নলকূপ খনন	ঐ
	5.	ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অফিস-ঘর নির্মাণ	পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন (সমষ্টি উন্নয়ন)
	6.	বন্যায় পঞ্চায়েতের বিনষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন	ঐ (পঞ্চায়েত)
	7.	ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের অফিসঘরের সম্প্রসারণ	ঐ
	8.	বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প	ত্রাণ ও কল্যাণ
	9.	খরা কবলিত এলাকায় পুষ্টিকর খাদ্যসরবরাহ	ঐ
	10.	উত্তরবঙ্গের সর্বাঙ্গীন উন্নতি প্রকল্প	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
	11.	ঝাড়গ্রাম মহকুমার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পাইলট প্রকল্প	ঐ

এছাড়া, রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত সমিতির হাতে বারটি প্রকল্প এবং জেলা পরিষদের হাতে এগারটি প্রকল্প ন্যস্ত করেছেন (সারণী সংখ্যা-7)। পঞ্চায়েত সংগঠনের সামনে আজ গ্রামোন্নয়নের অনেক সুযোগ এসেছে। এখন ক্রমশঃ তাদের হাতে সার্বিক গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন, সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি এবং ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব। সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির হাতে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ভূমি-সংস্কার, ভূমিহীনদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, বেকার ভাতা প্রভৃতি সরকারী প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বও পঞ্চায়েত সমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়নের সুফল যাতে গ্রামের দরিদ্রশ্রেণী পান সংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প (IRD) সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটির জন্য টাকা মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া, কিন্তু আর্থিক ব্যয়ভারের কিছুটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বহন করেন। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামের গরীবদের অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক, নামভুক্ত বর্গাদার, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী ও গ্রামীণ কারিগরদের সাহায্য দিয়ে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত উৎপাদন ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে একটি সমন্বয় রক্ষা করা। এতে তাদের আয় ও কর্মসংস্থান দুই-ই বাড়বে। এই কর্মসূচীর জন্য ব্লকগুলি এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে যেখানে SFDA, DPAD. এবং CADP এই কর্মসূচীগুলির অন্ততঃ একটি রূপান্তরিত হচ্ছে।

স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রকল্পের অন্তর্গত একটি প্রদত্ত রূপরেখার মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরি করার ভার মুখ্যতঃ পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে। তৈরী প্রকল্পটি রাজ্যস্তরে সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে রূপায়িত করার ভারও মুখ্যতঃ পঞ্চায়েত সমিতির উপর।

প্রকল্পটি ১৯৭৮-৭৯ সালে চালু হয়েছে। প্রথম বছর প্রথম পর্যায়ে 163টি ও পরবর্তী পর্যায়ে ছয়টি মোট 169টি ব্লকে প্রকল্পটি চালু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের 163টি নির্বাচিত ব্লকের মধ্যে SFDA, CADP কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ব্লকগুলির (142টি) প্রতিটির জন্য 5 লক্ষ টাকা এবং DPAD কর্মসূচীর অন্তর্গত ব্লকগুলির (21টি) প্রতিটির জন্য 4 লক্ষ টাকা (এক্ষেত্রে 1 লক্ষ টাকা রাজ্যসরকারের দেয়)

ভরতুকি সাহায্য হিসাবে বরাদ্দ হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে 6টি অতিরিক্ত ব্লকের প্রতিটির জন্য 2·30 লক্ষ টাকা ভরতুকি সাহায্য বরাদ্দ হয়েছিল।

এই প্রকল্পের মধ্যে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচী, সেচ ব্যবস্থার কার্যসূচী, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত, মৎস্যচাষ, উদ্যান চাষ, গুটি পোকার চাষ, পশুপালন, তাঁত শিল্পের উন্নতিসাধন, জৈবসার ও গোবরসার উৎপাদন, ধানভাঙ্গা, গমভাঙ্গা, বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৭৯-৮০ সালে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব 8নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

সারণী সংখ্যা—8

১৯৭৮-৭৯ সালের ব্যয়বরাদ্দ

	কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ টাকা)	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ টাকা)
1. 64টি CADA ব্লক	160·00 হারে 2·50 ব্লক পিছু	—
2. 21টি DPAP ব্লক	42·00 ,, 2·00 ,,	10·50 হারে 0·50 ব্লক পিছু
3. 78টি SFDA ব্লক	195·00 ,, 2·50 ,,	—
4. 6টি অতিরিক্ত ব্লক	13·80 ,, 2·30 ,,	—
5. উক্ত 169টি ব্লকে আনুষঙ্গিক খরচা বাবদ		5·07 হারে 0·03 ব্লক পিছু

১৯৭৯-১৯৮০ সালের ব্যয়বরাদ্দ

1. 62টি CADA ব্লক	77·50 হারে 1·25 ব্লক পিছু	77·50 হারে 1·25 ব্লক পিছু
2. 21টি DPAP ব্লক	19·375 ,, 0·625 ,,	19·375 হারে 0·625 ব্লক পিছু
3. 78টি SFDA ব্লক	97·50 ,, 1·25 ,,	97·50 হারে 1·25 ব্লক পিছু

	কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ টাকা)				পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ টাকা)
4. 6টি অতিরিক্ত ব্লক	4·50	হারে	0·75	হারে	4·50 হারে 0·75 ব্লক পিছু
5. TRYSEM 153টি ব্লক	4·59	,,	0·03	,,	—
6. 13টি নির্বাচিত ব্লক					13·00 হারে 1·00 ব্লক পিছু
7. 123টি নতুন ব্লক যা এখনও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত করেননি					123·00 হারে 1·00 ব্লক পিছু

উৎস : পঞ্চায়েত অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

অপর দিকে পানীয় জল সরবরাহ, বয়স্ক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সুষম বণ্টন প্রভৃতি ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচী রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব এখন বিভিন্ন সরকারী বিভাগ পঞ্চায়েতী সংগঠনের মাধ্যমে পালন করছেন। সব প্রকল্প ও কর্মসূচী মিলিয়ে প্রায় 75 কোটি টাকা এবং সেই সঙ্গে তিন লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী খাদ্যশস্য রাজ্যসরকার এ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যয় করেছেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ভবিষ্যতে তাঁদের এই ব্যয়ের পরিমাণটা নিশ্চয়ই বাড়বে। কেননা অনেক কাজের দায়িত্ব এখন ক্রমবর্ধমানভাবে বর্তে চলেছে পঞ্চায়েতের ওপর।

সরকার যেসব গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়েছেন সেগুলিকে রূপায়ণ করার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। এই কাজের ক্ষেত্রকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল গ্রামের রাস্তাঘাট, কালভার্ট, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত ঘর ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কারের প্রাথমিক কাঠামোগত (infrastructural) কাজকর্ম। দ্বিতীয়টির মধ্যে পড়ে বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প, গ্রামীণ জল সরবরাহ ও

গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের মত গ্রামাঞ্চলের ন্যূনতম প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কাজকর্ম। গ্রামীণ গৃহ প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা হল 35,000টি কাঁচা বাড়ী নির্মাণ। এতে খরচ ধরা হয়েছে 5 কোটি 26 লক্ষ টাকা। এছাড়া 30টি বেছে-নেওয়া বন্যা-বিধ্বস্ত ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় মহিলা সমিতির সাহায্যে নূতন মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচীও চলছে। উপরোক্ত ব্লকগুলিতে নির্বাচিত মহিলা পঞ্চায়েত কর্মীদের নিয়ে চলছে একটি নূতন নারী কর্মসূচী।

তৃতীয়টি হল গ্রামীণ মানবিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার। নতুন পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ মহিলাদের কাজে লাগানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য 387টি মহিলা মণ্ডলকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং 230টি যুব মণ্ডল সংগঠিত করা হয়েছে। আরও একটি মণ্ডল গঠন করা হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসূচী ও কাজের বিনিময়ে খাদ্যের কর্মসূচীতে গ্রামের বিরাট সংখ্যক বেকার ও আধা-বেকারদের মণ্ডল হল ঐ তৃতীয় মণ্ডলটি। পঞ্চায়েতগুলো শ্রমিক যোগাড় করছেন এবং তারা কি কি কাজ করবে তা ঠিক করছেন।

চতুর্থ বিষয় হল মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন। ভূমি-সংস্কার কাজে পরিণত করার জন্যে আইনের মৌল পরিবর্তন করা। বর্গারেকর্ড ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করার কাজ পড়ে এর মধ্যে। পঞ্চায়েত বর্গাদার ও উদ্বৃত্ত জমি প্রাপকদের ব্যাঙ্ক ঋণ পেতেও সাহায্য করছে।

সর্বশেষ বিষয়টি হল, খেয়াঘাট, হাট-বাজার পরিচালনার মাধ্যমে সম্পদ যোগাড়ের এবং সরকারে ন্যস্ত বড় ও ছোট পুকুরগুলোতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা। এইসব পরিকল্পনা ও প্রকল্পের জন্য পঞ্চায়েতের হাতে রাজ্যসরকার 75 কোটি টাকা এবং সেইসঙ্গে 3 লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী খাদ্যশস্য দিয়েছেন একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[11] পঞ্চায়েত তাদের সাহায্যের ক্ষমতা দিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে কতখানি উদ্দীপ্ত করছে, তা সমীক্ষা করবার সময় হয়েছে। একাজে তারা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তার একটা মূল্যায়ন করা আশু প্রয়োজন। মৃতপ্রায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করতে গত কয়েক বছরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনেক। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করেছেন পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দই, স্থানীয় প্রয়োজন ও

অর্থনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাঁরা নিজেরাও ছোট ছোট প্রকল্প রচনা করে রূপায়িত করেছেন। এই ধরনের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তৈরী হয়েছে অনেক রাস্তাঘাট, অনেক সেতু ও কালভার্ট; নির্মিত হয়েছে অনেক বিদ্যালয়গৃহ। ১৯৭৯-৮০ সালেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আনুমানিক 29178 কি.মি. রাস্তা তৈরী হয়েছে। প্রায় 19000টি নলকূপ হয় বসানো হয়েছে কিংবা সংস্কার করা হয়েছে। আনুমানিক 810টি বিদ্যালয়গৃহ হয় মেরামত করা হয়েছে কিংবা সংস্কার করা হয়েছে। সেচের জন্য নূতন পুষ্করিণী খনন করা হয়েছে, পুরোনো দীঘি নূতন করে খোঁড়া হয়েছে। প্রায় 141 লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ঐ আর্থিক বৎসরেই।[12] আর এসবই হয়েছে পঞ্চায়েত সভ্যবৃন্দের প্রচেষ্টার ফলে এবং সরকারী অনুদানে।

বিগত তিন দশক ধরে পল্লী উন্নয়নের যে কাজ হয়েছে তার সঙ্গে আজকের কাজের যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্যগুলি মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গিগত, প্রকৃতিগত এবং পদ্ধতিগত।[13] আগে পল্লী উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা রূপায়িত করতেন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—পূর্ত, সড়ক-নির্মাণ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, শিক্ষা, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তর। আর বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা নিজ নিজ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এবং তাঁরাই বানাতেন গ্রামের রাস্তা, পুকুর, নলকূপ, সেচপ্রণালী, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি। প্রকল্পগুলির অধিকাংশই ছিল ওপর থেকে আরোপিত। গ্রামের সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল খুবই কম। কিন্তু এই গ্রামোন্নয়নের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে গত পাঁচ বছর আগে নূতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর। পল্লী উন্নয়নের সকল দায়িত্ব ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

এটা ঠিক যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা। কিন্তু গ্রামে কোন্ কাজটা অগ্রাধিকার পাবে বা বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন গ্রামবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। তাই বলা যেতে পারে যে পল্লী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

তৃতীয় পার্থক্য হচ্ছে পদ্ধতিগত। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পঞ্চায়েতের কোন কাজ ঠিকাদারের সাহায্যে করানো হবে না। এটা নিশ্চয়ই একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর দায়িত্ব রাজ্যসরকার বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করেছেন এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ, গম ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও নবপর্যায়ের পঞ্চায়েত গঠিত হবার পর কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে :

প্রথমত, বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনেক কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ ও পঞ্চায়েতের মধ্যে এবং বিভাগীয় কর্মী ও অফিসারদের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা রয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে পঞ্চায়েত সংস্থার হাতে অর্পিত বিশাল কাজের উপযোগী কর্মী ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব।

তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বহু অর্থ ও গম খরচা করা হচ্ছে। এই ব্যয়ের হিসাব রাখার উপযোগী নিরীক্ষা সংক্রান্ত উপযুক্ত সংস্থা গড়ে তোলার সমস্যা রয়েছে।

চতুর্থত, নূতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে ঐ সংস্থাগুলির নিজস্ব অফিস ঘরের সমস্যা রয়েছে।

পঞ্চমত, দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের সর্বস্তরে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়েছে। সেকারণে সংখ্যালঘু দলের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুবিচারের প্রশ্নটিও একটা সমস্যা।

এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যসরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে কাজকর্মের সমন্বয়ের জন্য রাজ্য পর্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে ; (a) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত সরকারী নীতি ও কর্মপ্রণালী দ্রুত নির্ধারণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্যান্য সাতজন মন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিসভার একটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। এই উপসমিতি পঞ্চায়েত সম্পর্কে যাবতীয় নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে কাজ করছেন। (b) অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে বিভাগীয় সচিব স্তরে দ্বিতীয় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরকে সরকারী নানা বিভাগের কি কি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা যায় এবং সেই ন্যস্ত

কাজের জন্য কি পরিমাণ আর্থিক ও কর্মী সহায়তা প্রয়োজন হবে, সেইসব বিষয়ে এই কমিটি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর জেলা পর্যায়ে জেলা শাসককে পরিষদের কার্যনির্বাহী অফিসার করে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। আর ব্লক পর্যায়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী অফিসার করে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত কর্মীর অভাব মেটাবার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে জব এ্যাসিষ্ট্যান্টের স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ পদে নিয়োগ শুরু হয়ে গেছে। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব মেটাবার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের আড়াই হাজার কর্মীকে পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, কোন বিভাগের প্রকল্প পঞ্চায়েতের কোন সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হলে তখন সেই বিভাগের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এছাড়া, সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের প্রায় তিন হাজার গ্রাম সেবককে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতের মাধ্যম প্রচুর সরকারী টাকা খরচা হচ্ছে। তার হিসাব রাখবার জন্য পঞ্চায়েতের তিন স্তরে প্রায় পাঁচশত অ্যাকাউন্টেন্ট ও অডিটরের পদে নিয়োগ চলছে। ইতিমধ্যে 340 জন পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার, 57 জন সমিতি অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার, 16 জন পরিষদ অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার এবং 3 জন রিজিওনাল অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

চতুর্থত, পঞ্চায়েতে দলীয় প্রাধান্যের ফলে সুবিচারের প্রশ্নটি ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।[14]

গ্রামীণ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রামবাসীদের নির্বাচিত সংস্থার হাতে দেবার নীতি অনুসরণ করে রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অনেকগুলো প্রকল্প ন্যস্ত করেছেন তা' আমরা আগেই দেখেছি। ঐ প্রকল্পগুলি অবশ্য রূপায়িত হচ্ছে সরকারী অনুদানে। তাছাড়া, পঞ্চায়েতগুলির সাংগঠনিক ব্যয়ের জন্যও সরকার অনুদান দিয়ে থাকেন। নিজ নিজ এলাকায় পৌর সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব পঞ্চায়েতগুলির। কিন্তু ঐ দায়িত্ব পালন করবার মত আর্থিক দিক থেকে তারা এখনো স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি।

কেবলমাত্র ন্যস্ত বিভাগীয় দায়িত্ব ও সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পঞ্চায়েত সংগঠন কখনই স্বনির্ভর হতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ এই অনুদান প্রাপ্তির কোন স্থিরতা নেই। উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার বহু পরিকল্পনা ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ইউ. এফ. গভর্নমেণ্ট সে প্রকল্পগুলি নিজ হাতে তুলে নেন। ফলে সেই সময়কার পঞ্চায়েতগুলি একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ে। সেইজন্য পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর প্রতিটি এমনভাবে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় যা হবে নির্দিষ্ট গ্রামের স্থায়ী সম্পদ। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি না হলে গ্রামোন্নয়নের কোন স্থায়ী পথ সৃষ্টি হবে না; কর্মসংস্থানের কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হবে না। বৃক্ষরোপণ, সেচনালা ও মজা পুষ্করিণী সংস্কার প্রভৃতি অজস্র কাজ আছে যা গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু স্থায়ী বৃত্তির সন্ধান দিতে পারে।

পঞ্চায়েত সংগঠনগুলির সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে অতিরিক্ত আর্থিক যোগানের প্রয়োজন। পঞ্চায়েত সংস্থার এই অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য রাজ্য-সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছেন। যেমন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত কর-অভিকর হিসাবে প্রতিবছর যে টাকা আদায় করবে সরকার তার সমপরিমাণ কিন্তু অনেধিক পাঁচহাজার টাকার অনুদান হিসাবে পঞ্চায়েতকে দেবেন। অনেকে মনে করেন, কর সংগ্রহের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে দিলে পঞ্চায়েতগুলি কর সংগ্রহ করতে উৎসাহ পাবে। শিল্প-বাণিজ্য এলাকার অনেক পঞ্চায়েত সাতাশ-আঠাশ হাজার টাকা কর হিসাবে সংগ্রহ করেছেন এমন নজীর আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের গড় কর-অভিকর হিসাবে সংগ্রহের পরিমাণ আগের মতই বলা যেতে পারে। চারহাজার টাকার কিছু ওপরে। এটা অবশ্য নবগঠিত পঞ্চায়েতের প্রথম বছরের হিসাব।

যাইহোক, পঞ্চায়েতের সম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার আরো যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চায়েতের এলাকাধীন সমস্ত খাস কিংবা সরকারে ন্যস্ত পুকুর ও জলাশয় পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়েছে। ভূমি-রাজস্বের অংশ সমিতিকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। সমিতির এলাকাধীন হাট, বাজার ও ফেরিগুলি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও অভিকর ধার্য করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। জেলাপর্যায়ে রোড সেস ও পূর্ত সেস বাবদ আদায়কৃত সমস্ত টাকা পরিষদকে অনুদান হিসাবে দেওয়া

হয়। তাছাড়া, রুর‍্যাল এমপ্লয়মেণ্ট সেসের সমস্ত টাকা পরিষদকে অর্পণ করা হয়ে থাকে।

এই ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত ও সমিতিগুলিকে তাদের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ সমুদয় ব্যয় মেটাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। পরিষদগুলিও কর্মচারীদের দেয় অর্থের শতকরা 80 ভাগ সরকার থেকে পেয়ে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সদস্যদের যাহা খরচ মেটানোর জন্য সরকার অর্থ অনুদান হিসাবে দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য এবং এই সংস্থাগুলি যাতে নিজস্ব তহবিল গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় করতে পারে সেজন্য উপরোক্ত সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, আইন সংশোধন করে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে সমিতি ও পরিষদ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহ করে নিজ নিজ প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারে। এর ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নত করে গ্রামবাসীদের আয় ও কর্মের সংস্থান বাড়ানো মোটেই অসম্ভব নয়। এখন আশা করা যায়, গ্রামীণ মানুষের প্রতি পঞ্চায়েতের যে প্রাথমিক পৌর কর্তব্য আছে তা' তাঁরা পালন করতে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হবেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রামের মানুষ যাঁরা শহরের বাসিন্দা হয়েছেন তাঁরা আর গ্রামে ফিরতে চান না। অথচ "গাঁয়ে চলো" শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে আজকাল। গান্ধীজিরও আন্দোলনের অন্যতম ধ্বনি ছিল "গাও মে কংগ্রেস"। গ্রাম-প্রধান ভারত। দেশের শতকরা আশীভাগ লোক গ্রামে বসবাস করেন। তাই গ্রামকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মূলতঃ কর্মব্যাপদেশে মানুষ শহরবাসী হয়ে থাকেন এবং আধুনিক পৌর সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্য মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। গ্রামে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এজন্য চাই গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম পৌর সুযোগ-সুবিধা এবং গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতি। এভাবে পরিবেশ ভালো হলে শহর ও গ্রাম পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

গ্রামীণ জনসম্পদ ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ে বিকেন্দ্রীত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামোন্নয়নের কৌশল। সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে

দেওয়ার কথা, তলা থেকে পরিকল্পনা (Planning from below), বিকেন্দ্রিত জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনার কথা উচ্চারিত হচ্ছে নানাভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কোন কার্যকরী ব্যবস্থা কখনো নেওয়া হয়নি। ফলে উপরওয়ালা থেকে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রাজ্যের প্রশাসন বিভাগের বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীকে একত্রিত করে পরিকল্পনা বলা হচ্ছে। বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিও বিভাগীও প্রশাসনিক দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে। এধরনের প্রচেষ্টায় তাই স্থানীয় অঞ্চলের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোন যোগ নেই এবং স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলায় অসমর্থ। গ্রামীণ-জনসংগঠন গড়ে না উঠলে এ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা যতই অর্থবহ হোক গ্রামীণ সংগঠন না থাকলে তা বাস্তবায়িত করা যায় না। উন্নতিকামী দেশগুলিতে তাই নূতন সংগঠন ও সংস্থার (Institution and Organisation) প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেবল বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ্‌ ও প্রশাসকদের নিয়ে এ দুরূহ কাজ সম্ভব নয়। এ রাজ্যের নয়া পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা গ্রামোন্নয়নের এ দীর্ঘ চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির নূতনভাবে গঠিত উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি-সংস্কার স্থায়ী সমিতির বিশেষ ভূমিকা তাই উল্লেখযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জেলায় অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির সংহতিসাধন করবার, এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ে রাজ্য-সরকারকে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদ ও তার নিম্নতর পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির মধ্যে কাজকর্মের সমন্বয়সাধনে অথবা জেলার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণে পরিষদের সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বিধিব্যবস্থার উল্লেখ নেই ফলে পরিকল্পনা ও উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেক এগিয়ে গেছে। মহারাষ্ট্রীয় জেলা পরিষদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যতটা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে জেলার পরিকল্পিত উন্নয়নের ব্যাপারে জেলা পরিষদ সচেষ্ট হবে।

এ কাজ করতে গিয়ে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত কর্তৃক ইতিপূর্বে রচিত পরিকল্পনাগুলি বিবেচনা করে বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবেন।[14a]

জেলাস্তরে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এক ধাপে হয় না। ব্লক স্তরে তথ্য-সংগ্রহ করাই হবে এবিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির মধ্যে এবং বিভিন্ন সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সার্থক সমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই এটাকে সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। স্থায়ী সমিতিগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োগিক কলা-কৌশল ও দক্ষতা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন না। তবে সমন্বয়ের মানসিকতা গড়ে তোলাই প্রথম সমস্যা। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী অফিসারদের মধ্যে এই আবহাওয়া গড়ে তোলবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এজাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করলে এঁদের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব মূলতঃ রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরেই থাকা প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্যস্তরে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজ্য পরিকল্পনা সংস্থা গড়ে ওঠেনি। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের একটি সীমিত সমন্বয়ের ভূমিকা আছে মাত্র। জেলা স্তরেও এরকম কোনও সংস্থা নেই। বর্তমানে অবশ্য জেলা পরিষদের 'উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি-সংস্কার' স্থায়ী সমিতি এ চাহিদা পূরণে অগ্রণী হতে পারে। সমন্বয়, মূল্যায়ন ও তথ্য-জ্ঞাপনে জেলা পরিষদের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির 'উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি-সংস্কার' স্থায়ী সমিতির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এটি একটি ব্লক-ভিত্তিক সমিতি। 'ব্লক' হচ্ছে এমন একটি সংস্থা যেখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা একত্রীভূত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে ও গ্রামবাসীর সক্রিয় সহযোগীতায় এক বিরাট গণ-উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন। এ সুযোগ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।[15]

পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সংহত করবার গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতী রাজ এ রাজ্যে জনগণকে তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে তাঁদের স্থানীয় সমস্যা সমাধানের কাজে কতখানি অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে তা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। যেমন, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, যাত্রাদল, যুবক সংঘ, মহিলা সমিতি, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গ্রামীণ সংস্থা। এই সংস্থাগুলি গড়ে তোলায় উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাধীন কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে।[16] এগুলি বলিষ্ঠ হলে গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়নি। স্বেচ্ছাসেবী সমিতি-গুলি আর্থিক, কারিগরী বা প্রশাসন বাবদ কোন সাহায্যই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পায়নি। আর যেসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের ভিত্তি খুবই দুর্বল এবং যেটুকু কাজকর্ম এরা করে থাকে তা খুবই বিক্ষিপ্ত ধরনের। ফলে গ্রামবাসীদের জীবনধারায় এই সংস্থাগুলি এখনও পর্যন্ত কোন নাড়া দিতে পারেনি। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটক বা ত্রিপুরার চিত্র পশ্চিমবঙ্গের মতই।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতিগুলি পঞ্চায়েতের সঙ্গে মোটামুটি কোন সম্পর্ক না রেখেই স্বাধীনভাবে গড়ে উঠছে। সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েত নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকায় বহুক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে। পুরাতন পঞ্চায়েত কাঠামোয় গ্রামসভার অর্থাৎ গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের নিয়ে নিয়মিত অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি ঠিকমত কাজ করেনি বা গ্রামসভাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সমালোচনার ভয়ে গ্রামসভার অধিবেশন ডাকা থেকে বিরত থেকেছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রামসভার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়। স্থানীয় জনগণকে জড়িত করা এবং একেবারে বুনিয়াদী স্তর থেকে কর্মসূচী রচনা করার উদ্দেশ্যে

প্রতিটি গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনা যত ব্যাপক হবে সমষ্টিগত প্রয়াসের সাফল্যও ততই বাড়বে এবং পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের হাত শক্ত হবে। অশোক মেহতা কমিটির প্রতিবেদনেও গ্রাম-সভার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : "The Gram Sabha has an important role in activating the democratic process at the grass-roots level, in inculcating community spirit, in increasing political awareness, in streng-theing developmental orientations, in educating the rural people in administrative and political processes and in enab-ling the weaker sections to progressively assert their point of view.[16]a একথা মনে করেই সম্ভবতঃ পঞ্চায়েত বিভাগ সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, পঞ্চায়েত যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করবে এখন থেকে জনগণকে তা জানাতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের লোক-সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় হাজার দশেক। আর পুরাতন কাঠামোয় পঞ্চায়েতের লোকসংখ্যা ছিল একহাজার বা তার কিছু বেশী। কাজেই এটা কার্যপরিচালনার পক্ষে অনেকটা অনুপোযোগী। পরামর্শ করবার জন্য বা গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ওয়ার্ড মিটিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা ত্রিপুরায় যেভাবে গ্রামসভার হাতে পঞ্চায়েতকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম-সভার হাতে ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা অনেক বড় এবং লোকসংখ্যাও অনেক বেশী।

তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি অর্থাৎ গ্রামের ক্লাব, মহিলা সমিতি প্রভৃতি সহযোগী জনসংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠলেই গ্রামবাসী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে। পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থানীয় বেসরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ্যতার সঙ্গে যতবেশী নিজ নিজ কাজে দক্ষতা দেখাতে পারবে গ্রামবাসীর আস্থা ততই এদের কর্ম-সূচীর উপর বৃদ্ধি পাবে এবং এদের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ স্থাপিত হলে গ্রামের জনমণ্ডলী পঞ্চায়েতের যে কোন কর্মসূচীতে সচেতনার

সঙ্গে নিবিড়ভাবে সাড়া দেবে। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার যোগ্য কর্তব্য-পালন করতে গেলেই প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপই হবে জনগণের সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করা এবং তার প্রধান হাতিয়ার হ'ল স্থানীয় বেসরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণস্পন্দনে ভরপুর করে তোলা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংঘগুলিকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে? অনেকে মনে করেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং পঞ্চায়েতের সদস্য নন এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যনির্বাহক (functional) সাব-কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই সাব-কমিটিগুলির কাজ হবে মূলতঃ উপদেষ্টামূলক। এদের মাধ্যমে গ্রামের সর্বাত্মক উন্নয়নের কাজে যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সমিতি, মহিলা সংস্থা প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থাকে একত্রিত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয়। বহুমতবাদী সমাজে এইসব সংস্থা বস্তুতই গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য অবদান যোগাতে পারে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প যখন চালু হয়নি বা গ্রাম পঞ্চায়েত যখন সৃষ্টি হয়নি গ্রামের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় ভূমিকা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠাগার পরিচালনা করত, যাত্রা বা থিয়েটার করত, গ্রামের রাস্তা সংস্কার ও পুকুরের কচুড়িপানা পরিষ্কারের দায়িত্ব বহন করত। মহামারী বা বন্যায় যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় এরাই তো সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা না করে আত্মোৎসর্গের ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসতো এবং এখনও আসে। এগুলি ছিল গ্রামের প্রাণকেন্দ্র এবং এখনো নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পঞ্চায়েতের পরি-কল্পনা রূপায়ণ ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও এদের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির যুবশক্তির উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মক্ষমতায় আস্তে আস্তে মরিচা পড়ে যাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাফল্য অর্জন করতে হলে এই গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাছে টেনে নিতে হবে। তখনই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে এক নুতন প্রাণ সঞ্চার।

গ্রামোন্নয়ন নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করছেন তাঁরা সকলেই স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গ্রামের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে পঞ্চায়েতের নেতৃবৃন্দের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ওপর। নেতৃত্বের বিন্যাস (leadership pattern) অনুধাবন

করবার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি পরিসংখ্যান এবং সেগুলির বিশ্লেষণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক variables যেগুলি নেতৃত্বের বিন্যাস নির্ণয় করবার জন্য প্রয়োজন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেতৃবৃন্দের বয়স, ধর্ম, জাতি, পেশা, শিক্ষা, আয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি। এই উপাদানগুলি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা (Economic Planning Stream) পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি সম্বন্ধে কিছু তথ্যানুসন্ধান ও কাজের মূল্যায়নের জন্য একটা নমুনা-সমীক্ষা করেছেন। এতে তাঁরা 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 100টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করে এই সমীক্ষা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই জাতীয় নমুনা-সমীক্ষা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মত একটি বিরাট এলাকার পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির 56 হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গ্রামীণ নেতৃত্বের বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্ফুটিত হয় না। যাহা হউক, এই সমীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদন[17] থেকে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত সদস্যদের বয়স, শিক্ষার মান, জীবিকা বা বৃত্তি, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি জানতে পারা যায়। পরের পৃষ্ঠায় 9 নম্বর সারণীতে ঐ সভ্যদের বয়সের একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। 30 বছরের নীচে সভ্যসংখ্যা শতকরা 21 ভাগ এবং 30 থেকে 39 বছরের মধ্যে শতকরা 38 ভাগ। আর 50 বছরের নিচে সভ্যদের শতকরা হিসাব হলো 85 ভাগ। এথেকে বলা যেতে পারে যে পঞ্চায়েতের নেতৃবৃন্দ বয়সে তরুণ।

সারণী সংখ্যা—10 থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শতকরা 78 জন সভ্যের শিক্ষাগত মান প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার নীচে শতকরা 8 ভাগ এবং গ্রাজুয়েট শতকরা 14 ভাগ। এই তালিকা একটু অন্যভাবে দেখলে দেখা যাবে যে শতকরা 44 জন সদস্যের শিক্ষাগত মান মাধ্যমিক স্তরের ওপরে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব বাছাই করা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির (elite) হাতে। অপরদিকে সভ্যদের বৃত্তিগত হিসাবের তালিকায় (11 নং) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মালিক-চাষী, শিক্ষক ও ডাক্তারদের একত্রে ধরলে তাঁদের সংখ্যাই শতকরা 66 ভাগ।

সারণী সংখ্যা—9
বয়স অনুপাতে সভ্যসংখ্যা

বয়স বর্গ	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
20-24	62	4
25-29	251	17
30-34	271	18
35-39	292	20
40-44	212	15
45-49	164	11
50-54	98	7
55-59	61	4
60	56	4
মোট	1466	100

সারণী সংখ্যা—10
শিক্ষার মান

শিক্ষার মান	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
অশিক্ষিত	10	1
কেবল লিখতে ও পড়তে পারেন	57	4
প্রাথমিক স্তরের নিচে	49	4
প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত	214	14
মধ্যস্তর পর্যন্ত	499	37
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক	436	30
গ্রাজুয়েট	161	11
পোষ্ট গ্রাজুয়েট	30	2
কারিগরী ডিগ্রি	10	1
মোট	1466	100

সারণী সংখ্যা—11
(সভ্যদের বৃত্তিগত হিসাবের তালিকা)

ক্রমিক সংখ্যা	পেশা	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
1.	মালিক-চাষী	743	50·7
2.	শিক্ষক	206	14·0
3.	বেকার	110	7·5
4.	ভূমিহীন ক্ষেতমজুর	70	4·8
5.	ভাগচাষী	26	1·8
6.	কারিগর	23	1·6
7.	দোকানদার	20	1·4
8.	কারিগরী শ্রমিক	19	1·3
9.	ডাক্তার	16	1·1
10.	দর্জি	8	0·6
11.	ছাত্র	8	0·6
12.	জেলে	6	0·4
13.	অন্যান্য	211	14·4
	মোট	1466	100

গণতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যই পঞ্চায়েতী রাজের প্রতিষ্ঠা। পঞ্চায়েত সংগঠনকে গণমুখী করে তোলার জন্য প্রশাসনের সর্বাঙ্গীন কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন শাখা, এতদিন যার কোন স্বতন্ত্র তাৎপর্য সুস্পষ্ট ছিল না, সম্প্রতি পঞ্চায়েত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পূর্বতন বি. ডি. ও. হয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক আধিকারিক; ব্লক-অফিসের বিবর্তন হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে। জেলা শাসককে করা হয়েছে পরিষদের কার্যনির্বাহক আধিকারিক। তাছাড়া, গ্রামসেবকদের যুক্ত করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে। জন-প্রতিনিধির কর্মক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রভাবকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টাটি লক্ষণীয়।

এখানে একটি সমস্যার উল্লেখ বোধ হয় সমীচীন। প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর

নাম-পরিচয় ও অন্যান্য কর্মাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই যে কেবল গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা যায় তা নয়, গণমুখী প্রশাসনের নিত্য সঙ্গী রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা। এই স্বচ্ছতার অভাবে কাঠামোর আপাত-পরিবর্তন গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কের মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে বলে মনে হয় না। হয়ত প্রতিষ্ঠিত সরকারী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তে আরেক ধরনের আমলাতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত হবে। আর তেমন কোনো পরিণতি পঞ্চায়েতগুলির পক্ষে হবে একান্ত ভয়াবহ।[18]

পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি যাতে নয়া আমলাতন্ত্রে পরিণত না হয় তার একমাত্র রক্ষাকবচ হল, পরিকল্পনাগুলো জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া, সেগুলো সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা এবং তার হিসাব-নিকাশ জনগণের কাছে পেশ করা। কোন কোন জায়গায় এটা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের হিসাব পঞ্চায়েত অফিসে টানিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। অনেকে এটা করছেন, কেউ কেউ করছেনও না। এটা যাতে বাধ্যতামূলক হয় সে সম্পর্কে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন।[19] এই আদেশ কতখানি পালিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মহিলা প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। তবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের যে স্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্ব নেই সেখানে আইন অনুসারে অনধিক দুজন মহিলা প্রতিনিধি সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। পঞ্চায়েতের নির্বাচনে মহিলারা ছিলেন ভোটদাতাদের বেশ বড় অংশ, কোথাও অর্ধেক বা কোথাও অর্ধেকের বেশী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সাফল্যর ক্ষেত্রে তাঁরা একেবারেই পিছিয়ে। পঞ্চায়েতের নিম্নতর দুটি স্তরে কোন কোন এলাকায় দু'চারজন মহিলা প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হলেও জেলা পরিষদে নির্বাচিতদের তালিকায় তাঁদের নাম প্রায় নেই বললেই চলে। নারী শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ ও রাজ-নৈতিক চেতনতার বিকাশে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দিশারী। কিন্তু সেই পশ্চিমবঙ্গ জন-প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মহিলাদের এগিয়ে দিতে অক্ষম। এবার পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে দলীয় ভিত্তিতে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই মহিলাদের পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখাননি। তাছাড়া, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে

মহিলাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং প্রচলিত পর্দাপ্রথা। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত দপ্তরে একজন মহিলা অফিসার রয়েছেন। তিনি মহিলাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

আমাদের দেশের শ্রেণী শাসিত খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন পল্লী এলাকায় এক বৃহৎ সংখ্যক জনমত প্রাথমিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের পক্ষপাতী নয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাপ্রনোদিত সহযোগীতা লাভ করাই পঞ্চায়েতী রাজের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতার মেলবন্ধন হয় না। কারণ 'রাজনৈতিক দলগুলি যেখানে ঐক্যের প্রয়োজন সেখানে অনৈক্যের সৃষ্টি করে, মতভেদ যেখানে কমিয়ে আনা দরকার সেখানে তা বাড়িয়ে তোলে।'[20] তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের মত এত বৈচিত্রময় গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য কোন কর্মসূচী রাজনৈতিক দলগুলির নেই। আরো অভিযোগ, বিরোধী দলগুলি চালিত পঞ্চায়েতগুলি অবহেলা ও বঞ্চনা এবং হতাশার শিকার হতে পারে।

পঞ্চায়েতী প্রশাসনে রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ যাঁরা চান না তাঁদের উপরিলিখিত বক্তব্যর মধ্যে অনেকটা সত্যতা রয়েছে। কিন্তু এটা হচ্ছে জটিল একটি সমস্যার অতি-সরলীকরণ। পঞ্চায়েত থেকে রাজনৈতিক দলগুলির অপসারণের প্রস্তাব শুভ ও শ্রেয় হলেও তা কার্যকর করা সহজ নয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও পুরাতন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক রেষারেষি যাতে না প্রবেশ করে সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়েছিলেন। অপর দিকে অঞ্চল প্রধানগণ পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং অধ্যক্ষদের তাঁদের নিজ নিজ জেলার আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে কোটা বা আনুপাতিক অংশ ছিল। সুতরাং তাঁদের মাধ্যমেই গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিকদলের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো।

একথা সত্যি যে রাজনৈতিক দলগুলিকে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় জড়িত

করলে গ্রামাঞ্চলের বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিগুলির বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু এইসঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, রাজনৈতিক দলগুলি জনস্বার্থকেই তুলে ধরে এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলে। তাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন স্বচ্ছন্দভাবে চলতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মসূচীর সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গিও এভাবে গড়ে ওঠে। তাছাড়া, পঞ্চায়েত থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে সরিয়ে রেখে গ্রামাঞ্চলে বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দমন করা যাবে না। বরং রাজনৈতিক দলগুলি এইসব সংস্থা থেকে সরে গেলে তাদের জায়গা নেবে বর্তমানের জাতি, ধর্ম বা অর্থনীতি-ভিত্তিক কিছু সুবিধাবাদী সংকীর্ণ গোষ্ঠী। আর সব সময়েই দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলি অন্তরালে থেকে কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলিকে সরাসরি পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিতে দিলেই ভালো হবে, কারণ সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে কোন খারাপ কাজ হলে তার জন্য তাদের দায়ী করা যাবে। পঞ্চায়েতে পদাধিকারী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা একদিকে যেমন পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রামবাসীর নিকট দায়ী অন্যদিকে তারা তেমনি তাদের নিজ নিজ দলের নিকটও দায়ী। তাছাড়া, পঞ্চায়েত কর্মীদের ওপর রাজনৈতিক দলগুলির নিয়ন্ত্রণ থাকায় তারা চাইবে না যে জনগণের কাছে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক। কেননা জনগণের কাছে তারা যে সততা, অখণ্ডতা এবং উদ্যমের সঙ্গে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তাছাড়া, যেসব রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট সমাজবোধ রয়েছে তারা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রচার এবং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলবার জন্য কাজ করে থাকে। এগুলিই গ্রামবাসীদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতিগত ও ধর্মীয় গোঁড়ামী দূর করতে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে তারা তখন বিস্তৃত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে শেখে।

প্রসঙ্গত আরো বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাজ্য বিধানসভার মধ্যে এবং গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত এক সাংগঠনিক যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, বিরোধী দল রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার দখল করতে না পারলেও তারা হয়ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থায়

ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হতে পারে। ফলে দলীয় ব্যবস্থা 'বহুত্বমূলক ক্ষমতার বনিয়াদ'[21] গড়ে তুলতে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে পারে। মেহতা কমিটিও মনে করেন, পঞ্চায়েতী রাজের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ কাম্য। তাছাড়া, ঐ কমিটির প্রতিবেদনে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : Their participation would make for a clearer orientation towards programmes and would facilitate healthier linkages with higher level political processes. It is also necessary to provide constructive outlet to opposition parties ; parties out of power at the state level may be able to chalk out achievement at the District level. Direct elections coupled with programme-based contests would offer greater scope to weaker sections for availing the opportunities offered by the political system.[22]

পঞ্চায়েতের ওপর ক্রমশঃ আরো অনেক কাজের দায়িত্ব পড়বে বলে আশা করা যায়। এ অবস্থায় অন্যান্য সংস্থার মত পঞ্চায়েতেও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে। মাইরন ওয়েনার যথার্থই বলেছেন, 'অনেক গান্ধীবাদীর মত যাঁরা দাবী করেন যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো বেশী ক্ষমতা দেওয়া হোক, কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক দল বা জাতি অথবা গোষ্ঠী নিয়ে কোন রাজনীতি থাকবে না তাঁরা এক পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। যেখানে ক্ষমতা আছে সেখানে রাজনীতি থাকবেই। অর্থনীতিতে যেমন চাহিদা ও যোগান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তেমনি এটা একটি মৌলিক নিয়ম।'[23]

সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলিকে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়া নয়, তাদের কী করে সুষ্ঠুভাবে গ্রামভিত্তিক গণতান্ত্রিক প্রশাসন পরিচালনায় জড়িত করা যায় সেটাই বর্তমানের সমস্যা। ক্ষেত্রীয় বা সরেজমীন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পঞ্চায়েত থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অথবা তাদের কাজকর্ম সীমিত করে দলীয় রাজনীতির ব্যাধি দূর করা যাবে না। গণতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ ও পুরোপুরি আস্থা থাকা চাই ; এর মধ্যে

কোন সন্দেহ জড়িয়ে থাকলে আস্থার ওপরে সন্দেহই জয়ী হবে এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবে। বরং আমাদের বহুত্ববাদী সমাজে রাজনৈতিক দলগুলি যদি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলে তারা পাবে 'larges channels for constructive efforts when, through democratic decentralisation, levels of meaningful action are extended beyond the centre and the states. With the people and parties having adequate opportunities to exercise power at various levels, the democratic polity······will get richly and more seriously structured'.[24]

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে বটে কিন্তু গ্রামীণ সংস্থাগুলিতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুষ্ঠ হস্তান্তর, কিংবা দায়-দায়িত্বের প্রকৃত প্রত্যভিযোগ এখনও করা হয়নি। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের উপর যাঁদের অনেক উচ্চ প্রত্যাশা ছিল তাঁরা এর ফলে হতাশ হয়েছেন। এর জনপ্রিয় ভাবমূর্তিও এতে ক্ষুন্ন হয়েছে। বর্তমানে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি মুখ্যতঃ রাজ্যসরকারের নিযুক্তক (Agent) বা প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সীমিত কাজকর্ম চালাচ্ছে। কেবল গৌণতঃ তারা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ইউনিট। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দায়-দায়িত্ব প্রত্যভিযোজনের এটা একটা অবাঞ্ছিত মিশ্রণ। সুতরাং রাজ্যসরকারের হাত থেকে প্রকৃত ক্ষমতা পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরের জন্য ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা সত্যি সত্যি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে।

অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণের পরিমাণ কি হবে তার কোন মাপকাঠি নেই। পল. এইচ. অ্যাপলবি-র মতে, জাতীয় সংহতিসহ প্রশাসন দক্ষতাই বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত বিচারক। যে কোন প্রশাসনের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত আবশ্যক। এর অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকরণ জাতীয় দুর্বলতার সামিল হবে এবং টমাস্ জেফারসনের ভাষায় 'স্থানীয় আত্মম্ভরিতা'-র সৃষ্টি করবে। অ্যাপলবি তাই জাতীয় মান বজায় রাখবার জন্য উচ্চতর কতৃপক্ষ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেছেন।[25] কিন্তু আমাদের মতে, এই কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ সরকারী প্রভাবমুক্ত একটি স্বশাসিত পর্ষদ্ হওয়া চাই।

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। এই শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে বহুস্তর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ককে মোটামুটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ছাঁচে স্থির করা যেতে পারে। তাতে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি আরো ভাগ করে স্থানীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলি বহু-স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তরিত করা যেতে পারে। গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি গ্রামাঞ্চলে ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তেমনি এই ইউনিটগুলির কাজকর্ম ভাগ করে দিতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলি যদি একটি সুসংহত জাতির ভিত্তি হয় তাহলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটগুলির স্বশাসন ক্ষমতাও একটি রাজ্যের সংহতির সুস্থ বনিয়াদ গড়ে তুলতে পারে।

গ্রামভিত্তিক গণতন্ত্রের ধারণার পেছনে রয়েছে একটি আস্থাবোধ। সে আস্থা হল সাধারণ গ্রামবাসীদের দক্ষতা, সাধারণ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ওপর আস্থা। যদি তাই হয়, তাহলে এই গ্রামভিত্তিক গণতন্ত্রকে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন যন্ত্র থেকে মুক্ত করে একে নিজের পায়ে দাঁড় করানো দরকার ছিল। এতদিন ধরে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র যে কর্তৃত্ব ও দায়-দায়িত্ব বহন করে আসছিল তা গ্রামীণ জনগণের হাতে হস্তান্তর করা উচিত ছিল। গ্রামের মানুষ 'শিক্ষিত না হতে পারে কিন্তু নিজেদের স্বার্থে এবং সমগ্র দেশের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তাদের রয়েছে।'[২৬] সাধারণ লোকের ওপর আস্থা বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকবচ। এজন্যেই সংবিধান রচনার প্রারম্ভ থেকেই ভারত বয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করেছে।

অবশ্য একথা সত্য পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য যতটা না তার কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল তার চেয়ে বেশী নির্ভরশীল গ্রামবাসীদের যোগ্যতার ওপর। কারণ তারাই এই প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি। মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট জীবনের অন্যান্য বিভাগের মত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেও পরিমাণের চেয়ে গুণগত উপাদানেরই প্রাধান্য। পৌর সচেতনতা পরীক্ষা বা নির্ণয়ের কোন জানা পদ্ধতি নেই। তথাপি তা রয়েছে এবং স্থানীয় পরিষদের বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতায়

আলোক উদ্ভাসিত করতে তা এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্নিশিখা বা আলোক বর্তিকার মত।[২৭] কিন্তু পৌর সচেতনার স্বার্থে মূল দেশে যারা কাজ করেছে সেই গ্রামবাসীদের সামাজিক ধ্যান ধারণায় একটা পরিবর্তন ঘটানো দরকার। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ পঞ্চায়েতী রাজকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সংবিধানের মূলনীতি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূলস্তম্ভ হল দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তারা শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত। আবহমানকাল থেকে তারা চরম আর্থিক দুর্দশা ও স্থায়ী ঋণে জর্জরিত হয়ে জীবন কাটায়। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না করতে পারলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে কখনোই আশা করা যায় না। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সফল করে তুলতে হলে বর্তমান মুহূর্তে আশু প্রয়োজন হলো আর্থিক সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দেয়া এবং তাদের জন্য বাধ্যতামূলক সার্বজনীন ও বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এটা করা সম্ভব হয়নি। 'সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর লোকদের হাতে পৌঁছেছে। এ তথ্য থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত নেয়া চলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্ভবত এই সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়েই পৌঁছেছে।'[২৮] পঞ্চায়েতের প্রশাসনে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এখনো খুবই কম। সমান পর্যায়ের সমান শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই কেবল গণতন্ত্র কাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলিতে বৈষম্য ও শোষণের মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা, জমির অসম বণ্টন এবং ঋণ দান। শিক্ষার প্রসার ঘটলেও প্রাথমিক শিক্ষার হার খুবই কম। সমবায় আন্দোলন তেজরতি ব্যবসার সমাপ্তি ঘটাতে পারতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের আগ্রহ সত্ত্বেও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি। যাদের জন্য ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তারা এর সুযোগ নিতে পারেনি। ভাগচাষী এবং ক্ষেত-মজুরদের অবস্থাও কম খারাপ নয়। বর্তমানে এসব ব্যাপারে নূতন উদ্যমে কাজ চলছে। তবে যতদিন পর্যন্ত

গ্রামবাসীদের মধ্যে এই দারুণ বৈষম্য থাকবে ততদিন তারা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মানুষ বলে নিজেদের ভাবতে পারবে না। এ ধরনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য। অবশ্য রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে যে আর্থিক সমতা আনার কথা বলা হয়েছে তা কার্যকরী হ'লে অনেকটা পরিমাণে পঞ্চায়েতের পরিচালনার উপযোগী পঞ্চায়েতী মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

REFERENCES

1. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 20.

1a. Ibid, Sec, 109(1) (e) (f) ; Sec. 115.

2. Ibid, Sec. 109(1) (a) (b) (c) (d).

3. Ibid, Sec. 109(2).

4. Ibid, Sec. 109(3).

5. Ibid, Sec, 114(3).

5a. জেলা পরিষদের উপর প্রশাসনিক কাজকর্মের ভার অর্পণ করবার জন্য রাজস্থান সরকার সম্প্রতি পঞ্চায়েতী আইন সংশোধন করেছেন।

6. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 153(2).

7. Ibid, Sec. 153(3) (4).

8. Ibid, Sec. 175.

9. Ibid, Sec. 153(1) (e).

10. Ibid, Sec. 163.

11. "Panchayats—An Operation Grass Root", West Bengal, July 1, 1980, PP. 11-12.

12. "Editorial", Panchayati Raj (Bengali), June, 1980, P. 1.

13. নারায়ণ সান্যাল, গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা, ১৯৮০, অশোক পুস্তকালয়, পৃঃ (ii-iv).

14. Asit Kumar Basu and Biren Saha, 'West Bengal's Panchayati Experiment', The Economic Times, Calcutta, Sept. 4, 1979.

14a. The Maharastra Zilla Parishads and Panchayati Samities Act, 1961, Sec. 100(4).

15. সুহৃদ মল্লিক, 'গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত', পঞ্চায়েতী রাজ, জুন, ১৯৮০, পৃঃ 12-14.

16. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 21(d) (o) (p).

16a. Report of the Committee on P. Raj Institutions, 1978, Government of India, P. 44.

17. S. P. Mallik, The Working of the Panchayat System in West Bengal, Government of West Bengal, 1980, PP. 41-43.

18. পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেতার ভাষণ, পশ্চিমবঙ্গ, জুন ২২, ১৯৭৯.

19. G. O. No. $\frac{\text{7800-Panch}}{\text{1P-39/80}}$, 10. 4. 80, Dept. of Panchayats & C. D.

20. Jayaprakash Narayan, A Plea for Reconstruction of Indian Polity, Akhil Bharat Sarva Seva Sangh Prakashan, 1959, Kashi, P. 70.

21. S. C. Jain, Community Development and Panchayati Raj in India, Allied Publishers, 1967, Calcutta, P. 609.

22. Report on P. Raj Institutions, 1978, Government of India, P. 52.

23. Myron Weiner, Party Building in a New Nation, University of Chicago Press, 1967, Chicago, Part III, P. 167.

24. Report of the Committee on Panchayati Raj Institutions, 1978, Government of India, P. 33.

25. Paul H. Appleby, 'Some Thoughts on Democratic Decentralization', The Indian Journal of Public Administration, October-December, 1962,

26. Dr. Rajendra Prasad quoted in The Statesman, Calcutta, January 10, 1973.

27. William A. Robson, The Development of Local Government, George Allen & Unwin, London, P. 249.

28. R. N. Haldipur and V. R. K. Phramahamsa, Ed., Local Government Institutions in Rural India, National Institute of Community Development, 1970, Hyderabad, P. 95.

সপ্তম অধ্যায়

কমিটি ব্যবস্থা এবং তার সমস্যা

কমিটি ব্যবস্থা ছাড়া কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরই সুষ্ঠুভাবে কাজ করা দুষ্কর। বস্তুতঃ যেসব দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উন্নত ব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানে স্থানীয় প্রশাসনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হলো কমিটি ব্যবস্থা।

পরিকল্পনা রচনা, প্রশাসন এবং উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের এক অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু এইসব সংস্থার অধিকাংশ সদস্যই অতি সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েতের কাজে তারা কেবল আংশিক সময়ই ব্যয় করতে পারে। বৃহদায়তন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রশাসনিক খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা এবং প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় একটি অবিচ্ছিন্ন নীতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য তাই সরকারের সমস্ত কাজ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মূল সংস্থার কাজ হলো সাধারণভাবে সমস্ত কাজের তদারকি করা। কমিটি ব্যবস্থার প্রয়োজন একারণেই। ইংলণ্ডে সমস্ত ধরনের স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষই এ ধরনের কমিটি ব্যবস্থার সাহায্য নেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুধু পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদেই এ ব্যবস্থা রয়েছে।

স্থানীয় কোন সমস্যা বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তদনুযায়ী সুপারিশ করবার জন্য কোন কমিটি নিযুক্ত হতে পারে। এই কমিটি কর্তৃপক্ষকে ঐ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেই সাহায্য করে। এই ধরনের কমিটির নিজের উদ্যোগে কাজ করবার কোন ক্ষমতা থাকে না। আবার কোন বিশেষ সেবামূলক (service) কাজের পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এই কমিটির হাতে অর্পণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কমিটি ভারপ্রাপ্ত বিষয়ে পুরো প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। শুধুমাত্র তাকে যা করতে হবে তা হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট মাঝে মাঝে কাজের রিপোর্ট পেশ করা। সংক্ষেপে বলতে পারা যায় যে

কমিটি উপদেষ্টামূলকও হতে পারে, আবার কার্যনির্বাহীও হতে পারে। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে শেষোক্ত ধরনের কমিটি ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে।

আবার, যে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কমিটি দু'ধরনের হয়ে থাকে—বিধিবদ্ধ এবং অবিধিবদ্ধ (Non-statutory)। ষ্ট্যাটুটারি বা বিধিবদ্ধ কমিটি হলো সেইগুলি যেগুলি আইন বা আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী দ্বারা গঠিত। এইসব কমিটির কার্যাবলীও আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ পর্যায়ে কয়েকটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি বিধিবদ্ধ কমিটি। পক্ষান্তরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী যে কমিটি গঠিত হয় তা বিধিবদ্ধ নয়। এই কমিটির কাজকর্ম কি হবে তাও ঐ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষই স্থির করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের যুক্ত কমিটিগুলি এই পর্যায়ের। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক নয়।

কমিটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

এই কমিটি ব্যবস্থায় কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা সম্ভব হয়। কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচও এই কমিটিগুলি। আমলাতান্ত্রিক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন প্রতিরোধের পক্ষেও এগুলি অস্ত্রস্বরূপ। এইসব কমিটি কর্মচারীদের জনমতের সঙ্গে যুক্ত রাখে। বহুজনের মতবাদের মধ্যে বিচক্ষণতা থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "জনগণের ব্যাপার দূরে থাক নিজের ব্যাপারেও কোন লোক সঠিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না। এটা ঘটে তখনি যখন সে স্বভাবতঃ নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকেই অথবা কোন একজন মাত্র উপদেষ্টার ব্যবহার করে।"[1] কমিটি ব্যবস্থায় সমবেতভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ এতে সমস্ত সদস্যেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি রচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ বা অবকাশ রয়েছে। ফলে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সমবেত চিন্তার ফসল হিসেবে তা সঠিক হবার সম্ভাবনাই বেশী। কমিটি সমবেতভাবে সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য

দায়িত্ব নিয়ে থাকে। তাই সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার ব্যাপারেও তদারকির ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

তাছাড়া, এই কমিটি ব্যবস্থায় "কর্মচারীদের পক্ষেও সুবিধাজনক"।[2] এতে তাঁরা কাজে আরো বেশী সতর্ক হন। কারণ, বিভিন্ন স্বার্থ ও পদাধিকারের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলির কাছে তাঁদের কাজের জবাবদিহি করতে হয়, ব্যাখ্যা দিতে হয়।

আরো একটি কথা এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি রচনার কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। ফলে বিরোধীপক্ষীয় যেসব ব্যক্তি স্থানীয় এলাকার সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সচেতন স্থানীয় সমস্যাদির প্রতিকারের জন্য গৃহীত সেবা প্রকল্পে তাঁদের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া স্থানীয় সংস্থার পক্ষে এর ফলে সম্ভব হয়। সুতরাং কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধীপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাজকর্ম সমালোচনা করবার এবং গঠনমূলক প্রস্তাব দেবার আরো বেশী সুযোগ পান।

গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়

এবার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সংগঠনে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে পঞ্চায়েত সংস্থার উচ্চতর দু'টি পর্যায়ের ন্যায় নিম্নতর পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কার্য সম্পাদনের জন্য কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক নয়। পুরাতন পঞ্চায়েত আইনে অঞ্চল পঞ্চায়েতকে তার কাজের সুবিধার জন্য একাধিক কমিটি গঠন করবার এবং এ ধরনের প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা স্থির করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।[3] কিন্তু নূতন আইনে এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে দুই বা অধিক গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ব অনুমোদনক্রমে তাদের যৌথ স্বার্থের অনুগামী কোন কাজের জন্য যৌথ বা যুক্ত কমিটি গঠন করতে পারেন।[4] সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এমন যে কোন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষমতা পঞ্চায়েতগুলি এই কমিটির ওপর অর্পণ করতে পারে। এ জাতীয় কমিটি গঠন করতে হলে একটি লিখিত দলিল (Instrument) প্রস্তুত করতে হয়, এবং ঐ দলিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকবে :

(a) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যার জন্য যৌথ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং শর্তাবলী যার ভিত্তিতে যৌথ কমিটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে যা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ওপর বাধ্যতামূলক হবে,

(b) যৌথ কমিটির কার্যকালের মেয়াদ ;

(c) যৌথ কমিটি গঠনে ইচ্ছুক গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রত্যেকে ঐ কমিটিতে কতজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন তার সংখ্যা এবং সদস্যদের পদ-কাল ;

(d) যৌথ কমিটি যে কার্য সম্পাদন করবে তার তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাসহ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাগুলি ; এবং

(e) কোন যৌথ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।[5]

কমিটিভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে বিষয়টি রাজ্যসরকারের নির্ধারিত অফিসারের কাছে পেশ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য।[6] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত এ ধরনের গ্রাম পঞ্চায়েতের যুক্ত কমিটি গঠিত হয়নি।

একথা ঠিক যে পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনা করবার জন্য কোন কমিটি গঠন করবার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত যদি তার কাজের সুবিধার জন্য কমিটি গঠন করে সেক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে কমিটি গঠন না করবার মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রধানদের ভয় এবং দম্ভের মানসিকতা। অধিকাংশ প্রধান যৌথ নেতৃত্বের দ্বারা চালিত হতে চান না। তাঁরা মনে করেন, যৌথ নেতৃত্ব গ্রহণ তাঁদের ব্যাক্তিগত মর্যাদার হানিকর। এই গ্রামীণ নেতারা কোন আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ ছাড়া নিজেদের জনগণের প্রতিনিধি এবং সেবক বলে ভাবেন না। পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা স্থানীয় স্বৈরাচারী নেতার মত আচরণ করেন। তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সুতরাং উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা কমিটির চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমবেত সমাবেশই শ্রেয় মনে করেন।

এই গ্রামীণ নেতাদের আশঙ্কা, কমিটি ব্যবস্থায় কাজকর্মে বিলম্বের সৃষ্টি হতে পারে এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এই আশঙ্কা সমর্থনীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের যুক্তি হলো গ্রাম পঞ্চায়েতের মত ছোট সংস্থার পক্ষে কমিটি ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার দরকার পড়ে না। গ্রাম পঞ্চায়েত সংস্থাই তো কমিটির মত। তাঁদের গড় সদস্য সংখ্যা পঁচিশের বেশী নয়। তাঁদের কাজকর্মের পরিমাণও বেশী কিছু নয়। তাঁদের এই যুক্তি কিছুটা সত্যি হলেও এইসব নেতাদের বোঝা উচিত, কোন গণতান্ত্রিক সংগঠনে কার্যকরী কমিটির গুরুত্ব কত অপরিসীম।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানে বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্র রয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ এ রাজ্যে জনগণকে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে তাদের স্থানীয় সমস্যা সমাধানের কাজে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। সুতরাং কয়েকটি কার্য-নির্বাহক সাব-কমিটি গঠন করে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের এইসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে। তাদের আর নুতন করে উৎসাহ বা কর্মপ্রেরণা যোগাবার দরকার নেই। সুতরাং গ্রামোন্নয়নের কাজে তাদের নিযুক্ত করা অত্যন্ত সুবিধাজনক। আপন সদস্যদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এইসব সংস্থার পক্ষে জনগণের মধ্যে সেবার মনোভাব গড়ে তোলা সহজ হবে। ফলে সামাজিক কর্মপ্রয়াসে গতিসঞ্চারে এইসব সংস্থা অনেক কিছুই করতে পারে।

তাছাড়া, গ্রামগুলিতে এমন অনেক বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ লোক আছেন যাঁরা জনসমষ্টির সেবা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু নির্বাচিত নাও হতে পারেন। এই আশঙ্কায় গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন প্রার্থী হতে চান না। কার্যনির্বাহক সাব-কমিটিগুলিতে এইসব ব্যক্তিকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা দরকার। কেননা এভাবেই সমষ্টির কল্যাণে সর্বশ্রেণীর মানুষকে কর্মপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতে কমিটি ব্যবস্থার কার্যত অভাব পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সুস্থ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৯ সালে মহীশূরে অনুষ্ঠিত সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয়

সম্মেলনের অভিমতের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় "পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী সাব-কমিটিগুলির ভূমিকা হবে উপদেষ্টামূলক"।[7]

সমিতি/পরিষদ পর্যায়

কিন্তু নিম্নতর পঞ্চায়েতের সঙ্গে তুলনায় উচ্চতর দুটি পঞ্চায়েতের কমিটি-গুলির কাজকর্ম হবে ভিন্নরকম। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর গঠিত উচ্চতর পঞ্চায়েতের কমিটিগুলি এ ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে এতে ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনকে অনুসরণ করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে অনেক ক্ষমতা ও নানা ধরনের কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। সত্যি করে বলতে গেলে গ্রামজীবনের প্রতিটি দিকের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করছে এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, তদারকি এবং সমন্বয়মূলক কাজকর্মের ওপর। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিপুল সংখ্যক সদস্য রয়েছে। সুতরাং গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাদের ছোট ছোট কমিটি গঠন করতে হয়।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের একই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একই ধরনের স্থায়ী সমিতি (ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি) রয়েছে। পঞ্চায়েতী আইনে মূলতঃ আটটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে। নীচে 12 সংখ্যক সারণীর প্রথম কলমে এগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর এইসব ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যেসব বিষয়ে কাজ করবে তাও ঐ সারণীর দ্বিতীয় কলমে দেখানো হয়েছে।

সারণী সংখ্যা—12

(1)	(2)
(1) অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি	অর্থ, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষা, কর নির্ধারণ, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান পরিচালন, সমন্বয় এবং তদারকি।
(2) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি	জনস্বাস্থ্য, অনাময় ব্যবস্থা (sanitation), পুষ্টি, পল্লী জল সরবরাহ, ঔষধালয়, হাসপাতাল এবং পরিবার পরিকল্পনা।

(1)	(2)
(3) পূর্ত কার্য স্থায়ী সমিতি	সেতু ও কালভার্টসহ সড়ক, সরকারী ভবন নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পূর্ত ও সম্পত্তির পল্লী আবাসন।
(4) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	সমবায়, বন, বিপণন, পল্লী ঋণ।
(5) শিক্ষা স্থায়ী সমিতি	প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা, সাক্ষরতা, বিনোদন, বয়স্ক শিক্ষা, তথ্য ও জন-সংযোগ, প্রচার।
(6) ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি	কুটির শিল্প, ত্রাণ, জনকল্যাণ, বেকারভাতা, বার্ধক্যজনিত ভাতা, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্প, নারী ও শিশুকল্যাণ, আদি-বাসীকল্যাণ প্রভৃতি।
(7) উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি	পরিকল্পনা, উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প।
(8) মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতি	মৎস্য চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন ও পশুচিকিৎসা।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিতে প্রথমে ছয়টি কমিটি ছিল। পরবর্তীকালে সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার সঙ্গে উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি এবং পশুপালন সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি যোগ করা হয়। তাছাড়া, রাজ্যসরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ অন্যান্য স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব শিক্ষা স্থায়ী সমিতি রয়েছে। এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই স্থায়ী সমিতিগুলি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাছাড়া, গত পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ও তত্ত্বাবধান নিয়ে কাজ করে চলছে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী

গঠিত জেলা স্কুল বোর্ড। জেলা স্কুল বোর্ডে বেশ কয়েকজন পদাধিকার বলে সদস্য, কয়েকজন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য এবং কয়েকজন রাজ্যসরকার দ্বারা মনোনীত সদস্য রয়েছেন। ১৯৬৯ সালে অবশ্য জেলা স্কুল বোর্ড বাতিল করে দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করবার জন্য ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয়েছে কিন্তু তা' এখনো কার্যকরী হয়নি। তাই আমাদের মনে হয় জেলা স্কুল বোর্ডের মত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত একটি সংস্থার ওপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের দায়িত্ব না রেখে এ দায়িত্ব জেলা পরিষদে বর্তানো হোক। তাছাড়া, এর ফলে প্রশাসনিক ব্যয়ও অনেক কম হবে।

পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রত্যেক স্থায়ী সমিতি তিন প্রকারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত।[8] পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদাধিকার বলে সমিতি/পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির সদস্য। সমিতি/পরিষদের সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রত্যেক স্থায়ী সমিতিতে অন্যূন তিনজন এবং অনধিক পাঁচজন সদস্য পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন করেন। তাছাড়া, রাজ্যসরকার অনধিক তিনজন করে তাঁর অফিসার প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্য নিযুক্ত করেন (সারণী সংখ্যা-13 দ্রষ্টব্য) জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি দুটির বেশী স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারেন না।[9] কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি ছাড়া অপর কোন সদস্য তিনটির বেশী স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারেন না।[10] অনেকে মনে করেন, এই সদস্যপদ শুধুমাত্র একটি স্থায়ী সমিতিতে সীমিত করা হোক। তার ফলে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রতিটি সদস্যই কোন না কোন কমিটিতে কাজ করবার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া, যেসব সমিতি বা পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ঐ সমিতি বা পরিষদ কর্তৃক কমিটি-গুলিতে নির্বাচিতব্য সুনির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যার তুলনায় কম সেসব ক্ষেত্রে এই ধারা শিথিল করা অবশ্যই দরকার। তাহলে প্রায় প্রতিটি সদস্যই কোন কমিটিতে কাজ করবার সুযোগ পাবেন। এছাড়া, বিরোধীপক্ষকে যদি এইসব কমিটিতে ঠিকমত প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ দেওয়া হয় তা'হলে ন্যায় বিচার, সততা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য আরো বেশী সার্থক

সারণী সংখ্যা—13

জেলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সরকারী সদস্যগণ

স্থায়ী সমিতি	সরকারী সদস্য	
	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি
1. অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি	1. কার্যনির্বাহক আধিকারিক	1. বি. ডি. ও
	2. ডি. পি. ও.	2. ই. ও. পি.
	3. এস. ও. পি. ডি.	3. ইনস্পেক্টর (প্রগতি ও মূল্যায়ন)
2. জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি	1. নির্বাহী বাস্তুকার বা সহকারী বাস্তুকার (পাবলিক হেলথ)	1. সহকারী বাস্তুকার (জনস্বাস্থ্য যন্ত্রবিজ্ঞান)
	2. চিফ মেডিকেল অফিসার	2. প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার এবং নিকটে তা' না থাকলে সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার
	3. জেলা স্বাস্থ্য অফিসার	3. নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত এক্সটেনশন এডুকেটর
3. পূর্ত কার্য স্থায়ী সমিতি	1. নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্ত বিভাগ	1. উপ-সহকারী বাস্তুকার, সমষ্টি উন্নয়ন
	2. নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্ত বিভাগ (রাস্তা)	2. উপ-সহকারী বাস্তুকার, রুরাল ওয়ার্কস

স্থায়ী সমিতি	সরকারী সদস্য	
	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি
	3. নির্বাহী বাস্তুকার, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং নিকটে তা' না থাকলে ঐ বিভাগের সহকারী বাস্তুকার	
4. কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	1. নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ	1. কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (এ. ই. ও.)
	2. মুখ্য কৃষি অফিসার এবং সেখানে তা' না থাকলে জেলা কৃষি অফিসার	2. উপ-সহকারী বাস্তুকার
	3. সমবায় সমিতিগুলির সহকারী পঞ্জীকার (Registrar)	3. সমবায় সমিতির পরিদর্শক
5. শিক্ষা স্থায়ী সমিতি	1. জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক (প্রাথমিক)	1. স্কুলসমূহের উপ-পরিদর্শক
	2. জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক	2. সমাজশিক্ষা আধিকারিক
	3. জেলা তথ্য আধিকারিক	3. মুখ্য সেবিকা
6. ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি	1. জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্প কেন্দ্র	1. শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক
	2. জেলা রিলিফ অফিসার	2. উপ-সহকারী বাস্তুকার (রিলিফ)

স্থায়ী সমিতি	সরকারী সদস্য	
	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি
	3. আদিবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত জেলার বিশেষ আধিকারিক	3. মুখ্য সেবিকা
7. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি	1. এ. ডি. এম (এল· আর)	1. বি. ডি. ও.
	2. জেলা সেটেলমেন্ট অফিসার	2. জে. এল. আর. ও.
	3. জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক	3. রেভেনিউ সংক্রান্ত 2 নম্বর বিশেষ আধিকারিক এবং নিকটে তা' না থাকলে সেটেলমেন্ট বিভাগের একজন কানুনগো
8. মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতি	1. জেলা মৎস্যচাষ আধিকারিক	1. মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক
	2. জেলা পশুপালন আধিকারিক	2. পশুপালন সহকারী চিকিৎসক
	3. পণ্যপালন সংক্রান্ত তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক	

উৎস : পঞ্চায়েত অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের তুলনায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অনেক বেশী শ্রেয়।

কর্মাধ্যক্ষ

প্রতিটি স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির কর্মাধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) এর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে তাঁদের নিজ নিজ অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হন।[11] রাজ্যসরকার দ্বারা নিযুক্ত কোন অফিসার বা বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় আইন সভার কোন সদস্য কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না।[12] ঐ কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে কেন্দ্র বা রাজ্য আইন সভার সদস্যগণ ভোটদান করতে পারেন কিন্তু সরকারী অফিসারগণের ভোটদানের কোন অধিকার নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদের কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে তিনি আর ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকতে পারেন না। তেমনই কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে তিনি আর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকতে পারেন না। সভাধিপতির নিকট লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে জেলা পরিষদের কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা অন্য কোন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে পদত্যাগ পত্র দিতে হবে তার সভাপতির নিকট।

জেলা পরিষদের সচিব পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সমিতির সচিব হিসাবে কাজ করেন।[13] আর স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক কেবলমাত্র পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সচিবের কাজ করে থাকেন। অন্যান্য স্থায়ী সমিতিগুলির সদস্যগণ সরকার মনোনীত অফিসারদের মধ্য থেকে একজনকে সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন।[14]

১৮৮৫ সালের আইন অনুযায়ী পুরানো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কমিটিগুলিতে কোন বাইরের লোক নেবার বিধান ছিল না। কমিটিগুলির সব সদস্যকেই বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হত। কিন্তু ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন বাইরের দুজন ব্যক্তিকে

ঐ স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করার বিধান ছিল।[15] কিন্তু ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে এজাতীয় কোন বিধান রাখা হয়নি। আমাদের মনে হয়, বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন করে ব্যক্তির প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবার ব্যবস্থা রাখলে ভালোই হতো। তাঁকে ভোটাধিকার না দিয়েও রাখা যেতে পারে। আর এ মনোনয়নের অধিকার থাকবে ঐ কমিটির।

কমিটির সদস্যদের সংখ্যার ওপর তার কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অনেকটা নির্ভর করে। পুরাতন আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিটি স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটিতে এগারো জন করে সদস্য থাকতেন। জেলা পরিষদের প্রতিটি স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির সদস্য সংখ্যা অবশ্য এগারো থেকে পনেরর মধ্যে ছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জেলা পরিষদে কমিটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা থেকে কিছুটা সরে এসেছিল বলা যায়। কেননা, বড় কমিটির পক্ষে প্রশাসনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা দশের মধ্যে সীমিত রাখা দরকার। তাই বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা অনধিক নয়জন করা হয়েছে।

১৮৮৫ সালের আইনে জেলা বোর্ডের কমিটিগুলির ভূমিকা নিতান্তই গৌণ ছিল। মাত্র তিনটি বিধিবদ্ধ কমিটি ছিল—অর্থ কমিটি, শিক্ষা কমিটি এবং জনস্বাস্থ্য কমিটি। আর এইসব কমিটির কাজের ক্ষেত্রও ছিল খুবই সীমিত। প্রসঙ্গত ডঃ এন. সি. রায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—"বাংলার জেলা বোর্ডের কমিটিগুলি ইংলণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিলের কমিটিগুলির মত প্রশাসন চালনায় একই রকম ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে না।"[16]

স্থায়ী কমিটিগুলির ক্ষমতা ও ভূমিকা

কিন্তু আগেকার জেলা বোর্ডের কমিটির তুলনায় ১৯৬৩ সালের আইনের দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের কমিটিগুলির এইসব প্রতিষ্ঠানে বেশ কার্যকরী ভূমিকা ছিল, এবং বর্তমান আইনে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলিকে ঐ একই ভূমিকা পালন করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কাউন্টি কাউন্সিল এবং নন্‌কাউন্টি বরোর কমিটির মত তাদের স্থান

গুরুত্বপূর্ণ এবং সমিতি ও পরিষদ প্রশাসনে যথেষ্ট কর্তৃত্বও তারা প্রয়োগ করতে পাবে। এইসব আইনের রচয়িতারা ইংলণ্ডের আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন যেখানে "কমিটিগুলি হয়ে ওঠে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত কর্ম-কেন্দ্র।"[17] বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে অবশ্য এইসব ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মপদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। নিয়মাবলীও রচিত হয়নি, তাই স্থায়ী সমিতিগুলি কেবল সেইসব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং সেইসব কাজ করবে যা ১৯৬৪ সালের জেলা পরিষদ নিয়মা-বলীতে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অথবা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছে। প্রতিটি স্থায়ী সমিতি জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্বপালন করে থাকে। তাছাড়া, স্থায়ী সমিতি জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির যেসব কাজ ও প্রকল্পের ভার নিয়েছে সেসব কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দায়ী থাকে। এই কমিটি নীতি নির্ধারণ করে এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য বা অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রস্তাব পাশ করে থাকে। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যায়বরাদ্দের হিসাব তৈরী করে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্যগণ প্রতি তিন মাসে একবার বৈঠকে বসবেন। আর পুরাতন বিধি অনুসারে স্থায়ী সমিতির (ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি) সদস্যগণ মাসে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবেন। কিন্তু যতবার সমিতি বা পরিষদগুলির বৈঠকে বসবার কথা তার থেকে বেশী ঘন ঘন তারা সভায় মিলিত হয় না। এ কারণে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছাড়া আর সব বিষয়ে স্থায়ী কমিটিগুলির কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের অধিকাংশ স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে (2 ও 3 সংখ্যক সারণী দ্রষ্টব্য) আর বৈঠকে কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির গড়ও খুব অল্প ছিল। এর কারণ হয়ত এই যে কমিটিগুলির কাজের পরিমাণ তেমন বেশী ছিল না যাতে ঘন ঘন বৈঠকের দরকার হয়। স্থায়ী কমিটিগুলির আর্থিক ক্ষমতার ওপর অবশ্য নিয়মাবলীতে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল এবং তা আজও বলবৎ আছে। রাজ্য সরকার আরোপিত আর্থিক সীমার মধ্যেই কমিটি-গুলিকে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় এবং কাজকর্ম দেখতে হয়। কোন

প্রকল্পের রূপায়ণের ব্যয়, প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতে হয়।

প্রতিটি স্থায়ী কমিটিকে তার পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নিকট প্রতিটি বৈঠকের কার্যবিবরণীর একটি কপি (নকল) এবং কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কাজ বা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। সমিতি বা পরিষদের আলোচ্য বিষয়সূচীর মধ্যে এই স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন পেশ একটি নিয়মিত বিষয় হিসাবে গৃহীত। স্থায়ী কমিটির কোন সিদ্ধান্তের বিধিগত বৈধতা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ পর্যালোচনা করে দেখতে পারে। কিন্তু জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি তাদের স্থায়ী কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে কিনা আইন এবং নিয়মাবলীতে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির আটটি স্থায়ী (ষ্ট্যাণ্ডিং) কমিটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হ'ল অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি। অর্থ কমিটির স্থানও অনেকটা ওপরে। অন্যান্য কমিটির তুলনায় অর্থ কমিটি কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। যেসব সাধারণ বিষয়ের ভার অর্থ কমিটির ওপর দেওয়া হয়েছে তাছাড়া তাদের নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলিও রয়েছে:

(a) জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির নূতন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা;

(b) জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারী নিয়োগ ও বদলির সুপারিশ করা;

(c) জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলের বাজেট এবং অতিরিক্ত বাজেট রচনা করা;

(d) জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন রচনা ও পেশ করা;

(e) গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট বিবেচনা করা;

(f) জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির আয় ও ব্যয়ের হিসেব রাখা;

(g) নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির জন্য অনুদান মঞ্জুর এবং তাদের প্রদেয় অর্থ সম্পর্কে সুপারিশ করা ;

(h) অভিকর, মাশুল ও উপশুল্ক (toll) বসানোর ব্যাপারে সুপারিশ করা ;

(i) সম্পত্তি, প্রকল্প এবং কর্মসূচীর হস্তান্তর সম্পর্কে সুপারিশ করা ; এবং

(j) আইনানুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুর সম্পর্কে সুপারিশ করা।[18]

অর্থ ও সংস্থা কমিটির পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির নিকট উপরে উল্লিখিত a, b, g, h, i এবং j বিষয়ে সুপারিশ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও এই কমিটিকে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির নিকট মাসিক আয়ব্যয়ের হিসাব, সাধারণ আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক হিসাব এবং স্থায়ী কমিটিগুলি অনুমোদিত প্রতিটি বিষয়ের ব্যয়সংক্রান্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। এভাবে অর্থসংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অর্থই অন্যান্য কমিটির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই অর্থসংক্রান্ত কমিটিই এইসব কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ ও সংস্থা কমিটি আর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। নিয়মানুযায়ী বছরে তিন মাস পরপর তাকে এই পরিষদগুলির হিসেব পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু কার্যতঃ এই কমিটি তিন মাস পরপর হিসেব পরীক্ষার কাজ করে না। আর যদিও বা করে তাহলেও সে কাজ কর্মাধ্যক্ষের (চেয়ারম্যানের) ওপর ছেড়ে দেয়। এটা অবশ্য নিয়মবহির্ভূত কাজ।

স্পষ্ট করে বলতে গেলে, হিসাব পরীক্ষার কাজ অর্থকমিটির সদস্যদের নিকট রুচিকর মনে হয় না। প্রসঙ্গত চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের অর্থকমিটির একজন সদস্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি একটি পঞ্চায়েত সমিতিরও সভাপতি। ইনি স্বীকারই করলেন, অধিকাংশ সদস্যের এ ধরনের কাজে দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। তাই তাঁরা এ ধরনের কাজ এড়িয়ে যেতে চান। অনেকে আবার দুরভিসন্ধিমূলক কাজও করেন এবং

সম্ভবত তাঁদের ধারণা হল, কাজই হল সমালোচনা করা। এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন, অর্থ ও সংস্থা সংক্রান্ত কমিটির হাত থেকে হিসাব পরীক্ষার কাজ তুলে নিয়ে একজন সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত বাজেট ও অ্যাকাউন্টস্ অফিসারের হাতে অর্পণ করা যেতে পারে। এই অফিসারের ওপর সন্তোষজনকভাবে অর্থ ও হিসাবরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে অডিটর-জেনারেলের অফিসের সাবরডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের একজন কর্মীকে ডেপুটেশনে একাজের জন্য নেওয়াও যেতে পারে। আর পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে একাজের দায়িত্ব এখন যেমন হচ্ছে, ব্লকের হিসাবরক্ষকের ওপর দেওয়া যেতে পারে।

স্থায়ী কমিটিগুলির কাজকর্ম অনেকটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অসংখ্য কমিটির অস্তিত্বের দরুণ তাদের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। কেননা প্রতিটি কমিটিই নিজের সম্মান ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। কখনো কখনো তারা আধা-স্বাধীন সংস্থা হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি এবং তার স্থায়ী সমিতি-গুলির ও জেলা স্তরের অফিসারদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৯৬৪ সালের জেলা পরিষদ নিয়মাবলীতে এই সমন্বয়সাধনের কয়েকটি সহজ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজ সেটাই অনুসরণ করবার চেষ্টা চলছে।

আগেই বলা হয়েছে, অর্থ ও সংস্থা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন কমিটির নীতির সমন্বয়সাধন করে। কারণ অন্যান্য কমিটির প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করবার জন্য অর্থই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু "আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয়ের নীতিটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর হতে পারে। যদিনা সকলেই এই মতবাদে বিশ্বাসী হয় যে কতটা ব্যয় বাঞ্ছনীয় হবে তার একটা সুনির্দিষ্ট উচ্চতর সীমা রয়েছে।"[17] সুতরাং প্রতিটি স্থায়ী কমিটিকে রাজ্য-সরকার আরোপিত আর্থিক সীমার মধ্যে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির হয়ে নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কাজ করতে হবে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। "কেন্দ্রীয় সরকারের মত স্থানীয় প্রশাসনেও অর্থের মাধ্যমেই কার্যকরী ভাবে সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের কাজ হতে পারে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট

নয়। সাধারণ সমস্যার মোকাবিলায় এটি একটি সীমিত প্রয়াস মাত্র। আরো ব্যাপক কিছু করা দরকার।"[20]

অবশ্য সম্ভাব্য সবরকম সমস্যার মোকাবিলার জন্য বর্তমান কমিটি ব্যবস্থার ভেতরই কিছু কিছু সংস্থান রাখা হয়েছে। যেমন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদাধিকার বলে সমস্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য। এই ব্যবস্থার দরুণ সমন্বয়ের সুবিধা হয়। কার্যনির্বাহী আধিকারিকের এই সমন্বয়সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁকে জেলা পরিষদ ও তার স্থায়ী কমিটিগুলির সব বৈঠকে যোগ দিতে হয়। পরিষদ ও তার কমিটিগুলির অনুমোদিত কর্মসূচী ও বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের সমস্ত ব্যাপারে জেলা পরিষদ বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি এবং জেলা স্তরের অফিসারদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যাপারে তিনিই দায়ী থাকেন। কিন্তু নিয়মাবলীতে যে শর্তটি সবচেয়ে বেশী কার্যকরী তা হলো এই যে জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কর্তব্য হলো উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে পরিষদ, স্থায়ী সমিতি এবং জেলা পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কার্যনির্বাহী আধিকারিককে জেলা পরিষদ এবং স্থায়ী কমিটিগুলির বৈঠকে যোগদান করতে হয়। তাই বিরোধ বা বিবাদের কোন ঘটনা ঘটলে তিনি তার প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। কিন্তু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা কমিটির মধ্যে মতবিরোধ দূর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। সুতরাং দলের বৈঠকের মাধ্যমে এই মতানৈক্য দূর করাই সবচেয়ে ভালো। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে একই ব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহীর আধিকারিক এবং এর স্থায়ী কমিটিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্থায়ী কমিটিগুলির কর্মদক্ষতা এবং কাজের দ্রুতগতির ওপরেই জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থা নির্ভর করে। কারণ জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে এই কমিটিগুলিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রশাসনের এই একাধিক কমিটি ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এই অসুবিধাগুলি দেখা দেয় অংশতঃ আনুষঙ্গিক অবস্থা থেকে, এবং অংশতঃ তা সাংগঠনিক কাঠামোরই সহজাত।[21] কোন

কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিতে কমিটির বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ফলে এই রূপায়ণের কাজে বিলম্ব ঘটে! তাছাড়া, কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলে কাজের সমন্বয় করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কেননা এই দায়-দায়িত্ব তো স্থায়ী কমিটিগুলি, কার্যনির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মধ্যে ভাগ করা রয়েছে। ফলে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিতে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির দুটি ভূমিকা রয়েছে, অংশতঃ সে পরিষদের উপদেষ্টা এবং মুখ্যতঃ সে পরিষদের নিয়োজিত প্রতিনিধি। উপদেষ্টা এবং সমালোচক হিসেবে স্থায়ী কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো কাজই করছে। কিন্তু কার্যনির্বাহক প্রতিনিধি হিসেবে তারা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন। যৌথভাবে দায়-দায়িত্বের দ্বারা আবদ্ধ একক কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে এই কমিটিগুলির এখানেই পার্থক্য। বর্তমান লেখক সমিতি এবং পরিষদের কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে তাঁদের অনেকে অভিমত দিয়েছেন, কমিটিগুলি তুলে দেওয়া হোক। তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের মত ক্যাবিনেট প্রথা চালু করা হোক। কলকাতা কর্পোরেশনে তো ক্যাবিনেট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য আইন রূপায়িত হতে চলেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের মত যেসব দেশে দুই দলীয় শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই এ ধরনের পরিচালন পর্ষদ্ উপযুক্ত। ভারতের মত বহুদলীয় ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রশাসন পর্ষদ বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে কখনোই চলবে না বলে ধারণা হয়।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাব, একটি মাত্র কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হোক। সেখানে মূল পরিষদের নেতা তার চেয়ারম্যান হবেন। তিনিই বর্তমান স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করবেন। এই সমন্বয় কমিটিতে থাকবেন পঞ্চায়েত সমিতির বা জেলা পরিষদের নেতা এবং সমস্ত স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ। জেলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থায়ী কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব দিয়ে এই সদস্যদের পুরো সময়ের কার্যনির্বাহক করতে হবে। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যাতে কমিটিগুলি নিজেরাই চূড়ান্ত

বিশ্লেষণে তাদের মূল সংস্থা অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নিকট দায়িত্বের কথা অনুভব করেন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে এই পর্যায়ে আলোচনা করে স্থির করেন। যদি তা' না হয়, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের এক বিপুল সংখ্যক সদস্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। ফলে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

REFERENCES

1. John Stuart Mill, Representative Government, Everyman's Library, 1910, London, P. 333.
2. K. C. Wheare, Government by Committee, 1955, Clarendon Press, Oxford, P. 172.
3. West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 29.
4. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 30(1).
5. West Bengal Panchayat (Gram Panchayat Administration) Rules, 1981, Rule 25,
6. Ibid, Sec. 30(2) ; and Ibid, Rule 26.
7. Main Recommendations and Conclusions, National Conference on Community Development, Mysore, 1959, P. 4.
8. West Bengal Panchayat Act, 1973, Secs, 124(2) & 171(2).
9. Ibid, Sec. 171(3).
10. Ibid. Sec. 124(3).
11. Ibid, Secs. 125(1) and 172(1).
12. Ibid, Secs. 124(2) (c) 1st Proviso & 171(2) (c) 1st Proviso.
13. Ibid, Sec. 172(3).
14. Ibid, Sec. 125(3) (a) (b).
15. West Bengal Zilla Parishads Act, 1963, Secs, 34(1) (iii) & 80(1) (iii).
16. Dr. N. C. Roy, Rural Self-Government in Bengal, 1936, University of Calcutta, P. 55.
17. H. Finer, English Local Government, London, 1950, P. 829.

18. The West Bengal Zilla Parishads Rules, 1964, Sec. 67(5).
19. Laski, Jennings and Robson, Ed., A Century of Municipal Progress, 1935, Allen & Unwin, London, P. 102.
20. K. C. Wheare, Government by Committee, 1955, Clarendon Press, Oxford, P. 199.
21. S. C. Jain, Community Development and Panchayati Raj in India, Allied Publishers, 1967, Calcutta, P. 215.

অষ্টম অধ্যায়

গ্রামীণ আরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

প্রাচীনকালে গ্রামবাসীরা গ্রামরক্ষা বাহিনী নিয়োগ করতেন এবং তাদের বেতন দিতেন। মোগল আমল পর্যন্ত জমিদাররা শুধু কর আদায়ই করতেন না, গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। ১৮১৭ সালের 20 সংখ্যক বিধানের 21 ধারায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যবস্থাকে আইনসিদ্ধ করে এবং ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। এর পর এই শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্ব জমিদারদের হাত থেকে নিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে দেওয়া হয়। ঐ বছর চৌকিদারী আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭০ সালে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শুরু করা হয়।[1] চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলা শাসক নিযুক্ত পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের চৌকিদারদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় কর নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য দায়ী থাকত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকেও গ্রামাঞ্চলে পাহারা ও চৌকি দেবার সমস্যার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। বাংলায় তখন গ্রামীণ চৌকিদারী ব্যবস্থা প্রায় বিলুপ্তির পথে যাচ্ছিল। অথচ অগ্রগতির জন্য চাই নিয়মশৃঙ্খলা। সরকারও একথা উপলব্ধি করেছিলেন। আর গ্রামাঞ্চলে এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চৌকিদারী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। সুতরাং নানা কমিটি ও কমিশন এই উদ্দেশ্যে গঠন করা হলো। গ্রামের চৌকিদার-দফাদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নিয়ে বাংলায় সব সময়েই প্রচণ্ড মতভেদ ছিল। এই মতভেদ থেকেই গ্রামের দফাদার ও চৌকিদারদের সঙ্গে একদিকে গ্রামবাসীদের এবং অন্যদিকে নিয়মিত আরক্ষা বাহিনীর সম্পর্ক কি হবে সে সম্পর্কে দুটি মত দেখা দিল। একটি তত্ত্ব হলো এই যে, যেহেতু গ্রামবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের, চৌকিদার পুলিশ বা আরক্ষা সংগঠনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত এবং রাজ্যসরকারের রাজস্ব থেকেই তাদের বেতন দেওয়া দরকার। অন্য মতটি হল, শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাপারটি একান্তই গ্রামের ব্যাপার;

চৌকিদাররা মূলত গ্রামেরই সেবক। সুতরাং যাঁদের স্বার্থে চৌকিদাররা কাজ করছে সেই গ্রামবাসীদেরই এই সংগঠনের ব্যয় মেটানো উচিত। তখনকার দিনে বেসরকারী ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীরা গ্রামের চৌকিদারদের ওপর স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

তাই ১৮৬৬ সালে মিঃ ম্যাকনিলকে চৌকিদারী ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি সুপারিশ করেন, চৌকিদারী ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিৎ এবং গ্রামের শৃঙ্খলা ও পাহারার ব্যবস্থা রাজা-সরকারের হাতেই রাখা উচিৎ। কিন্তু সরকার এই সুপারিশকে বৈপ্লবিক বলে মনে করলেন এবং সে কারণে এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেন।

১৮৬৯ সালে মিঃ রিভার থম্পসনের নেতৃত্বে আর একটি কমিটি এই বিষয়টি বিবেচনার ভার পেলেন। তারই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ করা হয়। এই আইনে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে চৌকিদাররা সরকারের প্রতিনিধির চেয়েও প্রধানত স্থানীয় এলাকার সেবক। গ্রামবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যই তাদের নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের নিয়মিতভাবে বেতনও গ্রামবাসীদেরই দিতে হবে। এই আইনে আরো বলা হয়, প্রতিটি গ্রামে একটি করে পঞ্চায়েত থাকবে এবং সেই পঞ্চায়েতই গ্রামের চৌকিদারদের নিযুক্ত করবে এবং ভরণপোষণ দেবে। পঞ্চায়েত তাদের কাজকর্ম তদারক করবে, তাদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করবে এবং সমস্ত অপরাধের ঘটনা পুলিশকে জানাবে।

এই আইনে চৌকিদারের প্রধান কাজ ১৮১৭ সালের বিংশতম বিধানে বর্ণিত কাজের মতই। এই কাজ হলো গ্রামের সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনা বা অপরাধ ঘটানোর অপচেষ্টার কথা পুলিশকে দ্রুত জানাতে হবে, গ্রামের অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদের গতিবিধি সম্পর্কে সন্ধান দিতে হবে এবং অপরাধী হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। চৌকিদারী কর আদায়ে পঞ্চায়েতকে সাহায্যও করতে হবে তাকে। গ্রামাঞ্চলে পাহারার কাজটা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেল। প্রথমদিকে চৌকিদারদের নিয়োগ, শাস্তি ও বরখাস্তের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে ছিল। কিন্তু পরের দিকের আইনে, চৌকিদারদের ওপরে সরকারী অর্থাৎ পুলিশ ও জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণই দৃঢ়তর হবার প্রবণতা দেখা দিল।

চৌকিদারী আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে দেখবার জন্য মিঃ মনরোর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হল। এই কমিটি দেখলেন, পঞ্চায়েতগুলি চৌকিদারী ব্যবস্থা ঠিকমত চালাতে পারছিল না। সুতরাং এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৮৭৯ সালের এক নম্বর আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে চৌকিদারদের নিয়োগ, শাস্তিদান ও পদচ্যুতির ক্ষমতা এবং তাদের সংখ্যা ও বেতন স্থির করবার দায়িত্ব জেলা শাসকের ওপর বর্তায়। জেলা শাসক বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে এই ক্ষমতা যে কোন মহকুমা শাসক বা জেলা আরক্ষা তত্ত্বাবধায়কের (district Superintendent of Police) হাতে প্রত্যভিযোজন (delegation) বা অর্পণ করতে পারেন। ১৯০২-০৩ সালের ভারতীয় পুলিশ কমিশন গ্রামীণ আরক্ষার এই বিভাগীয়-করণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার নিন্দা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে "চৌকিদার যে গ্রামবাসীদের সেবক—এই দিকটির ওপরেই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া দরকার"[2]। ১৯১৪ সালের বঙ্গীয় জেলা প্রশাসন কমিটি ১৯০২-০৩ সালের ভারতীয় পুলিশ কমিশনের এই অভিমতের সঙ্গে একমত হন এবং পঞ্চায়েতকে আরক্ষাবাহিনীর প্রভাব মুক্ত করবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন সরকারীভাবে জেলা শাসকের এবং পুলিশী কাজের দিক থেকে আরক্ষাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মূলত চৌকিদার যে গ্রামেরই সেবক তার এই বৈশিষ্ট্যটির ওপরেই তাঁরা গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ এভাবে গ্রামের চৌকিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে উভয়-বিরোধী মতবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা হল। এদিক থেকে বিবেচনা করে গ্রামীণ আরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন (১৯১৯ সালের অষ্টম আইন) পাশ করা হয়। এতে ১৮৭০ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সঙ্গে ১৮৮৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন কমিটির কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে গঠন করা হল ইউনিয়ন বোর্ড। কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারক করবার জন্য এই আইনে একজন সার্কেল অফিসারের পদ চালু করা হয়। এই পদটির পরিবর্তে এখন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পদ হয়েছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের অন্যান্য বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে একটি ছিল গ্রামের পাহারা ও চৌকির ব্যবস্থা করা।[3] ইউনিয়ন বোর্ড তদনুযায়ী চৌকিদার ও দফাদার[4] মনোনীত করত। চৌকিদার ও দফাদারদের বেতনও তারা দিত।

বেতনের অর্থ যোগাড় হত স্থানীয় কর থেকে। তবে তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা থাকতো জেলা শাসকের ওপর। এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ এখনও বিদ্যমান। দফাদার ও চৌকিদারদের ব্যাপারে ১৯৫৭ ও ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন দুটি এবং ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ১৯৫৭ ও ১৯৭৩ সালের আইন দুটি প্রধানত ১৯১৯ সালের আইনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। পার্থক্য শুধু একটাই। তাহলো রাজ্যসরকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের সঙ্গে আধাআধিভাবে দফাদার ও চৌকিদার পোষণের ব্যয় বহন করতেন এবং বর্তমানে ১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আধাআধিভাবে ব্যয় বহন করেন। আর ১৯১৯ সালের আইনে ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামের পাহারাদারদের পোষণের সমস্ত খরচ স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে বহন করতে হত।

গ্রামাঞ্চলে পাহারা ও চৌকি দেবার ব্যবস্থাপনার কাজ বাধ্যতামূলকভাবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের ওপর ছিল[5] এবং ১৯৭৩ সালের আইনে সে দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরে বর্তেছে। বর্তমান পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজ অধিকার-ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে চৌকিদার ও দফাদার পোষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তাদের কাছ থেকে যথাযথ কাজ আদায় করবার জন্য দায়ী রয়েছে।[6] ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের 23 সংখ্যক ধারার অনেকটা অনুবর্তন করে ১৯৫৭ ও ১৯৭৩ সালের আইনে চৌকিদারের কর্তব্য ও ক্ষমতার এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে।[7]

*চৌকিদারের ক্ষমতা ও কর্তব্য

চৌকিদারের প্রথম কর্তব্য হল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকার-ক্ষেত্রের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক ও আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে, কোন অপরাধ সংগঠিত হলে এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন হাঙ্গামা বা বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট জানানো।

চৌকিদার ও দফাদার কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই নিম্নোক্ত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে—

(a) কোন ব্যক্তি কোনো প্রগ্রাহ্য (cognizable) অপরাধে জড়িত থাকলে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত নালিশ করা হলে কিংবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য নালিশ পাওয়া গেলে কিংবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে এমন ব্যক্তিকে ;

(b) কোন ব্যক্তির দখলে বিধিসম্মত অজুহাত ছাড়া সিঁধ কাটার কোন যন্ত্র থাকলে সেই ব্যক্তিকে ;

(c) যে লোককে কোন আইনে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এমন লোককে ;

(d) কোনো লোকের কাছে এমন কোন জিনিস পাওয়া গেলে যা চোরাই-মাল হিসেবে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা চলে সেই লোককে কিংবা এরকম জিনিস চুরির ব্যাপারে কোন অপরাধ করেছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা চলে এমন লোককে ;

(e) কোন আরক্ষা আধিকারিককে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দিয়েছে এমন ব্যক্তি কিংবা বিধিসম্মত হেপাজত থেকে পলায়ন করেছে বা পলায়নের চেষ্টা করছে এমন লোককে ;

(f) ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী বিনানুমতিতে ছেড়ে এসেছে বা ছেড়ে এসেছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা চলে এমন ব্যক্তিকে ; এবং

(g) কোন কারামুক্ত কয়েদী ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির 565 ধারার (3) উপধারার বিধানে প্রণীত কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে সেই ব্যক্তিকে।

উল্লিখিত যেসব ক্ষমতা একজন চৌকিদারকে দেওয়া হয়েছে তা ছাড়াও কোন অপরাধ-অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে যে কোন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা চৌকিদার ও দফাদারদের রয়েছে। তাদের অন্যতম কর্তব্য হলো সমস্ত অসৎ প্রকৃতির লোকদের গতিবিধি ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের আগমন সম্পর্কে আরক্ষা আধিকারিকের (Police Officer) কাছে রিপোর্ট পাঠানো। এছাড়া জেলা শাসক বা থানা আধিকারিকের আবশ্যক-মত স্থানীয় এলাকার অন্য যে কোন তথ্যও দফাদার বা চৌকিদারকে সরবরাহ করতে হয়। বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক, কূপ এবং অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় পাহারা

দেবার ব্যাপারে তাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশ পালন করতে হবে। এছাড়া তাকে জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত মূল্যবান পরিসংখ্যানসংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিকর আদায়কারীকে সাহায্য করতে হয়, মহামারী দেখা দিলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সে সংবাদ জানাতে হয় এবং আইন ও নিয়মানুযায়ী সময়ে সময়ে তার ওপর আরোপিত অন্যান্য কর্তব্যও পালন করতে হয়।

তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়মিত পাহারা দেওয়া এবং সারারাত সেই এলাকায় উপস্থিত থাকাও চৌকিদারের কর্তব্য। চৌকিদার ও দফাদারদের পনের দিনে অন্তত একবার করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে হাজির হতে হয়। মাসে অন্তত একবার তাদের থানায় হাজিরাও দিতে হয় এবং তারা পুলিশকে তাদের কাজে সাহায্য করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চৌকিদার বা দফাদারকে আইনে বর্ণিত অসংখ্য কাজ করতে হয়,—কখনো পুলিশ হিসাবে, কখনো সাধারণ সরকারী চাকুরে হিসাবে, আবার কখনো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের সেবক হিসাবে। আইনে চৌকিদার বা দফাদারদের ওপর এমন সব কর্তব্যের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে যা সম্ভবত একজন সর্বসময়ের কর্মীর পক্ষেও করা অসম্ভব। গ্রামের পুলিশ হিসাবে তাকে দিবারাত্র খাটতে হয়। কিন্তু সে অনুযায়ী তার বেতন কম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিন তাকে মাসে মাত্র 27 টাকা 50 পয়সা হিসাবে বেতন দিয়ে আসছিলেন। কেবল অতি সম্প্রতি সরকার চৌকিদারের মাসিক বেতন 119 টাকা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার থেকে তাঁরা কিছু মহার্ঘ ভাতাও পেয়ে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েত তার তহবিল অনুযায়ী তার বেতন দেয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ঐ বেতন বাকী পড়ে থাকে। নিয়মিত বেতন খুব কমই দেওয়া হয়। হয়ত তাদের ছোট এক টুকরো জমি থাকে কিন্তু তা থেকে যা ফসল হয় তাতে সারা পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে আয় বাড়াবার জন্য দিনমজুরীর কাজ নিতে হয়। টাকা-পয়সার চিন্তায় তাকে সব সময়েই উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। ফলে তার সমস্ত উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন চৌকিদার এক রাত্রে একটি চোরকে ধরল। কিন্তু পরে পরিচয় নিয়ে দেখা গেল, ঐ চোর আসলে অন্য এলাকার চৌকিদার।

চৌকিদার বৃদ্ধবয়সে অবসর ভাতা পায় না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং গ্র্যাচুইটিও তার নেই। একটি স্বাধীন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে চৌকিদারের মত একজন জনসেবক কর্মী জীবনধারণোপযোগী বেতন না পেলে এবং তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে সে যে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে তা আশা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে এ ধারণা সবারই যে চৌকিদাররা যথোপযুক্ত বেতন পায় না এবং তাকে পুরো সময়ের কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা বাড়ছে। বস্তুতই চৌকিদার এবং দফাদাররা এখন সবদিক থেকেই পুরো সময়ের কর্মচারী। সুতরাং পুরো সময়ের জীবনধারণপোযোগী বেতনও তাদের প্রাপ্য। চৌকিদারদের কর্মদক্ষতা, বিচার-বুদ্ধি ও শারীরিক সহিষ্ণুতা বাড়াতে হলে তাদের বেতনও অনেক বাড়ানো দরকার।

পাহারা দেওয়া, অপরাধ নিবারণ করা, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং অন্যান্য অনুরূপ কাজের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই তার নিয়ন্ত্রণে কয়েকজন দফাদার ও চৌকিদার রাখতে হয়।[৪] সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের তহবিল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের বেতন দেয় এবং যথাযথভাবে তারা তাদের কর্তব্য-পালন করছে কিনা তা দেখে। কিন্তু এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। গ্রামের পাহারাদারকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়, কিন্তু তাদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকুরীর শর্তাদি এমন নয় যাতে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতেরই দফাদার বা চৌকিদার নিয়োগের ক্ষমতা নেই। সে কেবল পারে কোন ব্যক্তিকে চৌকিদার বা দফাদারের পদে মনোনীত করতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠকে এই মনোনয়ন স্থির করা হয় এবং পঞ্চায়েতসমূহের পরিদর্শকের মাধ্যমে এই মনোনয়ন জেলা শাসকের নিকট পেশ করা হয়। চৌকিদার বা দফাদার নিয়োগের প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে এই জেলা শাসকের হাতে।[৫] জেলা শাসক অবশ্য নিজে এই দায়িত্ব পালন করেন না। তিনি একজন আধিকারিকের হাতে এই ক্ষমতা প্রত্যাভিযোজন করেন। সাধারণত তিনি মহকুমা শাসকের হাতে এই কাজের ভার দেন। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৈরী মনোনয়ন পত্র মহকুমা শাসকের নিকট পাঠানো হয়। মহকুমা শাসক ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে মনোনীত ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজখবর করেন।

যথাযথ অনুসন্ধানের পর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং আরক্ষা আধিকারিক এরপর মহকুমা শাসকের নিকট তাদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে মহকুমা শাসক চৌকিদার বা দফাদার নিয়োগের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনয়ন পত্র বিচার করেন। ফলে কখনো কখনো তিনি এই রিপোর্ট অনুযায়ী মনোনয়ন অগ্রাহ্যও করেন। এমন অনেক নজীর পাওয়া গেছে যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনয়ন এইসব রিপোর্টের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে।

যে আধিকারী (authority) চৌকিদার বা দফাদারকে নিযুক্ত করেছে তাবৎ নিম্নপদস্থ কোন প্রাধিকারী তাকে বরখাস্ত বা পদচ্যুত করতে পারবেন না। যেহেতু চৌকিদার এবং দফাদার গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত নয় সেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের বরখাস্ত বা অপসারিত করতে পারে না। কোন মারাত্মক কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগে গ্রাম পঞ্চায়েত কোন পাহারাদারের অপসারণের জন্য সুপারিশ করে পঞ্চায়েতের অবেক্ষকের (supervisor) মাধ্যমে তা মহকুমা শাসকের কাছে পেশ করতে পারেন। কিন্তু এই পদচ্যুতির সুপারিশ কার্যকর হতে হলে মহকুমা শাসক কার্যত গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ে এ বিষয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অভিমতের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। তাছাড়া, কোন চৌকিদার বা দফাদারকে নিজের উদ্যোগ বা দায়িত্বেই অপসারণ করবার ক্ষমতা মহকুমা শাসককে দেওয়া আছে। সুতরাং গ্রামবাসীদের নিয়োগ বা অপসারণের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের একান্ত নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

অবশ্য স্বেচ্ছাকৃত কোন দুর্ব্যবহারের দায়ে কোন চৌকিদার বা দফাদারকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের রয়েছে। এই শাস্তির পরিমান হবে তার একমাসের বেতনের এক চতুর্থাংশের অনধিক জরিমানা। কিন্তু মহকুমা শাসক তাদের একমাসের বেতন পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেকটি চৌকিদারকে তার উপযুক্ত এলাকা ঠিক করে দেন এবং একাধিক দফাদার থাকলে কে কার অধীনে কাজ করবে তাও গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক করে দেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও কোন গ্রাম পঞ্চায়েতই তার ক্ষমতা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। মহকুমা শাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে পাহারাদারদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত

তার অফিসে পনের দিনে একবার করে চৌকিদার ও দফাদারদের সমবেত কুচকাওয়াজে যোগ দিতে বলতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও মহকুমা শাসকের সম্মতি দরকার।

চৌকিদারের বেতন, ভাতা প্রভৃতি স্থির করার ব্যাপারেও পঞ্চায়েতের কোন স্বাধীনতা নেই। জেলা শাসকের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন স্থির করতে হয়। দফাদার ও চৌকিদারদের সাজসরঞ্জামের বার্ষিক ব্যয় (পরিবহন ব্যয়সহ) স্থির করেন জেলা শাসক। কিন্তু এই ব্যয় বহন করেন গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত চৌকিদারের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এসব ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত তার মতামত জেলা শাসকের কাছে পেশ করতে পারেন, কিন্তু জেলা শাসক তা মানতে বাধ্য নন। এ ব্যাপারে তিনি পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের চেয়ে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকেই বেশী গুরুত্ব দেন।

গ্রামের আরক্ষাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেক সময়েই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও থানার মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে চৌকিদাররা মুশকিলে পড়ে। তাদের অবস্থা অনেকটা হয় সেই গৃহকর্তার মত, যার পরিবারে সারাক্ষণ শাশুরী-বউয়ে ঝগড়া। এ অবস্থার সুযোগে চৌকিদার ও দফাদাররা এমন কিছু কাজ করে যাতে পঞ্চায়েত ও থানার মধ্যে সম্পর্কটা আরো খারাপ হয়ে যায়। কোন কোন চৌকিদার উভয়কেই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে, কিন্তু কাউকেই শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট করতে পারে না। ফলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। আবার কিছু কিছু চৌকিদার থানা আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রধানের খারাপ ধারণার ইন্ধন যোগায়। কেউবা প্রধানের বিরুদ্ধে থানা আধিকারিককে প্ররোচিত করে। তারা পঞ্চায়েতের দেওয়া কাজে ফাঁকি দেয় এই ছুতোয় যে থানা কর্তৃপক্ষ তাদের অন্যভাবে ব্যস্ত রাখে। পক্ষান্তরে থানার কাজে ফাঁকি দেয় এই ছুতোয় যে প্রধানের কাজেই তাদের বেশী সময় দিতে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ অভিযোগ এই যে চৌকিদাররা নিয়মিতভাবে পাহারা দিতে বেরোয় না এবং গ্রামরক্ষার কাজে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্ষেত্রীয় তদন্তের সময় অনেক প্রধানই আমাদের জানিয়েছেন, চৌকিদার ও দফাদাররা গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুগত নয়। তারা বরং থানার অনুগত কর্মী। অর্থাৎ নিজেদের সামান্য তহবিল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো চৌকিদার-

দফাদারদের বেতনের বোঝা বয়, অথচ তাদের কাজকর্মের ওপর পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ নামমাত্রই রয়েছে। চৌকিদার ও দফাদারদের দিক থেকেও বলা যায়, তাদের অবস্থাও সুবিধার নয়। একই সঙ্গে দু'জন প্রভুর সেবা করা বাস্তবিকই কষ্টকর। সুতরাং এ অবস্থায় একমাত্র সমাধান হল, এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া।

এক বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে বাংলায় চৌকিদারী ব্যবস্থার পত্তন হয়। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল, দেশের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সুদৃঢ় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মধ্যে সড়ক ও অন্যান্য যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল। জেলা শাসকের অধীনে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে গ্রামাঞ্চলে চালু হল পঞ্চায়েত ও চৌকিদারী ব্যবস্থা। এটা গত শতকের সপ্তম দশকের কথা। কিন্তু ক্রমশ জনমতের চাপে সরকার এবং স্থানীয় জনসমষ্টির দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে আনা হল গ্রামের পাহারা ও চৌকি ব্যবস্থাকে। তবে আজকের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পটভূমিতে এ ধরনের ব্যবস্থা রাখা অনুচিত। কেননা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে গ্রামবাসীরাই তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই এ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। যদি সরকার তাতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ থাকেন তবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে এ দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়ে পুলিশের হাতেই চৌকিদার-দফাদারদের পুরো দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। "যখন কেউই জানে না কে দায়ী থাকবেন সেখানে দায়িত্ব জিনিষটারই অস্তিত্ব থাকে না।"[10] দায়িত্ব দু'ভাগ করার অর্থ তাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা দুর্বল করা। তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আমাদের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গে চৌকিদারদের ওপর এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যবস্থা আর চালু রাখার কোন যুক্তি নেই। ক্ষেত্রীয় সরেজমিন তদন্তের সময় সাক্ষাৎকারে কয়েকজন আরক্ষা আধিকারিক-সহ অধিকাংশ ব্যক্তিই এই মত পোষণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে এখন গ্রামসেবকদের সুদৃঢ় ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরক্ষ'-রহিনবী খবরাখবর সংগ্রহের ব্যবস্থাও গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র প্রসারিত।

সুতরাং চৌকিদারদের ওপর এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

অধিকাংশ কর্মচারীই এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণের বিরোধী নন। কিন্তু বেশ কিছু কর্মচারী এবং বেসরকারী ব্যক্তি চৌকিদারদের পঞ্চায়েত থেকে আলাদা করে তাদের পুরোপুরি পুলিশ বা আরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম শুধুমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমিত রাখার পক্ষপাতী। গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম হাতে নিতে হয়। নিজস্ব সূত্র থেকে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাৎসরিক গড় আয় তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা। এর মধ্যে বড় একটা অঙ্ক চৌকিদারদের বেতন বাবদ খরচ করা হয়। এজন্য অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষেই উন্নয়নমূলক কাজকর্মে বেশী টাকা যোগানো সম্ভব হয় না। অতএব গ্রামে চৌকিদার পোষণের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়-দায়িত্ব এখনি অবিলম্বে পঞ্চায়েতের কাছ থেকে নিয়ে রাজ্যসরকারের ওপর দিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ রাজ্যসরকারই শান্তি ও শৃঙ্খলার একমাত্র জিম্মাদার[11] এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্বের প্রাপকও রাজ্যসরকার। ধনী সহরবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটিকে নিজস্ব তহবিল থেকে কিছুই ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের আয়ের অনেকটা ব্যয় করতে হয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গ্রামীন আরক্ষাবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ। এটা সত্যিই আপাতবিরোধী বলে মনে হয়। দেশের আর কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার এরকম আরক্ষা বিভাগের কাজ করতে হয় না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই এই গ্রামীন চৌকিদারী ব্যবস্থা চালানোর সামগ্রিক দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

পূর্বোল্লিখিত কাজকর্ম ছাড়াও চৌকিদারকে গ্রামের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হয়। এইসব পরিসংখ্যানের ব্যাপারে স্থানীয় এলাকায় কোন উৎসুক্য না থাকলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তার মূল্য রয়েছে। সুতরাং রাজ্যসরকারেরই চৌকিদারদের পুরো আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করা উচিত। এই দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণের সবদিক বিবেচনা করে অনেকে এই অভিমত দিয়েছেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের জন্য আলাদা এক শ্রেণীর কর্মী থাকা দরকার। আর চৌকিদার ও দফাদারদের শুধু

একান্তভাবে আরক্ষা বিভাগের কাজেই নিয়োগ করা উচিত। এবং সেইসঙ্গে জেলা প্রশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজও তাদের দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য গ্রামের পাহারার কাজটা রাজ্য পুলিশের চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতই ভালো করতে পারে, কেননা গ্রামের চৌকিদাররা 'গ্রামেরই লোক যিনি গ্রামবাসীদের কাছে ভিনদেশী নন বা বিরক্তিকর নন, যাকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনা যায় এবং কর্তব্য বোধের দিক থেকে আস্থা রাখা যায়।'[12] তাছাড়া নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর লোকেরা তাদের সংখ্যা এবং সংগঠনের দিক্ থেকে স্থানীয় তথ্য আহরণে উপযুক্ত নয়। গ্রামবাসীরা কখনোই চৌকিদারকে অবিশ্বাস বা অপছন্দ করে না। বরং তাকে প্রয়োজনীয় লোক হিসাবেই দেখে, দেখে গ্রামের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অংশ হিসাবে। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি চৌকিদারী প্রথার ব্যয় বহন করছে। কিন্তু গ্রামীন আরক্ষাবাহিনীর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট ও একান্ত নয় একথা আগেই বলা হয়েছে। চৌকিদার ও দফাদাররা আসলে থানা ও জেলা প্রশাসনেরই প্রতিনিধি। সুতরাং গ্রামের চৌকিদারদের পোষণের পুরো আর্থিক দায়িত্ব রাজ্যসরকারের নিজের কাঁধেই নেওয়া সঙ্গত। কিন্তু বর্তমানে যা আর্থিক পরিস্থিতি তাতে রাজ্যসরকার এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন তা মনে হয় না। গ্রামের চৌকিদারী ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বছরে তিন কোটি টাকা খরচ হয়।

পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্যই হল গ্রামের জনসমষ্টি এবং তার মাধ্যমে সমস্ত জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন। যদি গ্রামাঞ্চলে ন্যায়বিচার বজায় না থাকে এবং অপরাধ নিবারণ না করা হয় তাহলে কোন উন্নয়নমূলক কাজই সফল হয়ে উঠবে না। সামান্য একটা মামলার ফলে বড় সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। সামান্য ব্যাপারে সুবিচার না পেলে গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে হতাশার মনোভাব দেখা দিতে পারে। সেইজন্যই ছোটোখাটো ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার পঞ্চায়েতের ওপর দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা দেওয়া দরকার। কেননা আইনশৃঙ্খলাই অগ্রগতির বনিয়াদস্বরূপ। গ্রামের চৌকিদার যদি চৌখস ও সুশিক্ষিত হয় তাহলে তারা পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক সীমানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য

করতে পারে এবং তার ফলে সমষ্টি উন্নয়নের এক প্রকৃত ভিত গড়ে তুলতে পারে।

অবশ্য গ্রামের চৌকিদারকে এজন্য দক্ষ এবং যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া চাই। কিন্তু ক্ষেত্রীয় তদন্তে দেখা গেছে, অধিকাংশ গ্রামীণ পাহারাদার অশিক্ষিত, দুঃস্থ, ক্লান্ত এবং বয়স্ক ব্যক্তি। "সাধারণত সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে তাদের নিয়োগ করা হয়।"[13] সুতরাং একুশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের শিক্ষিত, সুস্থ, সাহসী এবং সক্রিয় তরুণদের এ কাজে নিযুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এজন্য তাদের বেতন বাবদ সরকারী সাহায্য যথেষ্ট বাড়ানো দরকার যাতে এইসব তরুণরা একাজে আকৃষ্ট হয়। তারা যাতে নিয়মিত বেতন পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, চৌকিদার কথাটি এবং চৌকিদারী ইউনিফর্মের মধ্যে একটা কলঙ্ক চিহ্ন রয়ে গেছে। সুতরাং এই কলঙ্ক চিহ্ন মুছে না ফেললে কোন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন তরুণই গ্রামীণ আরক্ষাবাহিনীতে কাজ করতে চাইবে না। চৌকিদারের সম্মান যদি বাড়াতে হয় তাহলে তাদের পদ ও ইউনিফর্মের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ গ্রামীণ আরক্ষাবাহিনীর মান ও মর্যাদা বাড়াবার জন্য তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন হার এবং উচ্চতর যোগ্যতা ধার্য করতে হবে। তাদের পদের নতুন নামও দিতে হবে।

ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে বেশীর ভাগ চৌকিদাররা ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 53 ধারায় এবং ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 39 ধারায় বর্ণিত তাদের কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ। এ অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটতে পারে যদি চৌকিদার ও দফাদারদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের কোন প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। চাকুরীকালীন অবস্থায়ও তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে দায়-দায়িত্ব পালনে তাদের আরো ভালোভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে তাদের মধ্যে এমন এক মনস্তাত্বিক পটভূমি তৈরী করা যাবে যাতে গ্রামীণ আরক্ষা ছাড়াও সমগ্রভাবে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা একাত্মতা অনুভব করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়েক বছর আগে পঞ্চায়েতী রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে চৌকিদার ও দফাদারদের কয়েকদিনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় ব্লক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা যেতে পারে। চৌকিদার ও দফাদারদের চাকুরীর শর্তাদি এবং পদোন্নতির সুযোগ সুবিধা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে। গ্রামীণ আরক্ষাবাহিনী থেকে নিয়মিত আরক্ষাবাহিনীতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর পদে উন্নীত হবার সুযোগও তাদের দিতে হবে।

REFERENCES

1. Dr. N. C. Roy, Rural Sell-Government in Bengal, 1936, University of Calcutta, P. 131.
2. Report of the Indian Police Commission, 1902-03, Para 49.
3. Bengal Village Self-Government Act, 1919, Sec. 20.
4. ১৮৯৪ সাল থেকে দফাদার বা প্রধান চৌকিদারের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে তাদের চৌকিদারদের মতই ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তাদের প্রধান কাজই হল চৌকিদারদের কাজের তদারকি করা। তাছাড়া, তারা চৌকিদার ও থানার মধ্যে সংযোগসাধন করে থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৩,২৪২ জন দফাদার এবং ২১,০০০ জন চৌকিদার আছে।
5. West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 46(c).
6. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 37(1).
7. Ibid, Sec. 39 ; and West Bengal Panchayat Act, 1957, Sec. 53.
8. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 37(1).
9. West Bengal Panchayat Rules, 1958, Rule 92.
10. J. S. Mill, Representative Government, Everyman's Library, 1910, London, P. 332.
11. The Constitution of India, Seventh Schedule, List II—State List, Paras 1 and 2.
12. The Report of the Police Commission, 1960-61, Government of West Bengal, Para 178.
13. The Report of the Unarmed Branches of the Police Force, Bengal, 1937, Sec. 4.

নবম অধ্যায়

পঞ্চায়েতের বিত্ত এবং গ্রামোন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সংগঠন স্বশাসিত এবং আইনানুগ সংস্থা। স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পঞ্চায়েত চরিত্রগতভাবে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনে যাতে সক্ষম হয় তার জন্যে তাদের হাতে যথেষ্ট অর্থসম্পদ থাকা দরকার। এই অর্থ না থাকলে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন হল তাদের দায়-দায়িত্ব পালনের উপযোগী যথেষ্ট আয়ের সংস্থান করা। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিত্ত ও সম্পদ নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

(a) কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ বা অনুদান, উচ্চতর পর্যায়ের পঞ্চায়েত থেকে নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতগুলিকে বন্টিত সম্পদ ;

(b) নিজস্ব ক্ষমতাবলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক ধার্য কর, শুল্ক, অভিকর ও সেস থেকে আয় ;

(c) দান এবং চাঁদা হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে স্বেচ্ছামূলক দান ; এবং

(d) সম্পত্তি লগ্নী এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনাধীন লাভ জনক সংস্থাগুলি থেকে আয়।

গ্রামভিত্তিক স্থানীয় উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব এক্তিয়ার ভুক্ত। তাই স্থানীয় উন্নয়নকে সর্বতোভাবে সার্থক করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থাকা একান্তই প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের 45 নম্বর ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিলে যে যে টাকা জমা হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের সূত্র নিম্নরূপ :

(a) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেয় দান ও মঞ্জুরী ;

(b) কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের দেওয়া ঋণ ;

(c) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্য কর, অভিকর এবং ফি-বাবদ সমস্ত আদায় ;

(d) গ্রাম পঞ্চায়েত ন্যস্ত, তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে রক্ষিত যে কোন স্কুল, হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, দালান, প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানা থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থ ;

(e) দান বা অনুদান হিসাবে পাওয়া সমস্ত অর্থ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুকূলে কোন ট্রাস্ট বা এনডাউমেন্ট থেকে পাওয়া সমস্ত আয় ;

(f) এই আইন অনুসারে নির্ধারিত এবং আদায়ীকৃত সমস্ত জরিমানা ও অর্থদণ্ড ; এবং

(g) গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা বা পক্ষে পাওয়া অন্যান্য সমস্ত অর্থ।

১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোন আয়ের সূত্র ছিল না এবং তাকে কর বসাবারও কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যম পাওয়া অনুদানের ওপর তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত। তবে অঞ্চল পঞ্চায়েতকে তার বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছাধীন কর, অভিকর ও ফি বসাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনেও আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের অভিকর, উপ-শুল্ক ও মাশুল বসাবার ক্ষমতা ছিল। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে কিন্তু পঞ্চায়েতী সংস্থানগুলির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোন মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে না। নূতন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে কেবল কর বসাবার ক্ষমতার কিছু কিছু রদবদল করা হয়েছে। কর বসাবার ক্ষেত্রও কিছু বাড়ানো হয়েছে। আর কয়েকটি ক্ষেত্রে করের হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ঐ ধারাগুলি অনুসারে নূতন নিয়মাবলী এখনও তৈরী করা হয়নি ; ঐ আইনের 219 (g) ধারায় বলা হয়েছে যে ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি অনুসারে প্রচারিত সমস্ত নিয়মাবলী, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, বাই-ল ইত্যাদি বলবৎ থাকবে যদি সেইগুলি ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের পরিপন্থী না হয় এবং ততদিনই বলবৎ থাকবে যতদিন না ঐ পুরাতন নিয়মাবলী, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, বাই-ল ইত্যাদি বাতিল করা হচ্ছে বা

সংশোধন করা হচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কর, অভিকর বা মাশুল ইত্যাদি ধার্য বা আদায় সম্বন্ধে ১৯৭৩ সালের আইনের ধারা অনুসারে নূতন নিয়মাবলী এখনও তৈরী করা হয়নি। কাজেই ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালের আইন দুটির ধারাগুলি অনুসারে রচিত ১৯৫৮ ও ১৯৬৪ সালের নিয়মাবলী দ্বারাই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কর, অভিকর মাশুল ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করা হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে ১৯৭৩ সালের আইনের সঙ্গে ১৯৫৮ ও ১৯৬৪ সালের নিয়মাবলীর কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ থাকলে, ১৯৭৩ সালের আইনের ধারাই প্রযোজ্য হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস

নিজস্ব তহবিল গঠন ও তার পুষ্টিসাধনের জন্য বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নানারকম কর, অভিকর বা মাশুল ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল: (a) জমি ও বাড়ীর ওপর কর; (b) বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা বা চাকুরীর থেকে আয়ের ওপর কর;[1] (c) এলাকার মধ্যে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি; (d) অতিরিক্ত প্রমোদকর;[2] (e) যানবাহন রেজেষ্ট্রীকরণের ওপর মাশুল; (f) নালিশ, আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতে রুজুকরা মামলা-মোকর্দমা বাবদ ফি; (g) দেবস্থান, তীর্থস্থান, প্রদর্শনী ও মেলায় জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা করবার জন্য মাশুল; (h) আলো, জল ও আবর্জনা অপসারণ বাবদ অভিকর।[3] তাছাড়া, এলাকার মধ্যে ঘরবাড়ী নির্মাণ করবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অনধিক পঁচিশ টাকা ফি ধার্য করতে পারে।[4]

গ্রাম পঞ্চায়েত যেসব কর বসাতে পারে তা দুই শ্রেণীর—বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছাধীন। আইনানুগ বাধ্যতামূলক করগুলির মধ্যে আছে জমি ও বাড়ীর ওপর কর, বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা ও চাকুরীর ওপর কর, জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অতিরিক্ত প্রমোদ কর। অন্যান্য কর বা ফী স্বেচ্ছামূলক। পূর্বতন অঞ্চল পঞ্চায়েত বাধ্যতামূলকভাবে কর ধার্য করতে পারতো কেবলমাত্র সম্পত্তির মালিকের ওপর এবং বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। যাইহোক, গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের সূত্রগুলির অধিকাংশই কিন্তু অস্থিতি স্থাপক। ঐচ্ছিক কর বা মাশুল ধার্য করবার ব্যাপারে

স্থানীয় প্রাধিকারীর কিছুটা অনীহাও লক্ষ্য করা যায়। তাই পঞ্চায়েতী রাজের বিত্ত সংক্রান্ত শান্তানম কমিটি মনে করেন, "প্রতিটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব সূত্র থেকে সামান্য আয় সুনিশ্চিত করার জন্য অন্তত কয়েকটি বাধ্যতামূলক কর ধার্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত যে স্বায়ত্তশাসিত একটা সংস্থা এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেবার জন্যও এটা দরকার। এ উদ্দেশ্যে ইমারত কর, বৃত্তিকর ও যানবাহন কর ধার্য করাই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হবে।"[5] পঞ্চায়েতকে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো এবং স্থানীয় এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সেবা বা কৃত্যকের সন্তোষজনক মান বজায় রাখবার জন্যই এই বাধ্যতামূলক করারোপ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। শান্তানম কমিটি পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক যে তিনটি কর সুপারিশ করেছেন সে তিনটি কর নির্ধারণ ব্যবস্থা ১৯৫৭ এবং ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে রয়েছে এবং তার মধ্যে দুটি কর বসানো পঞ্চায়েতের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

জমি ও বাড়ীর ওপর কর গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান ও নিজস্ব উৎস। ১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে যেসব কর, অভিকর ও মাশুল ধার্য করা হয় তার প্রায় 80 শতাংশই ছিল জমি ও বাড়ীর ওপর। বাড়ী বা জমির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে এই কর ধরা হয়। জমিজমা গৃহাদির বার্ষিক মূল্য বলতে বোঝায় জমিজমা গৃহাদির বাজার দরের ছয় শতাংশের সমপরিমান টাকা। তবে যেসব জমিজমার মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশী নয় অথবা জনকল্যাণ, ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তার ওপর কর ধার্য করা যায় না। এছাড়া রাজ্যসরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অন্য কোন ধরনের সম্পত্তি পঞ্চায়েত কর থেকে রেহাই দিতে পারেন।[6]

ঐ করের হার শতকরা দুইভাগ। অনেকে মনে করেন এ হার আনুপাতিক হলেই ভালো হত। তাছাড়া, কর নির্ধারণ ব্যাপারটি সাধারণত খেয়াল খুশীমত হয়ে থাকে। কেননা জমি বা বাড়ীর বার্ষিক আয়সহ সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে নির্ধারীকে (assessee) কোন বিবৃতি বা হিসাব দিতে বাধ্য করা যায় না। এছাড়াও সম্পত্তির মূল্য কম ধরে কম কর বসানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং চাষাবাদ ছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে আয়ের ওপরও কর কম করে ধরা হয়। জমি ও বাড়ীর কর নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন

না থাকায় অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্বাচনে ইচ্ছামত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে জমি ও বাড়ীর ওপর থেকে কর সংগ্রহ হয়ে থাকে কম।

সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের নির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না থাকলে সম্পত্তি থেকে আয় বেশী বাড়ানো সম্ভব হতে পারে না। মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারটি একটি বিজ্ঞানসম্মত কাজ। সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানেই মূল্য নির্ধারণের জন্য দক্ষ মূল্য নির্ধারক (valuer) নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে পঞ্চায়েতের পক্ষে এ ধরনের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্ধ্রপ্রদেশের মত এরাজ্যেও গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সুদক্ষ স্বতন্ত্র মূল্য নির্ধারক সংস্থা নিয়োগ করা অত্যন্ত দরকার। বর্তমানে যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পঞ্চায়েত সমিতিকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমি ও বিভিন্ন ধরনের বাড়ীর মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতি এই মূল্য স্থির করার ব্যাপারে ঐ এলাকার সাব-রেজিস্ট্রার, জুনিয়র ল্যাণ্ড রিফর্ম অফিসার এবং উপ-সহকারী বাস্তুকারের পরামর্শ নিতে পারে। কর ধার্য করার ব্যাপারে এই মূল্যায়ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর বাধ্যবাধক করা দরকার।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর হচ্ছে পেশা, ব্যবসা, জীবিকা ও চাকরীর ওপর। গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকার মধ্যে যেসব ব্যক্তি কোন পেশা, ব্যবসা, জীবিকা চালান বা চাকরী করেন তাঁদের প্রত্যেককে বছরে মোট আয়ের ভিত্তিতে কর দিতে হয়। ভারতের সংবিধান অনুসরণ করে পঞ্চায়েত আইনে এই করের সর্বোচ্চ সীমা ধার্য হয়েছে দু'শত পঞ্চাশ টাকা। এ কর বসাবার ক্ষমতা পূর্বতন অঞ্চল পঞ্চায়েতের ছিল কিন্তু বর্তমান আইনে সর্বপ্রথম করের সর্বোচ্চ হার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বৃত্তি, জীবিকা প্রভৃতি থেকে আয়ের ওপর ন্যূনতম করের হার কত হবে তা এই আইনে উল্লেখ করা হয়নি। সেটা করা আছে ১৯৫৮ সালের পঞ্চায়েত নিয়মাবলীতে। ঘর, বাড়ী, জমাজমি থেকে যে আয় হবে তার উপর কর ধার্য করার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ সম্পর্কে কোন বাধা আইনে নেই। রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে সেটা করতে পারেন। কিন্তু পেশা, ব্যবসা, জীবিকার থেকে যে আয় হয়, ভারতের সংবিধান অনুসারে দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশী সে আয়ের ওপর কর ধার্য করা চলবে না।[7] কাজেই আইনের 46(1) ধারায় যে দুটি করের উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সীমাহীন, অপরটি সীমাবদ্ধ। তাই অনেকে মনে

করেন যে বৃত্তি করে সীমা বাড়িয়ে 500 টাকা করা দরকার এবং এই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের আয়কর রেকর্ড দেখবার অধিকার দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অফিস, কোম্পানী ইত্যাদি চাকুরিয়াদের কাছ থেকে বৃত্তিকর আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থার কথা পঞ্চায়েত আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে যে সরকারী অফিস, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, কোম্পানীর, ফার্মের বা অন্য কোন সংঘের চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির পঞ্চায়েত আইন অনুসারে দেয় কর সেইসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিসার তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তিকে দেয় টাকা থেকে নির্ধারিত পন্থায় কেটে রাখবেন এবং উক্ত প্রধান আধিকারিক সেই অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পৌছে দেবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়নি বা ১৯৫৮ সালের নিয়মাবলীতেও কিছু উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি রাজ্যসরকার বৃত্তি কর ধার্য করেছেন এবং কলকাতা করপোরেশন বৃত্তি কর ধার্য করবার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই অনেকে মনে করেন যে বৃত্তি, জীবিকা প্রভৃতি করের হার বৃদ্ধি করে ঐ কর ধার্য করবার ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতেই রাখা হোক এবং সংগ্রহের ব্যয় বাবদ কিছু রেখে বাকী টাকা রাজ্যসরকার কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালটি ও পঞ্চায়েতের মধ্যে তা ভাগ করে দেবেন।

এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ের ওপর—স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ও প্রমোদানুষ্ঠান—গ্রাম পঞ্চায়েত বাধ্যতামূলক ভাবে কর বসাতে পারে। করের হারও আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এলাকায় অবস্থিত সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি হিসাবে বিক্রয় মূল্যের ওপর, দানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্যের ওপর, বন্ধকের ক্ষেত্রে ঋণের টাকার ওপর, বিনিময়ের ক্ষেত্রে সম্পত্তির দামের ওপর, ইজারার ক্ষেত্রে দলিলে উল্লিখিত ভাড়ার প্রথম দশ বৎসরের মূল্যের ওপর শতকরা দুই টাকা হারে গ্রাম পঞ্চায়েত শুল্ক ধার্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন প্রমোদানুষ্ঠানে প্রবেশ মূল্যের শতকরা দশভাগ হারে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি আকারে গ্রাম পঞ্চায়েতের শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা আছে। বাস্তবিকই গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য এই দুটি বিষয়ের ওপর কর বসালে সাধারণ

মানুষের কোন ক্ষতি হয় না ; কেবল যাঁরা সম্পত্তি কেনেন বা প্রমোদানুষ্ঠানে যান তাঁরাই এই কর দেন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর বাবদ কর এবং প্রমোদকর আদায়, সেই আদায়ীকৃত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদান এবং এই কর সংগ্রহ বাবদ রাজ্যসরকারের ব্যয় কেটে রাখা সংক্রান্ত বিষয় সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বিধিনিয়ম রচনা করবার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। তবে দুঃখের বিষয় এখনও কোন বিধিনিয়ম রচিত হয়নি। তাছাড়া, ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ও প্রমোদকরের ওপর অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি আকারে শুল্ক ধার্য করার ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণে ১৯৫৮ সালের নিয়মাবলীতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। যতদিন না এ সম্বন্ধে বিধিনিয়ম রচনা করা হচ্ছে ততদিন উপরোক্ত অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি বসানো গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে যানবাহন রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একটি অসঙ্গতি রয়েছে। পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছে, যদি যানবাহন চালিত কোন আইনে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইতিমধ্যে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়ে থাকে তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ যানবাহন রেজেষ্ট্রী করবেন না বা এজন্য কোন মাশুল ধার্য করবেন না। অন্যভাবে বলা যায়, ভাড়াগাড়ী আইন অনুযায়ী কোন পৌর প্রতিষ্ঠানে রেজেষ্ট্রীকৃত কোন গাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা পুনরায় রেজেষ্টারী করা যায় না। অপরদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত যানবাহন রেজেষ্টারী করে ফী আদায় করলে কোন পৌর কর্তৃপক্ষ আর ফী আদায় করতে পারবে না আইনে কোথাও এমন উল্লেখ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে যানবাহনের মালিককে দুই জায়গায় রেজিষ্ট্রেশন ফী দিতে হয়। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে রেজিষ্ট্রীকৃত কোন যানবাহন যদি কোন পৌর এলাকায় সপ্তাহে দু'দিন প্রবেশ করে তাহলে তাদের ঐ পৌর কর্তৃপক্ষকে মাশুল দিতে হয়। তাছাড়া, প্রচলিত নিয়মাবলীতে যানবাহন রেজিষ্ট্রেশনের সর্বোচ্চ হারের কথা বলা হয়েছে, নিম্নতর হার দেওয়া হয়নি। পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতে নিম্নতর হার ধার্য হলে যানবাহনের মালিকেরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রেজিষ্ট্রেশন করার সুযোগ নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই অসঙ্গতি দূর করা দরকার এবং পৌরসভা ও তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একই ধরনের নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি চালু করা দরকার। বর্তমানে সাইকেল

ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর আদায় করা হচ্ছে। সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে যদি সাইকেলের ওপর কর বসানোর ব্যবস্থা হয় তবে হয়তো গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় সামান্য বৃদ্ধি পাবে। জীবজন্তুর ওপরও কর ধার্য করা সম্ভব। কিন্তু সেটা সমীচীন হবে কিনা একটু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

পঞ্চায়েত আইনে মামলা-মোকদ্দমা বাবদ মাশুল আদায় করবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে। কিন্তু এখনো ন্যায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া, কোন তীর্থস্থান বা মেলায় জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা, এলাকায় পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ এবং আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করলে গ্রাম পঞ্চায়েত মাশুল ও অভিকর ধার্য করতে পারে। কিন্তু এই পৌর ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করবার মত আর্থিক ক্ষমতা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত-গুলির একেবারেই নেই বললে চলে। ফলে এই বিষয়গুলি থেকে কর বাবদ আয়ের সুযোগ একেবারেই কম।

তাছাড়া কম সংখ্যক জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য দেবার ক্ষমতা রাখে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে দান ও জনসাধারণের চাঁদা খুব কমই পাওয়া যায়।

সরকারী অনুদান

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে এবং তাদের অধিকতর সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করবার জন্য রাজ্যসরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কর, অভিকর ও ফি বাবদ আদায়ের সমপরিমাণ অর্থ ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকার ১৯৭৯ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সিদ্ধান্তের একটু পরিবর্তন করে বলা হয়েছে, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত কর, অভিকর হিসাবে প্রতিবছর যে টাকা আদায় করবে রাজ্যসরকার তার সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিসাবে পঞ্চায়েতকে দেবেন। এইজন্যও কর, অভিকর বা মাশুল ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করার ব্যবস্থাকে জোরদার করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, কর সংগ্রহের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে দিলে পঞ্চায়েতগুলি কর সংগ্রহ করতে আরো উৎসাহ পাবে। শিল্প-বাণিজ্য

এলাকার অনেক পঞ্চায়েত সাতাশ-আঠাশ হাজার টাকা কর হিসাবে সংগ্রহ করেছেন এমন নজীর আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের গড়-কর-অভিকর হিসাবে সংগ্রহের পরিমাণ আগের মত বলা যেতে পারে। চার হাজার টাকার কিছু ওপরে। এটা অবশ্য নবগঠিত পঞ্চায়েতের প্রথম বছরের হিসাব।

তাছাড়া, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্য সরকার থেকে বছরে থোকা 1300 টাকা হারে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এককালীন অনুদান এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিসঘর তৈরীর জন্য সর্বোচ্চ 14,000 টাকা এককালীন অনুদান পেয়ে থাকে। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারের কাছ থেকে সচিব ও জব অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের বেতন ও ভাতা বাবদ প্রয়োজনী অনুদান এবং

সারণী সংখ্যা—14

কোন কোন খাতে সরকারী অনুদান গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি (3242) পেয়েছে	পরিমাণ (লক্ষ টাকার)	
	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
1. সচিব/সহকারী বেতন বাবদ	148·49	151·63
2. চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন বাবদ	282 00	284·08
3. উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 1,300 টাকা করে এককালীন অনুদান	42·49	42·41
4. কর্মসহায়কদের বেতন বাবদ	10·00	111·66
5. সদস্যদের রাহাখরচ ও দৈনিক ভাতা	34·00	34·00
6. প্রধান ও উপ-প্রধানগণের সম্মানী ভাতা	68·00	68·02
7. ম্যাচিং গ্র্যাণ্ট	20·00	100 00
মোট	605·00	791·80

চৌকিদার-দফাদারের বেতন-ভাতা বাবদ মাথা পিছু মাসে 119 টাকা করে অর্থ সাহায্য পায়। এছাড়া, সর্বোচ্চ দুইজন কর আদায়কারীর জন্য মাথা পিছু মাসিক 20 টাকা করে দিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও রাজ্য সরকার প্রধান ও উপ-প্রধানের মাসিক 100 টাকা ও 75 টাকা হারে সম্মান-

দক্ষিণা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রতিমাসে একটি অধিবেশনে যোগদানের জন্য রাহাখরচ বাবদ মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে বহন করে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ সালে যে অনুদান-গুলি পেয়েছে তার একটা তালিকা (সারণী সংখ্যা-14) দেওয়া হল।

এছাড়া, ১৯৮০ সাল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার এলাকাধীন সমস্ত খাস কিংবা সরকারে ন্যস্ত পুকুর, ডোবা ও দিঘী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আয়ের এই উৎস অত্যন্ত সীমিত, কেননা অধিকাংশ জলাশয়ের মালিক জেলা পরিষদ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক বনিয়াদ মজবুত করবার জন্য সরকার যে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ব্যবস্থা হচ্ছে, সরকারী বিভাগ থেকে ন্যস্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ব্যয়ের দায়ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বহন করে থাকে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয়

ব্যায়ের দিক থেকে বলা যায়, গ্রাম পঞ্চায়েতকে একজন সচিব রাখতে হয়। এই সচিবের বেতনের সবটাই সরকার সাহায্য হিসেবে দেন। কিন্তু সচিবের ভাতা বাবদ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রতি মাসে 15 থেকে 30 টাকা নিজের তহবিল থেকে দিতে হয়।

তাছাড়া, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার নিজ এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় পাহারা দেওয়া, অপরাধ নিবারণ করা এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কিছু দফাদার ও চৌকিদার পোষণ করতে হয়। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে দশ জন দফাদার ও চৌকিদার নিযুক্ত। তাদের প্রত্যেকের বেতন বাবদ মাসে 119 টাকা করে রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান দেন। তাছাড়া, নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক চৌকিদার দফাদারকে প্রতিমাসে 30/35 টাকা করে দিয়ে থাকেন। ফলে গ্রামীণ পুলিশী ব্যবস্থা রক্ষার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিমাসে প্রায় 275 টাকা খরচ করতে হয়।

এইসব প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসভাড়া, চৌকিদারের সাজ-সরঞ্জাম ও ষ্টেশনারী মালপত্র ক্রয়, মুদ্রণ ব্যয় প্রভৃতি বাবদ আনুসঙ্গিক

খরচ-খরচা করতে হয়। কয়েকটি বড় গ্রাম পঞ্চায়েত আবার নিজস্ব তহবিল থেকে একজন অতিরিক্ত সচিব রাখেন। এইসব প্রতিষ্ঠানিক ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের শতকরা 75 ভাগই খরচ হয়ে যায়। ফলে এলাকার মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে খরচের জন্য কেবল 25 শতাংশ আয় পড়ে থাকে। ২৪-পরগণা ও নদীয়া জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব নিরীক্ষার প্রতিবেদন (সারণী সংখ্যা-17) থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক কাঠামোর চিত্র না পাওয়া গেলেও তা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল

প্রত্যেক সমিতির নিজ নামে একটা তহবিল আছে। আইন অনুসারে তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হয়ে থাকে :

(a) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের এবং জেলা পরিষদ বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া কোন অনুদান (contribution) ও মঞ্জুরী (gifts) ;

(b) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার প্রদত্ত কোন ঋণ বা পঞ্চায়েত সমিতি সংগৃহীত কোন ঋণ ;

(c) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহিত উপশুল্ক, অভিকর বা মাশুল ;

(d) পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত কিংবা তার দ্বারা নির্মিত কিংবা তার নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীন কোন স্কুল বা হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, দালান, প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য পূর্তকর্ম থেকে সমস্ত আদায় ;

(e) দান বা অনুদান হিসাবে পাওয়া সমস্ত অর্থ এবং পঞ্চায়েত সমিতির নামে কৃত কোন অছি বা দান-সম্পত্তি থেকে সমস্ত আয় ;

(f) এই আইন অনুসারে আরোপিত ও সংগৃহীত অর্থদণ্ড ও জরিমানা ; এবং

(g) পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বা তার দ্বারা সংগৃহিত অন্যান্য সমস্ত অর্থ।[৪]

নিজস্ব তহবিল গঠনের জন্য প্রত্যেক সমিতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর ধার্য ও সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু অর্থ সংগ্রহের জন্য ঐ কর ধার্য করা সমিতির পক্ষে

বাধ্যতামূলক নয়। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুসরণ করে ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে যেসব ক্ষেত্র থেকে পঞ্চায়েত সমিতি উপশুল্ক (tolls), অভিকর (rates) ও মাশুল (fees) ধার্য করতে পারে তার একটা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কেননা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের হাতে অনুরূপ উপশুল্ক, অভিকর ও মাশুল ধার্য করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নিজের তৈরী বা প্রতিষ্ঠিত এবং তার পরিচালনাধীন কাঁচা রাস্তা ছাড়া অন্যান্য রাস্তা অথবা সেতু—যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি কুংঘাটা (toll-bar) স্থাপন করেছে—সেখানে মানুষ, যানবাহন বা পশুর ওপর এবং পঞ্চায়েত সমিতি প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালনাধীন কোন খেয়ার ওপর পঞ্চায়েত সমিতি উপ-শুল্ক ধার্য করতে পারে।[9]

এছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত মাশুল (fees) ও অভিকর (rate) ধায করতে পারে :

(a) যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি ;

(b) পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় দেবস্থান, তীর্থস্থান বা জেলা প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করবার জন্য মাশুল ;

(c) ক্ষতিজনক (offensive) ও বিপজ্জনক (dangerous) ব্যবসা করবার লাইসেন্স ফি ;

(d) হাটবাজারের জন্য লাইসেন্স ফি ; এবং

(e) পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় জল ও আলো সরবরাহের ব্যবস্থা করবার জন্য অভিকর।[10]

এখানে উল্লেখযোগ্য, রাজ্যসরকার সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতিগুলির গ্রহণের জন্য কর শুল্কসংক্রান্ত কয়েকটি আদর্শ উপ-বিধি রচনা করে পাঠিয়েছেন।[11] কিন্তু কোন সমিতি সেগুলি এখনো গ্রহণ করেন নি। এগুলি গ্রহণ করে কার্যকরী করলে আশা করা যায় সমিতিগুলি নিজেদের স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে অনেকটা অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন।

যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সরকারী অনুদান ও সাহায্য ছাড়া অন্য কোন আয়ের সূত্র নেই বললেই চলে। বাস্তবিকই সমিতিগুলিকে তাদের আয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং জেলা পরিষদের অনুদান ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু জেলা পরিষদ নিজে সচ্ছল হলে

তবেই অনেকটা অর্থ নিজে সাহায্য করতে পারে। সাধারণত পরিষদ কোন সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি অনুসরণ না করেই সরকার থেকে পাওয়া অনুদান এক্তিয়ারভুক্ত সমিতিগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এই পদ্ধতিতে কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতিগুলি তাদের প্রাপ্য এধরনের অনুদানের অংশ বা পরিমাণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকতে পারে না।

সরকার পঞ্চায়েত সমিতির অধিকতর সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে চান। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি খাস ও ন্যস্ত হাট, বাজার ও ফেরীঘাট তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। এগুলি থেকে যুক্তিসংগতভাবে টোল বা খাজনা আদায় করে পঞ্চায়েত সমিতি ঐসব হাট-বাজারের উন্নতি এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করতে পারেন। তাছাড়া, সঠিকভাবে পরিচালিত হলে ঐসব ফেরীঘাট থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ভালরকম আয় পেতে পারেন কারণ এর পরিচালন ব্যয় খুবই কম। ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে খুবই সহায়ক হবে। এছাড়া, প্রতি বছর আদায়কৃত ভূমি-রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান হিসাবে প্রদানের কথা রাজ্যসরকার বিবেচনা করছেন।

সরকারী অনুদান

পঞ্চায়েত সমিতিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় অনুদান দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। পঞ্চায়েতী রাজ অর্থসংক্রান্ত সমীক্ষক দল অবশ্য প্রস্তাব করেছেন, ব্লক পর্যায়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে মাথাপিছু এক টাকা করে বার্ষিক গড় অনুদান দেওয়া দরকার। এ টাকা কর্মচারী পোষণের জন্য চিহ্নিত রাখা হবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমভাবে এই অনুদানের দায়িত্ব বহন করবেন।[11a] কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সুতরাং রাজ্যসরকার থেকে পাওয়া অনুদানই পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে রয়ে গেছে। এই অনুদান তিন ধরনের—সাধারণ অনুদান ও সাহায্য, রাজ্যসরকারের বিভিন্ন বিভাগের অনুমোদিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ এবং ব্লকের বাজেটের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি অনন্তভাবে যে যে সরকারী অনুদান পাচ্ছে তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমি-রাজস্বের অংশ রাজ্য-

সরকার পঞ্চায়েত সমিতিকে দিয়ে থাকেন। তাছাড়া. সমিতিগুলি রাজ্য-সরকারের কাছ থেকে সমিতির কারণিক, পিওন এবং এ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসারের বেতন ও ভাতা বাবদে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। এছাড়া, রাজ্যসরকার সভাপতি ও সহকারী সভাপতির সন্মান-দক্ষিণা, সমিতির সদস্যদের রাহা খরচ, এবং সমিতির প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ (contingencies) অনুদান দিয়ে থাকেন। তাছাড়া, রাজ্যসরকার প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিকে বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা আনুপাতিক হারে আয় বর্দ্ধক অনুদান দিয়ে থাকেন। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ সালে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি রাজ্যসরকারের কাছ থেকে যে অনুদান পেয়েছে তার একটা তালিকা (15 নং) নীচে দেওয়া হল :

সারণী সংখ্যা—15

কোন কোন খাতে সরকারী অনুদান সমিতিগুলি (324)	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) 1979-80	1980-81
1. বৃদ্ধি অনুদান	2·91	30·00
2. কর্মীদের বেতন বাবদ অনুদান	30·50	31·00
3. সদস্যদের রাহা খরচ ও দৈনিক ভাতা	60·91	73·00
4. সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদের সন্মানী ভাতা	9·72	9 00
5. অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসারদের পরিচালনার জন্য অনুদান	...	...
মোট	104·04	143·42

উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য অর্থের অপ্রতুলতা এবং মাশুল, উপশুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের অসুবিধা আজ পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সবচেয়ে বড়

সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, এই সমস্যাগুলির সমাধান অনেকটাই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে। স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দ্যেশে সম্পদ সংগ্রহের জন্য তাদের ক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট নয় বলা যেতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতি তার আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠবার জন্য রাজ্যসরকারের অনুদান ও সাহায্য পেয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্র বা রাজ্যসরকার থেকে অথবা নিজ সম্পত্তি জামিন রেখে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য একটি প্রতিস্থচক তহবিল (Sinking fund) গঠন করতে হয়। তাছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্যসরকারের পূর্বে অনুমত্যানুসারে ব্যাঙ্ক বা অপর কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি রচিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ঋণ নিতে পারে।[12] খুব দুঃখের বিষয় যে কোন সমিতি আইনের এ ধারা কাজে লাগান নি।

পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য আমাদের মনে হয় অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকালে দলিলপত্রের ষ্ট্যাম্প করের ওপর অতিরিক্ত কর বসানো যেতে পারে। এতে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল যাঁরা সম্পত্তি কেনেন তাঁরাই এই কর দেন। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই সমিতির এলাকা থেকে সংগৃহীত উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর, আয় কর, কৃষি আয় কর প্রভৃতি সরকারী বাজেটের কিছু অংশ দাবী করতে পারে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ দর্শনের মূলেই রয়েছে আস্থা এবং সম্ভবত গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ জাগানোর উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতগুলিকে রাজস্বের বাড়তি ভাগ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার তাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি।

জেলা পরিষদের তহবিল

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মত প্রত্যেক জেলা পরিষদের জন্য ঐ পরিষদের নামে একটি জেলা পরিষদ তহবিল আছে। ঐ তহবিলে নিম্নোক্ত অর্থ জমা থাকে।

(a) রাজ্যসরকার সংগৃহীত ভূমি-রাজস্বের নির্ধারিত অংশসহ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দেওয়া কোন অনুদান বা মঞ্জুরী ;

(b) কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া কোন অনুদান ও মঞ্জুরী ;

(c) কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার প্রদত্ত কোন ঋণ বা নিজস্ব সম্পত্তির জামিনে জেলা পরিষদ সংগৃহীত ঋণ ;

(d) জেলায় আরোপিত সড়ক সেস থেকে আয় ;

(e) জেলা পরিষদের ধার্য উপশুল্ক (টোল), অভিকর এবং ফি থেকে সমস্ত আদায় ;

(f) জেলা পরিষদে ন্যস্ত, তাঁরা দ্বারা নির্মিত অথবা তাঁর নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনাধীন কোন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, দালান, প্রতিষ্ঠান বা পূর্তকর্ম থেকে সমস্ত আদায় ;

(g) দান বা অনুদান হিসাবে পাওয়া সমস্ত অর্থ এবং জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত কোন বিধি (ট্রাষ্ট) বা দান-সম্পত্তি (এনডাওমেণ্ট) থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থ ;

(h) এই আইনের বিধানুযায়ী বা উপ-বিধি অনুযায়ী আরোপিত এবং আদায়ীকৃত সমস্ত রকম জরিমানা ও অর্থ দণ্ড ;

(i) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে 25 ধারা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা চৌকিদারী পুরস্কার তহবিলে কোন অর্থ জমা থাকলে, তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা পরিষদ তহবিলে জমা দেবেন এবং

(j) জেলা পরিষদের দ্বারা বা তাঁর পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সমস্ত অর্থ।[13]

আয়ের উৎস

১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের পঞ্চায়েত সমিতির মতই নিজস্ব আয়ের উৎস রয়েছে। আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে একই এলাকায় পরিষদ উপশুল্ক, মাশুল ও অভিকর আদায় করতে পারে। জেলা পরিষদে ন্যস্ত কিংবা তার পরিচালনাধীন টোল ঘাঁটিতে মানুষ, যানবাহন বা পশু এবং খেয়াঘাটের উপর উপশুল্ক (toll) ধার্য করতে পারেন। এছাড়া, নৌকা বা যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, ধর্মস্থান বা তীর্থস্থান, মেলা ও উৎসব স্থানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের

জন্য পরিষদ মাশুল ও অভিকর ধার্য করতে পারেন। মেলা বা উৎসবের স্থানের মালিক বা ইজারাদারের উপরও পরিষদ লাইসেন্স ফি ধার্য করতে পারেন। এছাড়া, জেলা পরিষদ তার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় পানীয় জল, সেচের জল বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে সে বাবদ জলকর (water rate) এবং জলপথ ও সার্বজনীন স্থানে আলোর ব্যবস্থা করলে তার জন্য বাতি কর (lighting rate) ধার্য করতে পারেন।[14]

তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ও রাজ সরকারের কাছ থেকে জেলা পরিষদ ঋণও পেতে পারে এবং রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সম্পত্তি জামিন রেখে ঋণ সংগ্রহও করতে পারেন। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি ও জন কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্যব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রত্যেক জেলা পরিষদের আছে।[15]

সরকারী অনুদান

পরিষদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান ও সাহায্য পেয়ে থাকে। বলা যেতে পারে সরকারী অনুদানই পরিষদ গুলি আয়ের প্রধান উৎস। এই অনুদান সাধারণত দুই প্রকারের—সাধারণ অনুদান ও সাহায্য এবং বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিভাগীয় বরাদ্দ। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ সালে পরিষদ গুলি রাজ্য সরকার থেকে যে যে অনুদান পেয়েছে তার একটা তালিকা (সারণী সংখ্যা-১৬) নীচে দেওয়া হল।

পুরানো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মতই জেলা পরিষদগুলিও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে চিকিৎসালয় চালনার জন্য অনুদান, বৃদ্ধি অনুদান (augmentation grant), কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ও সাময়িক বেতন বৃদ্ধি বাবদ অনুদান, সদস্যদের রাহাখরচ ও দৈনিক ভাতা, কর্মকর্তাদের সম্মানী ভাতা বাবদ অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জনস্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা পরিচালনায় জন্য জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই বৃদ্ধি অনুদান পেয়ে থাকে। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এই অনুদানের ২৫ শতাংশ প্রতিটি জেলা পরিষদ নিজের প্রাপ্য অংশ হিসাবে রাখে এবং বাকী ৭৫ শতাংশ টাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে ভাগ করে দেয়।

সারণী সংখ্যা—16

কোন কোন খাতে সরকারী অনুদান পরিষদগুলি পেয়েছে	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	
	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
(1) বৃদ্ধি অনুদান	0·67	100
(2) কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাবদ অনুদান	36·00	48·00
(3) Contributory Village Road Scheme রূপায়ণ বাবদ অনুদান	30·10	6 00
(4) কর্মচারীদের সাময়িক বেতন বৃদ্ধির বাবদ অনুদান	1·50	1·50
(5) সদস্যদের রাহা খরচ বাবদ অনুদান	3·11	4·00
(6) সভাধিপতি ও সহকারী সভাপতি সম্মানী ভাতা	0·63	0·63
(7) হিসাব নিরীক্ষক বাবদ অনুদান	—	—
(8) ভূমি রাজস্ব থেকে অনুদান	27·70	20000
(9) সেস থেকে অনুদান	100·00	100.00
মোট	200·01	181·13

সরকার জেলাগুলি থেকে পাওয়া ভূমিরাজস্বের (land revenue) শতকরা 5 ভাগও জেলা পরিষদগুলিকে অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এটাকা অত্যন্ত অপ্রতুল। ভূমিরাজস্বের শতকরা 25 ভাগ অর্থ যদি জেলা পরিষদ-গুলিকে হস্তান্তর করা যায় তাহলে তাদের রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে বছরে প্রায় দু' কোটি টাকা।

এছাড়া, রাজ্যসরকার জেলা পরিষদগুলিকে পূর্ত ও সড়ক উপকর (cess) বাবদ আদায়কৃত সমস্ত অর্থও দিয়ে থাকেন। আদায় খরচ হিসাবে কোন বিভাজন সরকার এখন করেন না। সড়ক উপকর থেকে পাওয়া অর্থ জেলা পরিষদগুলির আয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ১৮৮০ সালের সেস্ আইন অনুযায়ী রাজ্যসরকার এই সেস্ আদায় করে থাকেন। এই আইনে এই

উপকর ধার্যকরণের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং এই সীমার মধ্যেই জেলা পরিষদকে করের হার কিরকম হবে তা প্রতিবছর জানাতে হয়। এই সেসের উর্ধসীমা বর্তমানে খুবই কম। বার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী টাকায় ছয় পয়সা মাত্র। তা' সত্ত্বেও দেখা যায়, অধিকাংশ জেলা পরিষদ এর অর্ধেক হারে এই সেস ধার্য করেছে। সরকার বর্তমানে পূর্ত উপকরের যে হার ধার্য করেছেন তাও আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারের তুলনায় অনেক কম। যাই হোক, এক্ষেত্র থেকেও পরিষদের আয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে।

এসব বিষয় ছাড়া জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আরও যে সমস্ত প্রস্তাব আছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস্ বাবদ (কয়লা বাদে) সংগৃহীত অর্থ পরিষদকে দেওয়া।

গণ নির্বাচিত সংস্থাগুলি স্থাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো নগদ জিনিষ-পত্রে স্বেচ্ছামূলক দানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের স্বতোৎসারিত বা স্বতপ্রবৃত্ত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। ১৯৬৫-৬৬ সালে সাতটি জেলায় কোন স্থানীয় সাহায্য পাওয়া যায়নি। বাকী আটটি জেলায় কেবলমাত্র পল্লী জল সরবরাহ প্রকল্পেই স্থানীয় জনসাধারণের অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। বীরভূম ও জলপাইগুড়ি জেলায় কয়েকটি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের জন্য সামান্য কিছু টাকা স্থানীয় সাহায্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। যদি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের প্রকল্পভিত্তিক বাজেট গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে হস্তান্তর করা হত তবে জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ বাড়তো। অবশ্য এটা ঠিক, গ্রামীণ জল সরবরাহের মত কয়েকটি প্রকল্প ছাড়া রাজ্যসরকার অন্যান্য বৃহৎ সংখ্যক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় অর্থ সাহায্য আদায়ের জন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেননি।

রাজ্যসরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থই যে জেলা পরিষদগুলির আয়ের প্রধান উৎস তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতই জেলা পরিষদ-গুলিকে যাতে বাইরের সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করতে হয় তার জন্য তাদের নিজেদের আয়ের সূত্র বের করা দরকার। নতুন কোন উন্নয়ন কাজই কেবল নয়, সড়ক ও চিকিৎসালয়ের মত বর্তমান সুযোগ সুবিধাদি বজায় রাখা সম্ভব হবেনা যদিনা জেলা পরিষদ আয়ের নিজস্ব সূত্র গড়ে তোলে।

সারণী সংখ্যা—17

Income and Expenditure of Deypara Gram Panchayat (Krishnanagar I Block, Nadia District) for the year 1978-79.

Income :	From 1.4.78 to 18.9.79 (Rs.)	From 19.9.79 to 31. 3. 80 (Rs.)
1. Opening belance	3732·63	16·69
2. Grants and contributions of Panchayat Department for—		
(a) Pay and allowences of Secretary	1795·00	2307·00
(b) Chowkidars and Dafaders	2380·00	3110·00
3. Tax, rates realised	164·25	3112·00
4. Grants received from Samiti/ Parishad		
(a) RWP		25000·00
(b) FFW		5000·00
(c) RRP (Assets)		27777·00
(d) RRP (HD)		116694·68
5. Incentive Grant		800·00
6. Stationary Grant		200·00
7. Pounds		70·00
8. Interest	12·35	
9. Miscellaneous	83·00	197·25
Total Income	8149·23	184884·62

Expenditure :

1.	General Administration—	Pay...2065·00	2557·00
	(a) Pay and allowances of Secretary	20·00	555·91
	(b) For Chowkidars and Dafadars	4305·00	4795·00
	(c) Commission of Tax Collector	100·00	
2.	Pay, allowances and dress of Chowkidars and Dafadars		
3.	RWP		9970·82
4.	FFW		4949·50
5.	RRP (Assets)		6142·50
6.	RRP (HD)		56400·00
7.	Repairing of wells	1500·00	
8.	Repairing of Tubewells	15·00	1206·50
9.	Contingency Miscellaneous		586·58
10.	TA of Members		
11.	Refund of Security		
	Total	8132·54	87163·81

সারণী সংখ্যা—18

Income and Expenditure of Kultali Panchayat Samiti
(24 Parganas) for the year 1878-79.

Income :

1.	Opening balance Rs.	10,450·07
2.	Receipt from the Panchayat Dept.	
	(a) Grants—L. R.	10,640·00
	(b) TA/DA of Samiti Members	8,244·00

3.	(a) Allotment received from other Depts of Government for RRP	74,993·00
	(b) Allotment received from Zilla Parishad for Augmentation	780·04
4.	Receipts on accounts of rates and fees levied by the Panchayat Samiti	Nil
5.	Gifts, contributions, endowments	Nil
	Total	Rs. 1,05,107.07

Expenditure :

1.	Salary and allowances of personnel	Rs. 8,831·20
2.	T.A./D.A. of Members including Sabhapati and Sahakari Sabhapati	566·25
3.	Allotment to Gram Panchayats for Dev. works.RRS	34,784·00
4.	Total expenditure	44,182·05
5.	Closing balance	60,925·02
6.	For specific schemes :	
	(a) RRP	40,209·00
	(b) SDB	5,452·40
	(c) Fishery	992·60
	(d) TA & DA	8,244·00
	(e) LR Grant	1,314·47
	(f) Augmentation	4,680·00

সারণী সংখ্যা—19

Income and expenditure of Bhagwanpur-I Panchayat Samiti (Midnapur District) for the period from 21.12.78 to 31.3.79.

Income :

Opening Balance	Rs.	3,40,310·91
(a) Specific scheme as per statement :		
1. Furniture		84·34
2. TA/DA Members		96·94
3. Misc. Agril		71·49
4. Dev. of Tank fisheries		560·75
5. TCPC		9·75
6. Wages of Paymaster		504·00
7. Contingency one Teacher Pathsala		49·00
8. SEP		9·00
9. RPP Paikveri		21,006·96
10. Village Sanitation		861·63
11. OAP		2,057·55
12. LR Grant (Pay & allowance staff)		Nil
13. H. B. Grant		1,15,000·00
14. R.R.A.P.		2,00,000·00
United Fund	Rs.	3,40,311·41

(b) Receipt from Pan. Dept.—

(i) Grants : LR Grant	2,375·00
TA/DA Members/Contingency	1,000·00

(c)	Allotment received from other Dept. of Govt. for speeific scheme—	
	Old Age Pension	7,790·25
	Rural Housing Programme	10,000·00
(d)	Receipts on account of tolls, rates & fees	Nil
Total income including—opening Balance		Rs. 4,42,986·16

Expenditure :

(a)	Establishment (Pay staff)	Rs. 3,055·60
(b)	Allotment to Gram Panchayat	Nil
(c)	Expenditure for Dev. work :	
	O.A.P.	1,494·95
	SEP	Nil
	Rur. Emp. Programme	Nil
(d)	Other expenditure including refund if any :	
	R.P.P. Paikveri	20,300·00
	H.B.	1,96,510·00
	RRAP	2,00,000·00
(e)	Total expenditure :	4,21,961·85
(f)	Closing balance	21,024·31
(g)	For specific scheme :	
	1. Furniture	84·34
	2. PA/DA Members	96·94
	8. Misc. Agril	71·49
	4. Dev. of Tank Fishery	560·75
	5. T.C.P.C.	9·75
	6. Wages of paymaster	504·00
	7. Contingency one teacher pathsala	49.00

8.	SEP	9·00
9.	R.P.P. (Paikveri) 24947.95 Less remittance 20000.00	4,947·95
10.	Village Sanitation	861·63
11.	OAP	8,277·85
12.	Rural Housing Programme	10.000·00
13.	Contingency/TA/DA/DA Members	558·20
14.	LR Grant (Pay & Allow. of staff)	Nil
	Total	Rs. 26,105·90

সারণী সংখ্যা—20

Income and Expenditure of Burdwan Zilla Parishad for the year 1978-1979

Income :

(a)	Opening Balance as on 1.4.78	Rs. 21,08,264·03
	1. Specific Scheme	14,74,821·90
	2. United Fund	6,33,442·13
(b)	Grants & Contributions by Govt.	
	1. Land Revenue	2,54,000·00
	2. Augmentation	10,742·00
	3. Sub. for DA and pay	4,43,116·00
(c)	Grants for specific schemes :	
	R.P.P.	1,59,700·00
	JMDS	72,000·00
	FDR	74,00,000·00
	Construction of Free Primary Schools	40,00,000·00
	Construction of Panchayat Samiti Office Buildings	4,00,000·00

	Construction of huts for homeless/ landless labourers	10,05,150·00
(d)	Proceed of Road cess	17,00,0C0·00
(e)	Receipt from Tolls Rates	38,524·00
(f)	Receipt from units of Z P.	2,89,697·42
(g)	All other receipts under 40(1)	18,01,603·37
(h)	Total receipt during the year (excluding opn. balance)	1,81,90,580·15
(i)	Total income during the year (including opening balance)	2,02,98,844·18

Expenditure :

(a)	Establishment :	
	1. Salary	11,76,215·50
	2. TA of Personnel	5,834·19
	3. TA of Members	Nil
	4. Office charge	1,15,375·35
(b)	Allotment to P. Samiti ; F.D.R. Grants, Construction of huts, Construction of Primary Schools	35,16,884·66
(c)	To undertake scheme under 18(1)(i)	17,21,140·91
(d)	To execute scheme under 18(1) (i) (ii) :	
	1. CVR	1,03,231·37
	2. RPP	56,226·45
	3. SEP	1,20,027·05
	4. JMDS	31,038·00
(e)	To manage pub. utility service & inst.	66,645·91
(f)	To make grant to pub. insts.	11,070·80

(g)	For maintenance of insts. outside the dist.	14,000·00
(h)	To establish scholarship & award	2,970·00
(i)	Any other expenditure under 44 (a) (b) (c)	75,973·53
		Rs. 70,16,633·72

Deposits :

1.	Loans repayment	
2.	C.V.R. & SEP Refund	
3.	Advance	15,97,884·98
4.	Investment	
5.	Compulsory deposit	

Total	Rs. 86,14,518·70
Closing balance at the end of the year	Rs. 1,16,14,325·48

সমীক্ষা

বিভিন্ন পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের মত নিম্নতম পর্যায়ের সংস্থাগুলির আয়ের উৎস যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মত ঋণ সংগ্রহ করবার ক্ষমতা এদের দেওয়া হয়নি। যে সব কর আদায়ের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অল্প কয়েকটিই শুধু লাভজনক এবং স্থিতি-স্থাপক। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির এই সামান্য কয়েকটি উৎসকেও তারা যথাযথভাবে কাজে লাগায় না। প্রধানত তারা সরকারী সাহায্যের ওপরেই নির্ভরশীল। সরকারের ওপর এই নির্ভরতা জনগণের প্রতিষ্ঠানের মূল নষ্ট করে দিচ্ছে যাতে শেষ পর্যন্ত এগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনায় ক্রটিই স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থের অভাবের অন্যতম বড় কারণ। ফলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। বৃহৎ প্রশাসনিক কর্মপ্রয়াস চালাতে গেলে বড় উপাদান হল সুষ্ঠু বিত্ত ব্যবস্থা। বাজেট বা আয়ব্যয় হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনার প্রধান

উপায়। ধারণাগত দিক থেকে বাজেট দুই শ্রেণীর—বিত্তগত দিক এবং রূপায়ণ কর্মের দিক। পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বাজেটের রূপায়ণ কর্মের চেয়ে বিত্তগত দিকটির ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই নিয়মাবলীতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বস্তরে বাজেট সংক্রান্ত কাজকর্মের উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি দিন পঞ্জী স্থির করা হয়েছে। প্রতি বছর বাজেটের অবর্তন শুরু হয় জুলাই মাসে এবং মার্চ মাসের শেষ নাগাদ শেষ হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশ মত বাজেট রচনা করেন। বর্তমানে বাজেট রচনায় জব অ্যাসিস্টেন্ট সহায়তা করে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠকে এটি অনুমোদিত হলে তা আবার পঞ্চায়েত সমিতির নিকট পেশ করতে হয়। পঞ্চায়েত সমিতি বাজেটটি অনুমোদন করতে পারে কিংবা তার নির্দেশমত বাজেটটি সংশোধন করার জন্য তা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরতও দিতে পারে। এই সংশোধনের পর আবার তা পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। বৎসরের শেষদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতি তা অনুমোদন না করলেও অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। তবে পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণতঃ নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে অনুমোদন জানিয়ে থাকেন। প্রয়োজন বোধে নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী পরিপূরক বাজেট (Suppli-mentary Budget) প্রস্তুত করে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন নিতে হয়। স্মরণ রাখা দরকার, বাজেট অনুমোদন ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে ব্যয় করা আইন-সিদ্ধ নয়। আইনের এই অনুশাসন মানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহকে বর্তমানে একটি পরিপূরক বাজেট প্রস্তুত ও যথারীতি অনুমোদন করে কাজ শুরু করতে হয়।[16]

কোন পঞ্চায়েত সমিতির আওতাভুক্ত সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট পুরো পঞ্চায়েত সমিতির একটি বৈঠকে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করা যাবে এটা আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। তাই এ দায়িত্ব অর্থ স্থায়ী সমিতির। সাধারণত বি. ডি. ও. তাঁর মতামতসহ এই বাজেটগুলি ঐ সমিতির সভায় পেশ করেন এবং সমিতি যথা নিয়মে সেগুলি অনুমোদন করেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বি. ডি. ও. গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটগুলি পরীক্ষা করে দেখবার সময় পান না

এবং এগুলি পরীক্ষার ভার পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিকের ওপর দেন। আমাদের মনে হয়, ঐ বাজেটগুলি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার দায়িত্ব অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির পালন করা দরকার।

অনেক সময় প্রশ্ন তোলা হয় যে, একটি নির্বাচিত সংস্থার সিদ্ধান্ত অন্য একজনের রায়ের ওপর সমর্পণ করা অন্যায়, প্রতিটি নির্বাচিত সংস্থাই নিজস্ব ক্ষেত্রে স্ব-শাসিত হওয়া উচিত, বাজেট পরীক্ষার জন্য একজন বিশেষজ্ঞই কেবল থাকা দরকার, এবং এই নীতি গ্রহণ করলে বাজেট স্থির করবার কাজ সহজ ও দ্রুত হবে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের মত নির্বাচিত একটি সংস্থার বাজেট তার থেকে উচ্চতর কোন নির্বাচিত সংস্থার দ্বারা পরীক্ষিত বা বিবেচিত হওয়া উচিত—এই নীতিই যথোচিত বলে মনে হয়। বিশেষত এই কারণে যে, পঞ্চায়েত সমিতিতে তাদের নিম্নতর স্তরের পঞ্চায়েত সংস্থার প্রধানরাও রয়েছেন। অর্থসংক্রান্ত বিষয় এবং কর ধার্যকরণের সম্ভাবনা নিয়ে নিঃসন্দেহে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন রয়েছেন। কিন্তু অযথা বিলম্ব পরিহারের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখতে হবে যাতে পদ্ধতিগত পরীক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগ ও স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয়। যদি উচ্চতর পর্য্যায়ের পঞ্চায়েতগুলি নিম্নতর পর্যায়ের পঞ্চায়েতের বাজেট যথেচ্ছভাবে হস্তক্ষেপ করে তবে তামিলনাড়ুর মত কোন স্বতন্ত্র সরকারী কর্মচারী দিয়ে বাজেট পরীক্ষার নীতিগ্রহণে সরকারের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

জেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত যুক্তি খাটে। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির গঠন এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মত একজন কার্যনির্বাহক আধিকারিকের অস্তিত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের এই বাহ্যিক ব্যাপারটি নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং সেহেতু তা তুলে দেওয়া উচিত।

পঞ্চায়েত সমিতি পর্যায়ে বিত্ত সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিচালন অপেক্ষাকৃত কিছুটা জটিল। মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্থাৎ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বাজেট রচনার দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিই তো সমিতির কার্যনির্বাহক আধিকারিক। তিনি সময়মত বাজেট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেন। তারপর এটা অর্থ ও সংস্থা সংক্রান্ত কমিটিতে যায়। কমিটি বাস্তব প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে নিজের সুপারিশসহ তা পঞ্চায়েত সমিতির সভায় পেশ করে।

পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক গৃহীত বাজেট আবার জেলা পরিষদে পেশ করতে হয়। জেলা পরিষদ হয় বাজেটটি অনুমোদন করবে, নয়ত তার নির্দেশমত সংশোধনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরত পাঠাবে। এই সংশোধনগুলি কার্যকর করে বাজেটটি আবার জেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। তবে আর্থিক বছরের শেষ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি যদি জেলা পরিষদের অনুমোদন না পায়, তাহলে ঐ বাজেট জেলা পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হয়ে থাকে। জেলা পরিষদ বাজেটটি অনুমোদন না করা পর্যন্ত কোন খরচ করা যায় না। তাই পঞ্চায়েত সমিতি প্রতি বছর একটা অতিরিক্ত বাজেট প্রস্তুত করে এবং পরিষদের অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজনীয় খরচ শুরু করে থাকে।[17]

অনুরূপভাবে জেলা পরিষদের বাজেট অর্থ ও সংস্থা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক রচিত হয়। জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক আধিকারিক তা জেলা পরিষদের নিকট পেশ করেন। জেলা পরিষদ অনুমোদনের পরে তা রাজ্য-সরকারের নিকট পাঠায়। রাজ্যসরকার হয় তা অনুমোদন করেন, নয়ত তার নির্দেশিত সংশোধনের জন্য পরিষদে ফেরত পাঠান। এই সংশোধনগুলি করবার পর আবার তা রাজ্যসরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদও বাজেটটি রাজ্যসরকারের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোন রকম ব্যয় করতে পারে না। তাই প্রত্যেক জেলা পরিষদ প্রতি বছর একটা সম্পূরক বাজেট প্রস্তুত করে রাজ্যসরকারের অনুমোদন নিয়ে কাজ শুরু করে থাকেন।[18] অনেকে মনে করেন, জেলা পরিষদের বাজেট রাজ্যসরকারের নিকট পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করার ব্যাপারটি আপত্তিকর। কেননা এতে জেলা পরিষদের মত একটি নির্বাচিত সংস্থার স্বশাসনের ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয়। তাঁরা চান, জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করা হোক। কিন্তু অনেকের অভিমত হলো, রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে তা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা প্রতিটি জেলা পরিষদের মধ্যে কম বেশী যেসব খেয়ালখুশী মত কাজ করবার যে প্রবণতা থাকে তা রোধ করা সম্ভব হয়। তাঁরা আশঙ্কা করেন বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিলে এক বিভাগের ক্ষতি

করে অন্য বিভাগের জন্য সামঞ্জস্যহীনভাবে টাকা খরচ করা হবে। তার ফলে শেষ পর্যন্ত জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থাই ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং বাজেট রচনায় জেলা পরিষদকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়ার সুপারিশ বাস্তব সম্মত হবে না। তাদের ওপর বাইরের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই থাকা দরকার।

যথোচিত বাজেট রচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অধিকাংশ নিম্নতর স্তরের পঞ্চায়েতী সংস্থার বাজেটে বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকেনা। এই অসঙ্গতির জন্য এইসব প্রতিষ্ঠানই পুরোপুরি দায়ী। রাজ্য-সরকার থেকে প্রাপ্য অনুদান ও সাহায্যের পরিমাণ ঠিক সময়ে তাদের জানানো হয় না। বাজেট অসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ কর আদায়ে শোচনীয় ব্যর্থতা। জেলা পরিষদ যাতে ঠিক সময়ে তার বাজেট তৈরী করতে পারে তার জন্য ১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে, 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিশনার রাজ্যসরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে প্রতিবছর পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসকে জেলা পরিষদে ও আঞ্চলিক পরিষদের অবগতির জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে প্রদেয় সম্ভাব্য সরকারী অনুদান, সাহায্য ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ জানান। এছাড়া রাজ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণও তিনি জানিয়ে দেন। এজন্য রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগকে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের ৩১ শে মে তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিশনারের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে হবে।[19] উল্লিখিত নিয়মাবলীতে অনুরূপ আর একটি ধারায় বলা হয়েছে, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন কমিশনার প্রতিবছর পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসককে প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদের (পঞ্চায়েত সমিতির) অবগতির জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে প্রতিটি ব্লক বাজেটের বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক খাতে সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ কত হবে তা জানিয়ে দেবেন।'[20] জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে তাদের বাজেট রচনার আগে সম্ভাব্য সরকারী অনুদান ও সাহায্যের পরিমাণ জানাতে সাহায্য করার জন্যই এই নিয়মগুলি করা হয়েছিল; এবং এগুলি আজও বলবৎ রয়েছে। অর্থাৎ নয়া পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে এ উপবিধিগুলি প্রযোজ্য। কিন্তু এই পদ্ধতি কার্যকর করা

সম্ভব নয়· এজন্য যে সেক্ষেত্রে এক বছর আগে রাজ্যের পরিকল্পনা বাজেট (Plan Budget) চূড়ান্তভাবে স্থির করতে হয়। অথচ কার্যত দেখা যায়, পরিকল্পনা বাজেট আগের বছরে তো নয়ই এমনকি বাজেট সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগেও কখনো স্থির করা হয় না। সুতরাং হয় সরকারের পরিকল্পনা বাজেট রচনার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে, নয়তো নিয়মাবলী নতুন করে রচনা করতে হবে

হিসাব নিরীক্ষা (Audit)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির হিসাব পরীক্ষা যে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই হিসাব পরীক্ষা ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই হিসাব পরিক্ষার ফলে ভুল ত্রুটি বের করা এবং ব্যয় কতটা বিধিসম্মত হয়েছে তা সহজেই জানতে পারা যায়। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি পুনর্গঠনের আগে পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণণিক অফিসের স্থানীয় সংস্থার হিসাব পরিক্ষক পুরাতন আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করতেন। তাছাড়া, নিয়মাবলীতে উল্লেখ আছে যে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের অর্থ ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটিকে প্রতি মাসে একবার করে নিজ নিজ পরিষদের হিসাব পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, কমিটি তহবিলের এই ত্রৈমাসিক পরীক্ষার কাজ খুব কমই করতেন। আর যদিও·বা কোথাও হিসাব পরীক্ষার কাজ করে থাকে তবে কমিটি তার চেয়ারম্যানের ওপরেই এই কাজের ভার দিয়েছে। আর সাবেক গ্রামপঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের হিসাব নিরীক্ষা করতেন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অধিকারিক। তাঁকে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অবেক্ষক (supervisor) হিসাবেও কাজ করতে হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিককে দিয়ে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ তিনি এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন না এবং তিনি এ কাজে প্রয়োজনীয় সময়ও দিতে পারতেন না।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের তহবিলের

হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য রাজ্যসরকার হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করবেন।[21] তাছাড়া, পঞ্চায়েতের কাজের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারী টাকা ও খাদ্যশস্য ব্যবহার করার অধিকার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি ওপর অর্পিত হয়েছে। ফলে হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। তাই রাজ্যসরকার হিসাব নিরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই নূতন ব্যবস্থায় পূর্বতন বার্ষিক নিরীক্ষার পাশাপাশি ধারাবাহিক নিবিড় নিরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ এই উদ্দেশ্যে 340 জন পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার, 57 জন সমিতি অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার, 16 জন পরিষদ অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার এবং 3 জন রিজিওন্যাল অ্যাকাউন্টস্ ও অডিঠ অফিসারকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলছেন। এই সংগঠনের আধিকারিকেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের হিসাব নিকাশ তৎপরতার সাথে ধাধাবাহিকভাবে নিরীক্ষা করে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ও আইনানুগ ব্যয়ের প্রশ্নে সাহায্য করেন। আশা করা যায় যে হিসাব নিরীক্ষার এই নিম্ন কাঠামো সৃষ্টির ফলে বর্তমানে হিসাব রক্ষণ এবং রিপোর্ট-রিটার্ন পাঠানোর ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলি যে অসুবিধা অনুভব করছে, তার অনেকটা সুরাহা হবে।

যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামো সমীক্ষা করে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে, দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াবার মত যথেষ্ট আয় এই সব প্রতিষ্ঠানের নেই। স্থানীয়ভাবে কর সংগ্রহ ও অন্যান্যভাবে সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে স্থানীয় পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি আরো সফল হবে তখনি যখন লোকে জানবে যে এই সব কর, মাশুল বা শুল্ক থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ তাদের পৌর সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্যই ব্যয় করা হবে, শুধু প্রতিষ্ঠান চালানো ব্যয় নির্বাহে নয়। গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় তাদের পৌর সুখসুবিধা এখনো অনেক কম। আর্থিক সংস্থান বস্তুতই এত অপ্রতুল যে সেখানকার জনগণের অনেক জরুরী চাহিদাই পূরণ করা যাচ্ছে না। গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালনে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তার মূলে রয়েছে আর্থিক অসচ্ছলতা। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কর ধার্য করণের অবকাশ সীমিত এবং খুব কম করই লাভজনক হয়ে

ওঠে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সরকারের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সব রকম কাজের জন্য সরকারী অনুদান চাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সরকারী অনুদানের সঙ্গে সব সময়েই শর্ত জড়িয়ে থাকে। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির সরকারের ওপর একান্ত নির্ভরশীলতা তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বশাসনাধিকারকেই ক্ষুণ্ণ করে। আর স্বশাসনইতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণ। সুতরাং অর্থের বা বিত্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী অনুদানের ওপর বর্তমানের তুলনায় কম নির্ভরশীল করা।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য বিধান মণ্ডলীর সৃষ্টি। সুতরাং রাজ্যসরকারের সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পর্ক এমন একটি নীতির ওপর নির্ভরশীল যাতে স্থির হয়েছে যে এইসব প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন নিজস্ব সহজাত আর্থিক ক্ষমতা নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিষ্ঠান পরিচালন, পৌর, সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নিজস্ব আর্থিক সম্পদ থেকে মেটাতে হয়। তার জন্য এইসব গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার আর্থিক দিক স্বয়ম্ভর হওয়া দরকার যাতে তারা স্থানীয় এলাকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত কৃত্যক পরিচালনা করতে পারে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু যদি রাজ্য প্রশাসনের অঙ্গ ও অংশ বা নিযুক্তক হিসাবে ধরা হয় তাহলে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তাদের কয়েকটি বিধিগত সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্বসহ গ্রামীণ প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সরকারকে দেখতে হবে যাতে অসংখ্য পৌর দায়দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকে। পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলি তাদের নিজেদের স্তরে স্বায়ত্তশাসনের এক একটি ইউনিট স্বরূপ। তাই প্রতিটি স্তরের ইউনিটকেই তাদের কাজকর্মের পরিধি অনুযায়ী নিজস্ব ও যথেষ্ট আর্থিক সম্পদের উৎস নির্দিষ্ট করতে হবে।

ভারতের মত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার জনগণেরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ন্যূনতম মৌলিক সুখসুবিধার

ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের পৌর সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য তিন স্তরের পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান না থাকলে রাজ্যসরকারকেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে হত। পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের পৌর দায় দায়িত্ব ভালভাবে পালনের কাজে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে রাজ্যসরকারের পক্ষে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং তাদের কাজকর্ম দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালনের জন্য গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট এবং স্বাধীন অর্থ সম্পদ যোগান দিতে হবে। তাই রাজ্যসরকার ও পঞ্চায়েতী রাজ-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা সুস্পষ্ট ও সংবিধানসম্মতভাবে ভাগ করে দিতে হবে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের স্থানীয়, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বিত্ত সম্পদের মূল্যায়নের জন্য এবং তাদের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য জাতীয় অর্থ কমিশনের মত একটি 'রাজ্য অর্থ কমিশন' অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশন স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা ও রাজ্যসরকারের মধ্যে অর্থ বণ্টনেরও দায়িত্ব নেবে।

তাছাড়া গ্রামীণ স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে লাভজনক উদ্যোগ বা শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য প্রয়াস চালাতে হবে। এতে তাদের কর বহির্ভূত আয়ের সুযোগ বাড়বে। এটা বাস্তবিকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই লাভজনক উদ্যোগ গড়ে তুলতে গ্রামীণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি 'পঞ্চায়েতী রাজ শিল্প কর্পোরেশন' এবং একটি 'পঞ্চায়েতী রাজ অর্থ কর্পোরেশন' স্থাপন করা দরকার।

হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে অষ্টাদশ অধ্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের তহবিলের হিসাবপত্র পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম এই আইনে বলা হয়েছে যে ঐ তহবিলগুলির হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য রাজ্যসরকার হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করবেন। নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা করে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কাঠামোর জন্য রাজ্যসরকার একটা অডিট ও

অ্যাকাউন্টস্ সংস্থা গঠন করেছেন। এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার জন্য যে সংস্থা গঠন করা হয়েছে তাতে থাকছেন—গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষার জন্য ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে সমিতি অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার এবং জেলা পরিষদের হিসাব পরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে পরিষদ অ্যাকাউন্টস ও অডিট অফিসার। তাছাড়া এদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবার জন্য প্রত্যেক ডিভিশনাল কমিশনারের অধীনে থাকছেন একজন করে রিজিওনাল অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার। আর রাজ্য পর্যায়ে পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের অধীনে থাকছেন একজন বিশেষ অফিসার।

পঞ্চায়েত আইনে হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি যে সব দলিল পত্র ও তথ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন সেই সব দলিলপত্র ও তথ্য তাঁকে সরবরাহ করবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদকে নির্দেশ দিতে পারেন। এই সব দলিল পত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমন ব্যক্তিকেও তাঁর সামনে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাছাড়া এরূপ কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি তাঁকে যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বা বিবৃতি পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।[22] হিসাব নিরীক্ষার পর নিরীক্ষককে একটি বিবৃতিসহ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয় এবং ঐ বিবৃতিতে উল্লেখ থাকবে—পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান ও তা থেকে ব্যয়ের হিসাব এবং ঐ সংস্থাগুলির ব্যয়ের হিসাবপত্রে তথ্যগত ভ্রান্তি বা অনিয়ম। কোন অর্থ অপচয় ঘটলে তারও উল্লেখ থাকবে ঐ বিবৃতিতে। হিসাব নিরীক্ষার দু'মাসের মধ্যে ঐ রিপোর্ট পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সংশ্লিষ্ট প্রধানদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উক্ত রিপোর্টগুলির নকল রাজ্য সরকারের কাছেও পাঠাতে হয়।[23]

আইন অনুসারে নিরীক্ষকের কাছ থেকে অডিট রিপোর্ট পাওয়ার দু'মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের সভায় রিপোর্টে উল্লিখিত ভ্রান্তি ঠিকঠাক করে হিসাবপত্র বিধিমত রাখবার ব্যবস্থা করতে হয় এবং হিসাব নিরীক্ষককে তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিতে হয়। কোন ত্রুটি বা অনিয়ম

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত, সমিতি বা পরিষদ দূর করতে সমর্থ না হলে তার কারণ হিসাব নিরীক্ষককে জানানো ঐ সংস্থার কর্তব্য। হিসাব নিরীক্ষকের নির্দেশ পালিত না হলে তিনি রাজ্যসরকারকে বিষয়টি জানাবেন। এরপর রাজ্য-সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ আদেশ দিতে পারেন।

আইনবিরুদ্ধ ব্যয় অনুমোদন না করবার ক্ষমতা হিসাব নিরীক্ষককে পঞ্চায়েত আইনে দেওয়া হয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাবদিহি করবার সুযোগ দিয়ে এবং তাঁর কৈফিয়ৎ বিবেচনা করে যে ব্যক্তি বা সংস্থা উক্ত আইন বিরুদ্ধ অর্থব্যয় করেছেন তাঁর উপর ঐ ব্যয়ের দায়িত্ব চাপাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিসদের কোন সদস্যের উপস্থিতিতে কোন বৈঠকে যদি বে-আইনী ব্যয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়, ঐ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে এই আইনবিরুদ্ধ কাজের ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সংস্থার কার্যবিবরণীতে যে সব সদস্যের উক্ত আইন বিরুদ্ধ কাজ বা ব্যয় সম্পর্কে বিরোধিতার কথা উল্লেখ থাকবে তাঁরা এসব দায় থেকে রেহাই পাবেন। যে ব্যক্তি বে-আইনী ব্যয় অনুমোদনের জন্য সারচার্জ দেবার দায়ে পড়েছেন তিনি আপীল করলে রাজ্যসরকার যদি মনে করেন যে উক্ত ব্যক্তি "সরল বিশ্বাসে" ঐ ব্যয় অনুমোদন করেছেন তবে ঐ সারচার্জ বাতিল করে দিতে পারেন।[24]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব নিরীক্ষার জন্য হিসাব নিরীক্ষকদের নিয়োগ করা শুরু হয়ে গেছে এবং এঁরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রশাসন শক্তিশালী করতে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবেন তা দেখবার জন্য আমাদের আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি পর্যায়ে অভিজ্ঞ আধিকারিকগণ যুক্ত আছেন। তাই সেখানে হিসাব নিরীক্ষকদের কাজ অনেকটা মামুলী ধরনের। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সচিব ও নব নিযুক্ত প্রধানগণের পক্ষে নিরীক্ষা শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন মেনে হিসাবরক্ষা করা বেশ দুরুহ এবং এক্ষেত্রে হিসাব নিরীক্ষকদের কাজও বেশ কঠিন।

তাই আশা করা যায় হিসাব নিরীক্ষকদের দায়িত্ব হবে কেবলমাত্র পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির—বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের দোষ ত্রুটি বের করা

নয়, কাজ কর্মের উন্নতির জন্যও বটে। তবে যে ধরণের হিসাব পরীক্ষা বর্তমানে করা হয় তার চেয়ে অনেক ব্যাপকতর পরীক্ষা প্রয়োজন। যা দরকার তা হলো শুধু দেনা পাওনা মেটানো বিধিসম্মত হয়েছে কিনা তার বিচার নয়। স্থানীয় প্রাধিকারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থসংক্রান্ত রীতিনীতি ও সংগঠন সম্পর্কে সামগ্রিক তদন্ত চাই। স্থানীয় সংস্থাগুলির হিসাব পরীক্ষা প্রধানত কর্মদক্ষতা ভিত্তিক হওয়া উচিত। স্থানীয় সংস্থাটি যে সব কৃত্যক (Services) পরিচালনা করে তুলনামূলক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সেই কৃত্যকের ব্যয় লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরাই তার উদ্দেশ্য হবে। এইসব পরিসংখ্যানের প্রধান লক্ষ্য হবে অন্য এলাকার তুলনায় কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইসব কৃত্যকের আপেক্ষিক যোগ্যতা প্রতিপন্ন করা।[25]

REFERENCES

1. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 46(1) (a) and (b).
2. Ibid, Sec. 46(5) (a) and (b).
3. Ibid, Sec. 47(1).
4. Ibid, Sec. 23(2).
5. Report of the Study Team on Panchayati Raj Finances, 1963, Part-I, Ministry of Community Development & Co-operation, Government of India, P. 11.
6. Ibid, Sec. 46(2) and (3).
7. Art. 276, Constitution of India.
8. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 132(1).
9. Ibid, Sec. 133(1) (a) and (b).
10. Ibid, Sec. 133(I) (c).
11. G. O. No. 13085(323) AZP/2B 4/79 dated 5. 6. 1980.

11a. Report of the Study Team on Panchayati Raj Finances, 1963, Part I, Ministry of C. D. & Co-operation, Govt. of India, P. 55.

12. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 135A.
13. Ibid, Sec. 179(1).
14. Ibid, Sec. 181(1).

15. Ibid, Sec. 182A.
16. Ibid, Secs, 48 and 49.
17. Ibid, Secs. 36-38.
18. Ibid, Secs. 183 and 184.
19. West Bengal Zilla Parishad Rules, 1964, Rule 54(1).
20. Ibid, Rule. 54(2).
21. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 186(1).
22. Ibid, Sec. 188
23. Ibid, Sec. 190
24. Ibid, Secs. 192-193
25. William A. Robson, The Development of Local Government George Allen & Unwin, 1966, London, P. 888.

দশম অধ্যায়

রাজ্যসরকার ও পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ এবং সুসঙ্গত তত্ত্ব খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। তাছাড়া এ বিষয়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কি পরিমাণ থাকা দরকার সে সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারের সম্পর্ক সাধারণত সাময়িক ভিত্তিতেই (ad hoc basis) ঠিক হয়ে থাকে। ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য্য ঠিকই বলেছেন: "Discussion on local government and central-local relationship are often made on ad hoc basis without going into the basic framework of relationship of the two levels of government."[1]

সরকারের রূপ বা গঠনরীতি যাই হোক না কেন, স্থানীয় পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলি কি পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত হওয়া উচিত? পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কি পরিমাণ থাকা দরকার সে সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের রূপ বা গঠনরীতি (form) যাই হোক না কেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ বা আঞ্চলিক সরকারের সমপদস্থ বা সমশ্রেণীভুক্ত নয়, তাদের অধীন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারে না। কারণ তা হলে তারা রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের এক্তিয়ার স্থানীয় এলাকা শাসনের মধ্যে সীমিত থাকবে না, তার বাইরে চলে যাবে। এটা স্বতসিদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সার্বভৌম নয়; কেননা রাজ্য বিধানসভার তৈরী আইনের দ্বারা এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করা হয়েছে। আইনানুযায়ী স্থানীয় সংস্থাগুলি মূলত বিধানসভার সৃষ্টি। বিধানসভা নিজের ইচ্ছামত এগুলি গঠন করেন এবং ভেঙ্গে দেন।

একথা যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গঠন করেছে এমন প্রতিটি দেশেরই মূল সমস্যা হল এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তিনটি কাজ একইসঙ্গে করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। এগুলি হল: রাজ্যের অভ্যন্তরে সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা গড়ে তোলা ও স্থানীয় সংস্থাগুলির নিজস্ব এবং রাজ্যসরকারের কর্মসূচীতে জনগণকে অংশগ্রহণে উৎসাহী করে তোলা, এবং এই সব নীতি ও কর্মসূচীর যথাযত রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা। এই তিন লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। এই বিরোধ থেকে কয়েকটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, সব সময়ের জন্য এই লক্ষ্য তিনটির মধ্যে পুরো ভারসাম্য স্থাপন করা যাবে না। কিছু দেশে বেশী স্বাধীনতা এবং কম নিয়ন্ত্রণ দরকার। কিছু দেশে আবার তার উল্টোটা দরকার। এমনকি একই দেশে স্থান কাল ভেদে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সুদানের কথাই ধরা যাক। সেখানে একসময় যখন স্থানীয় জনগণের কল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক রেষারেষি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে, যেখানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বোঝাপড়ার প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে তখন তাদের ওপর বিশদ প্রশাসনিক তদারকির প্রয়োজন। কিছুদিন আগেও ব্রিটেনে এরকম অবস্থা দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালের বড় সংস্কারগুলির আগে এই নিয়ন্ত্রণ বস্তুত খুব অল্পই শিথিল করা হয়েছিল। বৃটেনে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত খুব দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রথম স্তরে অর্থাৎ প্রথম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ব্রিটেনের সরকার যে তাদের সাধারণ নীতি ও সাধারণ মান স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর চাপিয়ে রেখেছিল তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন না। এমন কয়েকটি সত্যিকারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে যাতে দেখা যাবে, যে সমস্ত কৃত্যক পরিচালনা করা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি প্রয়োজন মনে করে না তার জন্য তারা রাজস্ব সংগ্রহে অনিচ্ছুক। এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যেখানে স্থানীয় সংস্থাগুলি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন কৃত্যক চালাতে গিয়ে অর্থ সাশ্রয়ের জন্য নিম্নমানের কৃত্যক সরবরাহ করে থাকে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে গোড়ার দিকে ত্রুটিপূর্ণ

কারিগরী সম্পদ বিশেষ করে পেশাগত দক্ষতা অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। ধরা হয়নি বৃহৎ শিক্ষা ও কর্মতৎপরতার কার্যসূচী যার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলি তাদের দায়দায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা, তাদের সমস্যা ও সেই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে অবহিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির যথাযথ অর্থ গ্রহণে যখন তারা ব্যর্থ হয় তখনই ব্যবস্থা নেবার দরকার হয়। আবশ্যিক কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের জন্য সরকারকে অবশ্যই চাপ দিতে হবে এবং দরকার হলে নিজেকেই এগিয়ে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।[2]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজ্যসরকারের প্রতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-গুলির অধীনতা দেশে দেশে পৃথক রূপ নেয়। যেমন ধরা যাক ফ্রান্সের কথা। সেখানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি তাদের এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। তারা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে গ্রেট ব্রিটেনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি প্রধানত আইনের দ্বারা গঠিত। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ অবেক্ষণ (supervision) সাপেক্ষে স্থানীয় প্রাধিকারীগণ নিজেদের স্থানীয় অধিবাসী-দের ইচ্ছানুযায়ী আইনের নির্দেশ পালন করছে বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে এই শেষোক্ত পদ্ধতিই প্রধাণত গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য-সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান না থাকলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-গুলি তাদের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাছাড়া এইসব প্রতিষ্ঠানের দোষ ত্রুটির জন্য রাজ্যসরকার রাজ্য বিধান সভার নিকট দায়ী থাকেন। সুতরাং রাজ্য-সরকারকে তাদের ওপর নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়। আইনসভা, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ এই নিয়ন্ত্রণ চালান। এই তিন ধরণের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণই বেশী ব্যাপক। এ রাজ্যে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য বিধানসভার সৃষ্টি এবং সেজন্যে তাদের ক্ষমতা, কাজ ও দায়িত্ব আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে রাজ্যসরকারই কেবল কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে দিতে, পৃথক করতে বা হস্তান্তর

করতে পারে। তাছাড়া আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী নিয়ম এবং উপবিধি রচনার ক্ষমতা রাজ্যসরকারেরই রয়েছে।

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারী তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে (১৯৭৩) সেসব ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া নতুন আইনে নতুন কিছু ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক তদারকি

বর্তমান আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ওপর তদারকি করবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রশাসনের ওপর বর্তেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাজকর্ম পরিদর্শন বা তদারকির উদ্দেশ্যে একজন অধিকর্তা (Director) এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার নিযুক্ত করবার ক্ষমতা রাজ্যসরকারকে পঞ্চায়েত আইনে দেওয়া হয়েছে।[3] কিন্তু এজাতীয় পরিদর্শন বিভাগ এখনো গড়ে ওঠেনি। পঞ্চায়েত দপ্তরের অফিসার-গণ (অধিকর্তা, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক), বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের এই আইনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিসেবে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির অফিস, কাজকর্ম, কৃত্যক ও লেখ্য পরিদর্শনের অধিকারে রয়েছে। তাছাড়া পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিদর্শন ও লেখ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলিকে যে কোন খাতা, চিঠিপত্র, লেখ্য দলিল দেখাতে এবং প্রতীরণ (Return), পরিকল্পনা, হিসাব বা প্রতিবেদন পেশ করতে বলবার অধিকার এইসব আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে।[4] নিরীক্ষণ ব্যবস্থার জটিলতা—যা সরকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের কাছেও কঠিন—তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। অনেকের মনে হয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ওপর সরকারী তদারকীর এই ব্যাপক ব্যবস্থা এত বেশী করা হয়েছে যে এইসব সংস্থা তার ফলে সরকারী বিভাগে পরিণত হয়েছে। এইসব ব্যবস্থার দরুণ পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত উৎসাহ উদ্যোগ হারাচ্ছে। হারাচ্ছে আত্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে কোন পরিকল্পনা

গ্রহণের সাহসও। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সরকার এখনো এইসব প্রতিষ্ঠানের স্ব-শাসন ক্ষমতার পক্ষে কোন আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াননি।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বাঞ্ছনীয় দক্ষতা অর্জন করেনি এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ নেতারই এগুলি চালাবার মত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ নেই। স্বভাবতই তাই এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী তদারকীর দরকার হয় এবং নেতারাও তাদের ক্ষমতার হস্তক্ষেপ হলে কিছু মনে করেন না। কার্যত কোন উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক-দের এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যান না। ব্লক পর্যায়ের আধিকারিকেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধান করেন সাধারণত অনেকটা ময়না তদন্তের মতই।

তাছাড়া রাজ্যসরকার যদি মনে করেন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে গৃহীত কোন প্রস্তাব আইন সঙ্গতভাবে পাশ করা হয়নি অথবা প্রস্তাবটিতে পঞ্চায়েত আইন বা নিয়ম প্রদত্ত ক্ষমতার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ করা হয়েছে তা হলে সরকার ঐ প্রস্তাব বাতিল (rescind) করে দিতে পারেন। কোন প্রস্তাব বাতিল করার পূর্বে অবশ্য সরকার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সংস্থাকে তার প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। এছাড়া, পঞ্চায়েত সংস্থা প্রদত্ত কোন আদেশ বা শুরু করা হয়েছে এমন কাজ—আইন বলে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিমাত্রায় প্রয়োগ হলে বা গুরুতর শান্তি শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলে—নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতির ক্ষেত্রে জেলা শাসক এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। এই নির্ধারিত আধিকারীদের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার বা আদেশটি সংশোধিত আকারে কার্যকরী করবার জন্য নির্দেশ দেওয়ারও ক্ষমতা রাজ্যসরকারের রয়েছে। এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ কতদিন বলবৎ থাকবে তা নির্ভর করে রাজ্যসরকারের ওপর। রাজ্যসরকার যেমন সমীচীন মনে করেন সেই সময়ের জন্য তা বলবৎ থাকে।[5] তবে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান কৃত কোন কাজ বা তার দ্বারা শুরু করা হবে এমন কোন কাজ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বাতিল করেন বা স্থগিত রাখেন তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিযোগকারী কোথায় আপীল করতে পারবেন সে বিষয়ে বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে কিছু উল্লেখ

নেই। এই আইন অনুসারে কোন উপবিধিও রচিত হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে মনে হয় রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

এটা সত্য যে জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেলা শাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কোন আদেশ বা কাজ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যার সৃষ্টি করলে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব বা আদেশ বা কাজ স্থগিত বা বাতিল করবার ব্যাপারে জেলা শাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু কখনো কখনো পঞ্চায়েত সমূহের অধিকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা শাসক রাজনৈতিক চাপে পড়েন এবং তখনই গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাদের অধিকার নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনেকে মনে করেন, ভালো হত যদি সংশ্লিষ্ট বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েতকে স্বাধীন বিচার বিভাগের কাছে আপীল করবার অধিকার দেওয়া হত।

কর্মকর্তাদের অপসারণ

সরকারী নিয়ন্ত্রণের আর একটা দিক রয়েছে যা আরো গুরুতর ও অবাঞ্ছনীয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী-সভাধিপতিকে অবাধ্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে অপসারিত করবার অস্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা রাজ্যসরকারকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কোন আদেশ জারী করবার আগে রাজ্যসরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিয়ে থাকেন।[6] তাছাড়া, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুশ্চরিত্রতা, অযোগ্যতা বা তিন মাসের অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন নির্বাচিত সদস্যকে অপসারিত করবার ক্ষমতাও মহকুমা শাসককে দেয়া হয়েছে। ঐ একই কারণে পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্যকে জেলা শাসক অপসারিত করতে পারেন এবং জেলা পরিষদের কোন সদস্যকে অপসারিত করতে পারেন বিভাগীয় কমিশনার। এসব ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। অবশ্য, মহকুমা শাসক জেলা শাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সদস্যের

অপসারণের আদেশ বেরুবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করবার অধিকার আছে। এরূপ আপীলের ক্ষেত্রে এরূপ কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত।[7] কিন্তু যেখানে তিনি আপীল করবেন সেই প্রাধিকারী এখনও নির্ধারিত হয় নি।

সংস্থাগুলিকে পুনর্গঠন বা বাতিল করা

কোন পঞ্চায়েত সংস্থার সদস্য বা কর্মকর্তাকে অপসারিত করবার ক্ষমতা ছাড়াও কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন বা সাময়িকভাবে বাতিল করবার অধিকার রাজ্যসরকারকে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যসরকারকে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান কর্তব্য পালনে অযোগ্যতা দেখিয়েছে বা ক্রমাগতভাবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে অথবা তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ করেছে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অবশ্য কোন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান বাতিল করবার আগে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে তার বক্তব্য জানাবার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সরকার কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদকে কেবলমাত্র ছয় মাসের জন্য বাতিল করতে পারেন।[8] প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বঙ্গীয় পৌর আইনে বাতিলাদেশের মেয়াদের কোন সীমা নেই।[8a] কিন্তুপশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছে, বাতিলের মেয়াদ ছয় মাসের বেশী হবে না। সুতরাং এ ধারাটি বঙ্গীয় পৌর আইনের তুলনায় কম কঠোর। শুধু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, রাজ্যসরকারকেও সাময়িকভাবে বাতিল করা যায় এবং সমগ্র রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা যায়। সুতরাং রাজ্যসরকারের হাতে উল্লিখিত বাড়তি ক্ষমতা থাকাটা মোটেই অসঙ্গত নয়।

সংবিধানে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের কার্যকরী অংশগুলিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির জন্য কোন বিধান নেই। সুতরাং এই সংস্থাগুলির যেসব ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যসরকার তা তাদের হাতে প্রত্যভিযোজন (delegation) করেছেন। তাই এই সংস্থাগুলিতে কুশাসন চললে তাতে হস্তক্ষেপ করার জন্য রাজ্যসরকারের হাতে বাড়তি ক্ষমতা অবশ্যই থাকা চাই।

কোন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্বপালনে অক্ষম হলে বা ক্ষমতার

অপব্যবহার করলে সরকারের সামনে দুটি পথই খোলা থাকে,—অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী হয় তাদের পুনর্গঠিত করা, নয়তো তাদের বাতিল করা। অনেক এলাকাতেই দেখা গেছে, বাতিল করা সংস্থায় পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেখানে আগের বারের নির্বাচিত লোকেরাই ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ফলে কুশাসনই চলতে থাকে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির অবসানের জন্য পঞ্চায়েত সংস্থাটিকে বাতিল করে দেয়াই দরকার। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দোষী পঞ্চায়েত সংস্থাটির সংশোধনের সমস্ত উপায় ব্যর্থ হলে তবেই কেবল এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় আইনের তৃতীয় ধারায় (Act III) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি বাতিলের ব্যাপারে অনুরূপ বিধান রাখা হয়েছিল। একমাত্র পার্থক্য শুধু বাতিলের সময় সীমা নিয়ে। পুরানো আইনে এই সময় কাল ছিল তিন বছর। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনে তা কমিয়ে দুবছর করা হয়। আর ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে ঐ সময়সীমা ছয়মাস করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনের 108 ধারা অনুযায়ী কোন আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদকেই সরকার বাতিল করেননি। কিন্তু ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশাসক (Administrator) নিযুক্ত করেন। একটি নতুন ধারা—190A ধারা বলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনে এই নতুন ধারাটি সংযোজিত হয় এবং পরে রাজ্য বিধান সভায় পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ার পর জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ বা তাদের কোন স্থায়ী কমিটি অথবা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন বা যেসব দায়দায়িত্ব পালন করতেন তা রাজ্যসরকার নির্দেশিত পথে প্রশাসকদের ওপর বর্তালো। তাছাড়া, ঐ সংশোধনী আইন অনুসারে উপযুক্ত কোন আদালতের রায় বা ডিক্রি বা নির্দেশে কোন জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ত্রুটিপূর্ণ বলে ঘোষিত হলে কিংবা অন্য কোন কারণে কোন জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যসরকার

কোন ব্যক্তিকে জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসক হিসেবে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত করতে পারেন।

১৯৬৯ সালে রাজ্য বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিলটির উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা পঞ্চায়েত বিভাগের তদানিন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত বলেছিলেন, মেদিনীপুর জেলায় রামনগর আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের গঠনতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ। তিনি জানান, উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী এই সংস্থাগুলি পুনর্গঠিত না হলে তারা কাজ করতে পারবে না। সুতরাং যতদিন না আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হচ্ছে ততদিন তাদের কাজ চালানোর জন্য একজন করে প্রশাসক নিযুক্তির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনে নতুন ধারা সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

বিরোধীদলের সদস্যরা বলেন, বিলটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয়েছে, এতে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হবে না। বিরোধী সদস্যদের এই অভিযোগের জবাবে মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন, বিলটির উদ্দেশ্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি দূর করা যদি একাজ করতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে লিপ্ত হন তবে তাতে দোষের কিছু নেই।[৭]

লক্ষ্য করবার বিষয়, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর তাদের এই সন্দেহ করবার কারণ ছিল যে অনেক পরিষদই সরকারের ত্রাণ দপ্তর থেকে পাওয়া অর্থ ঠিকভাবে কাজে লাগান নি। ফলে অনুদানের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। পরিষদগুলির বিরুদ্ধে পুরো তদন্ত চালানো হলো। অযোগ্যতা এবং সরকারী অর্থ অপব্যবহারের দায়ে নতুন সরকার তাদের কয়েকটি বাতিল করতেও চাইলেন। কিন্তু তদন্ত সত্ত্বেও কোন বড় রকমের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রমাণ পাওয়া গেলনা। মহামান্য হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিষদগুলিকে বাতিল করা সম্ভব হলো না। কিন্তু ১৯৬৯ সালের দু বছর আগে সরকার যা করতে পারলেন না ১৯৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনের মাধ্যমে তা করলেন। এটাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ওপর আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা চলে। রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান-পতনের দ্বারা পঞ্চায়েতগুলি

প্রভাবিত হবে কিনা অথবা এমন পরিস্থিতি গড়ে তোলা দরকার কিনা যাতে পঞ্চায়েতগুলি সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজ করতে পারে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ নিয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আদালতে যাবে এটা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা এর ফলে তাদের মধ্যে মামলাবাজির প্রবণতাই বেড়ে যায় এবং জনগণের অর্থের অযথা অপচয় হয়। তাই দুটি বা তার বেশী সংখ্যক জেলা পরিষদ কিংবা একটি জেলা পরিষদের সঙ্গে একটি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষেরই উচিত হবে বিষয়টি রাজ্যসরকারের নিকট পেশ করা। এক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে।

কর্মচারী সংক্রান্ত নিয়মাবলী

বিভিন্ন পঞ্চায়েতী সংস্থার কর্মচারীদের নিয়োগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগ্যতা, বেতনক্রম, চাকরীর শর্ত, প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম তৈরীর একমাত্র অধিকার রাজ্যসরকারেরই রয়েছে। রয়েছে এই সমস্ত সংস্থাকে নির্দেশ দেবার ক্ষমতারও। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উচ্চতর দুটি স্তরে সরকারী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বেশ দৃঢ় কারণ সেখানে উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীদের রাজ্যসরকার নিয়োগ করেন। জেলা শাসক পদাধিকার বলে পরিষদের কার্য নির্বাহক অফিসার। তিনি ইনডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সদস্য। তাছাড়া আছেন এ. ডি. এম পদ মর্যাদার একজন সহকারী কার্যনির্বাহক অফিসার। তিনিও ইনডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সদস্য। তাছাড়া, প্রত্যেক জেলা পরিষদে একজন সচিব আছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য। প্রত্যেক পরিষদে একজন অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার আছেন। তাঁকে রাজ্যসরকার নিয়োগ করেন। কার্যনির্বাহক অফিসার পরিষদের সকল অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দকেই নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের চারজন অফিসারকে রাজ্যসরকারই বদলী করে থাকেন। ফলে এঁদের ওপর সভাধিপতির নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় নয়।

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই ব্যাপক। স্থানীয় সমষ্টি

উন্নয়ন আধিকারীক পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহক অফিসার হিসেবে কাজ করেন। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন। ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত অফিসার সমিতির সচিব হিসেবে কাজ করেন। প্রত্যেক সমিতি পর্যায়ে অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার আছেন। এঁদের রাজ্যসরকার নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে বদলী করতে পারেন। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে রক্ষিত হয়। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বাক্ষরসহ গোপন রিপোর্ট মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে পাঠান। জেলা শাসক আবার তার মন্তব্যসহ সেগুলি রাজ্যসরকারের কাছে পাঠান। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তিনি সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিভাগের কর্মচারী এবং সরাসরি মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের নিকট দায়ী। নয়জন সম্প্রসারণ আধিকারিকের[10] সাহায্যে তিনি কাজ করেন। এই সম্প্রসারণ আধিকারিকেরা নিজ নিজ বিভাগীয় প্রধান এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট দায়ী। ডব্লিউ, এইচ, মরিস-জোন্স ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, "নিজেদের ব্লকের বিশেষজ্ঞ কর্মীদের অধীনস্থ সহকারী হিসেবে পরিণত করে এবং গ্রামসেবকদের ওপর প্রভুত্ব করে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজেদের দ্বৈত অধীনতা (সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের উচ্চতর আধিকারিক এবং জেলা শাসকের প্রতি) থেকে মুক্ত হতে পারেন না।"[11] এভাবে বহুজনের প্রতি আনুগত্য অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এমনকি তার ফলে কখনো কখনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অপরদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে নিযুক্ত করেন রাজ্যসরকার।[12] প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে জব অ্যাসিটেন্ট আছেন। এঁকে অবশ্য নিযুক্ত করেন গ্রাম পঞ্চায়েত। কিন্তু এদের চাকরীর শর্ত, বেতন, ভাতা এবং অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন। সম্প্রতি গ্রাম সেবকদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।[13] এখানে মনে রাখা দরকার যে গ্রামসেবকগণ পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কর্মী। তবে এই কর্মচারীবৃন্দকে প্রধানের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে। কিন্তু এদের পদোন্নতি, বদলী প্রভৃতি নির্ভর করে রাজ্যসরকারের ওপর। তাই এঁরা প্রধানের নির্দেশ অপেক্ষা জেলা পঞ্চায়েত অফিসার, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অফিসার বা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের নির্দেশকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে রাজ্যসরকার নিম্নস্তরের পঞ্চায়েতগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার চেষ্টা করে থাকেন।

তাছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজকর্ম আটটি স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি স্থায়ী সমিতিতে রাজ্যসরকার অনধিক তিনজন অফিসার নিয়োগ করে থাকেন।[14] পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সচিব হিসাবে কাজ করেন স্থানীয় ই. ও. পি.। আর অন্যান্য স্থায়ী সমিতিগুলির সচিব হিসাবে কাজ করেন সরকার মনোনীত অফিসারদের মধ্য থেকে একজন। অপরদিকে, জেলা পরিষদের সচিবকে পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সমিতির সচিব হিসাবে কাজ করতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমিতি বা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির সচিব হিসাবে কাজ করছেন এক একজন সরকারী কর্মচারী এবং এঁদের মাধ্যমেই রাজ্যসরকার উচ্চতর পঞ্চায়েত সংস্থা দুটির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

হিসাব নিরীক্ষা

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রচলিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে হিসাব নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যাপক ক্ষমতা রাজ্যসরকারকে দেওয়া হয়েছে।[15] গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করেন রাজ্যসরকার নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক। হিসাব পরীক্ষার স্থান, কাল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেন রাজ্যসরকার। হিসাব পরীক্ষকের ক্ষমতাও যথেষ্ট। হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও তথ্য পেশ করতে এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সামনে হাজির হয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। হিসাব পরীক্ষকের নির্দেশ অমান্য করার ফলে কোন ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে

পারেন। হিসাব পরীক্ষার একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কর্মকর্তা এবং রাজ্যসরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ঐ রিপোর্টের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে তা যদি কোন পঞ্চায়েত সংস্থা দূর করতে সমর্থ না হয় তাহলে তার কারণ হিসাব পরীক্ষককে জানাতে হয়। তাছাড়া, পঞ্চায়েত সংস্থার কোন সদস্যের উপস্থিতিতে কোন বৈঠকে যদি কোন বে-আইনী ব্যয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলে ঐ সংস্থার সদস্যগণ আইন বিরুদ্ধ কাজের ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিরীক্ষা ব্যবস্থার জটিলতার এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ পঞ্চায়েত পর্যায়ে ভীতির সঞ্চার করেছে। ফলে তাদের কর্মপ্রয়াসের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়তে পারে।

সহায়ক অনুদান

সহায়ক অনুদান (Grant in aid) হচ্ছে আর একটি উপায় যার মাধ্যমে সরকার পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। পঞ্চায়েতগুলি কর ও অভিকর থেকে যে রাজস্ব পায় তার তুলনায় সরকারী অনুদান পায় অনেক বেশী। ক্রমবর্ধমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের মূলে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে রয়েছে এই অনুদান। উচ্চতর পঞ্চায়েতগুলি বা সরকার থেকে পাওয়া অনু-দানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই এইসব পঞ্চায়েতকে সরকারী নির্দেশিত পথে চলতে হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির স্বাধীনতা হ্রাসের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় উৎস থেকে পাওয়া রাজস্বের অবনতিই সূচিত হয়।[16]

মূল্যায়ন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। রাজ্যসরকারের হাতে বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবার দরুণ এখানে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি ফ্রান্সের মতই প্রশাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিনিধিরূপে পরিণত হয়েছে। নিজেদের অভাব অভিযোগ দূর করবার ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওপর ভরসা না করে রাজ্যসরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর পঞ্চায়েতের নেতারাও প্রশাসন চালনা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের রূপরেখা

স্থির করবার ব্যাপারে রাজ্যসরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা পরামর্শের ওপর ভরসা করে থাকেন। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি এখনো যে শৈশবকাল কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেকথা সত্য। তাই প্রারম্ভিক পর্যায়ে তারা পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানের এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা চায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু থাকলে তাতে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ও উদ্যোগই ব্যাহত হবে।

কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে গ্রামাঞ্চলে অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, তহবিল তছরূপ, স্বজনপোষণ, প্রভৃতি পশ্চাদগামী অশুভ শক্তিগুলি এখনো সক্রিয়। সুতরাং এইসব অশুভ-শক্তির বিরুদ্ধে জনস্বার্থকে সুরক্ষিত করবার জন্য রাজ্যসরকারের হস্তক্ষেপ শুধু কার্যকরীই নয়, অত্যাবশ্যকও। পঞ্চায়েতীরাজ মূলত দ্বৈতশাসন। দ্বৈতশাসন বলা হল এই জন্য যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় উন্নয়নের জন্য জনগণ ও রাজ্যসরকারের যৌথ প্রয়াসের সংস্থান রয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি সুষ্ঠভাবে যাতে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যসরকারকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সুসংগঠিত হয়, তাদের দায় দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে উপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ করে তা দেখা রাজ্যসরকারের দায়িত্ব। সুতরাং রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণের শুধু নেতিবাচক নয়, একটি অস্তিবাচক দিকও আছে। সে দিকটি হল, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালনা করা, পরামর্শ দেওয়া এবং তারা যাতে উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে উপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ করে সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে পারে তার জন্য সরকারের উচিত হবে ক্রমশ এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ হ্রাস করা। দোষ-ত্রুটি ধরার জন্য পরিদর্শন ও হিসাব-নিকাশ-এর পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থা দরকার যার কাজ হবে শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়া। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক ভূমিকার কথা চিন্তা করলে আনুষ্ঠানিক পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষার ব্যাপারটি ততটা প্রয়োজনীয় নয়। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হয় এবং জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে হয় তাহলে তাদের সৃজনশীল, উদ্ভাবনশীল, এমনকি তাদের দুঃসাহসী হতে হবে, সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্যমের পরিচয় দিতে হবে। তাছাড়া তাদের

অধিকাংশ কর্মীই অজানা এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। সুতরাং সুপরিচিত ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজ করলে যতটা ভুলের সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভুলের সম্ভাবনা তাদের থাকবে। কিন্তু কর্মসূচীগুলির মধ্যে যদি সুস্থ গতিশীলতা থাকে তবে বাড়তি ভুলের সম্ভাবনাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ভুলভ্রান্তিকে অসাধুতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখতে হবে। একবার ভুল করলে তার জন্য শিক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, শাস্তি নয়।[17] সুতরাং পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষার কাজ মূলতঃ হবে গঠনমূলক। তার ভূমিকা হবে ফলপ্রসূ শিক্ষামূলক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক গঠনমূলক ও ইতিবাচক নিয়ন্ত্রণের বদলে এক আনুষ্ঠানিক ও নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছেন। বিভিন্ন গ্রামে সরজমিন সমীক্ষা থেকে এই অভিমতই প্রমাণিত হয়েছে। রাজ্যসরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাপক ক্ষমতার বলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ গণতন্ত্রের রূপায়ণকে যথার্থই সার্থক বা বিনষ্ট করে দিতে পারেন। যদি এই নির্দিষ্ট প্রাধিকারী (authority) কর্তৃত্বমূলক প্রশাসন চালনার পক্ষপাতী হন তাহলে গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন স্বপ্নই রয়ে যাবে। সরকারী জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যদি কেবল গ্রাম সেবার কাজে উৎসর্গীকৃত হন তাহলে স্বায়ত্ত-শাসনের অঙ্গ হিসেবে পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হাতে থাকে।

পঞ্চায়েতী রাজপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ। রাজনৈতিক মনোভাবের দ্বারা কখনো কখনো এ কাজ প্রভাবিত হতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়াও কঠিন নয়। সুতরাং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য পৃথক একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধুত্বের সঙ্গে এবং ঘরোয়াভাবে পরামর্শ ও নেতৃত্ব দেওয়া এবং যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব সরকারী অনুমোদনের জন্য প্রেরীত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি সংস্থা গঠন করা দরকার।[18] গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর যেভাবে নানা ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য এবং যে সব ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন সে সব ব্যাপারে সুপারিশ করবার জন্য রাজ্যপর্যায়ে একটি শক্তিশালী সংস্থা

গঠন করা দরকার। এজাতীয় সংস্থার গুরুত্বের কথা মনে করেই সম্ভবত বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে 205 এবং 211 এই দুটি ধারা সংযোগ করা হয়েছে। 205 (1) ধারায় বলা হয়েছে : ‘সমস্ত বা কোন বিশেষ শ্রেণীর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাজকর্ম পরিদর্শন বা তদারকির উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার একজন পঞ্চায়েত অধিকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার নিযুক্ত করবেন।’ আবার 211 নম্বর ধারা অনুসারে ‘রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের ক্ষমতা থাকবে।’ কিন্তু দুঃখের বিষয় পঞ্চায়েত আইনের এই ধারা দুটি আজও কার্যকরী হয়নি। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতী রাজের জন্য একটি পরামর্শ ও আবেক্ষণ অধিকার স্থাপনের সুপারিশ করা যেতে পারে। পাঞ্জাবের এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রশাসনিক, হিসাব পরীক্ষা ও কারিগর অধিকারিকদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করা হয়েছে। এই দল পঞ্চায়েতের কাজকর্ম তদারক করবার জন্য এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদে গিয়ে প্রায় চারদিন করে কাজ করেন। এর ফলে সেখানে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কাজে উৎসাহ পান এবং তাঁদের কর্ম প্রয়াসে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনাও থাকে খুব কম।

REFERENCES

1. Mohit Bhattacharya, State-Municipal Relations, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1972, P. 1.
2. Agenda Papers on Seminar on Public Administration in Panchayati Raj, Mussoorie, Central Institution of Community Development, 1962, P. 27.
3. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 205(1).
4. Ibid, 205(2).
5. Ibid, 109.
6. Ibid, Sec. 213.

7. Ibid, Secs. 11, 100 and 145.

8. Ibid, Sec. 214.

8a. পুরসভাগুলি আর বাতিল করা যাবে না এ বিষয়ে রাজ্যসরকার বিবেচনা করছেন : Bengal Municipal (2nd) Amendment Bill, 1976.

9. The Amrita Bazar Patrika, July 10, 1969.

10. AEO, EOP, EOSE, LEOSE, EOI, EFO, MWI, IPE, SAE, FEO— সম্প্রতি কৃষি বিভাগকে ব্লক প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে। তাই কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক এখন আর ব্লকের সঙ্গে যুক্ত নন।

11. W. H. Morris Jones, The Government and Politics of India, Hutchinson University Library, 1967, London, 2nd Edn., P. 146.

12. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 35(1).

13. G. O. No. 776-CDP dt. 7. 2. 80

14. West Bengal Panchayat Act, 1973, Secs. 124(2) (c) & 171(2) (c).

15. Ibid, Sec. 186-193. নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

16. W. A. Robson, Local Government in Crisis, George Allen and Unwin, 1966, London, P. 53.

17. Henry Maddick, 'Control, Supervision, and Guidance of Panchayati Raj Institutions', The Indian Journal of Public Administration, Vol. VIII, No. 4, October-December, 1962, P. 503.

18. Report of the Committee on Democratic Decentralization, Government of Maharashtra, 1961, Bombay, P. 143.

একাদশ অধ্যায়

গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার প্রচলন এদেশের গ্রামগুলির মতই সুপ্রাচীন। এই পুরাতন গ্রামসভাগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সত্যি-কারের প্রতিভূ কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র বিচার কাজের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে সব সময়েই মতৈক্য ছিল। 'স্মৃতিগুলিতে' বিচার কার্যের জন্য গঠিত এইসব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে।[1] সে সময় গ্রামাঞ্চলে বিচার ব্যবস্থার ভার ছিল শ্রেণী (একই জীবিকায় নিযুক্ত বিভিন্ন জাতির লোকসহ বণিক ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত বিচার সভা), 'পুগ' (একই গ্রামের বাসিন্দা বিভিন্ন জাতি ও বৃত্তির লোক নিয়ে গঠিত বিচারালয়), 'কুল' (ছোটখাট ব্যাপারে সালিসির জন্য জ্ঞাতিদের নিয়ে গঠিত বিচার সভা) প্রভৃতি বিচার সভার ওপর।[2] বিরোধ মিমাংসার ব্যাপারে পূর্ববর্তী প্রতিটি বিচারসভা অনুবর্তী বিচার সভার তুলনায় উৎকৃষ্টতর ছিল। এইসব লোকায়ত বিচারালয়ের রায়ে রাজার আইনগত অনুমোদন থাকত শাস্তিদানের মধ্যে। আর নৈতিক অনুমোদন হিসাবে থাকত জনমতের সমর্থন। সামান্য রদবদল হয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ রাজত্ব পর্যন্ত চলে আসছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশের গ্রামাঞ্চলে এইসব স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটতে থাকে। ফলে পঞ্চায়েতগুলি নিঃসন্দেহে হীনবল হয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসকেরা বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ ব্যবস্থা চালু করার দরুণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ বিচার প্রতিষ্ঠানের দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। বৃটিশ সরকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রবর্তন করে বস্তুত আমাদের এই সুপ্রাচীন বিচার ব্যবস্থাকেই উপেক্ষা ও উচ্ছেদ করেছে। পঞ্চায়েত সংগঠনগুলি সম্ভবত ১৮৫০ ও ১৮৬০ সালের মধ্যে শেষ অবস্থায় পৌছয়। কিন্তু তার অনেক আগেই অত্যুৎসাহী বৃটিশ শাসকেরা এই ঐতিহ্যময় দেশী প্রতিষ্ঠানগুলির, যা তখনো প্রাণবন্ত ছিল, ধ্বংসসাধনে তৎপর হয় এবং একাজ

করতে গিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারে দেশের প্রশাসন চালনায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কী অপরিসীম।"[৪]

বৃটিশ আমল

তাই এই ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য বৃটিশ সরকার ১৮০২ এবং ১৮১৬ সালে যথাক্রমে বোম্বাই ও মাদ্রাজে আইন পাশ করে। কিন্তু এই পরীক্ষানিরীক্ষা সফল হয়নি। ১৯০৭ সালে বৃটিশ সরকার বিকেন্দ্রী-করণ সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশন গঠন করে ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৯০৮ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচার করবার ভার গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির ওপর দিলে বিচার ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকারী হবে।[4] রাজকীয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারগুলির মতামত বিচার করে ভারত সরকার ১৯১৫ সালের মে মাসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থার ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাংলায় ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ব্যাপারে বিধিগত অনুমোদ দেওয়া হয়।

১৯৫৭ সালের আইন

১৯১৯ সালের আইনের মতই ১৯৫৭ সালের পশ্চিবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে অঞ্চল পঞ্চায়েত পর্যায়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের বিধান রাখা হয়। ন্যায় পঞ্চায়েতকে পুরোনো ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্টের সংশোধিত অনুবৃত্তি বলা যেতে পারে। বিচার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের মূলে ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হল, কিছু কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমার ক্ষেত্রে ঘটনা স্থলেই বিচারের ব্যবস্থা করা এবং বিচার ব্যবস্থাকে গ্রামের মানুষের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষের সেবা করা। সেই লক্ষ্য পূরণ করা যায় তখনি যখন জনসাধারণের নিকট সহজে এবং অল্প ব্যয়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। ন্যায়

পঞ্চায়েত এই লক্ষ্যপূরণের প্রত্যাশা নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল। ন্যায় পঞ্চায়েত গ্রামের দরিদ্র জনগণের নাগালের কাছে বিচার ব্যবস্থাকে পৌঁছে দিতে পারে। নিয়মিত সাধারণ আদালতের মত সুদীর্ঘ প্রণালীর ভেতর না গিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত খুব দ্রুত সুবিচারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। গ্রামবাসীদের এবং তাদের আচার আচরণের সঙ্গে পরিচিত অথচ তাদের কাছাকাছি রয়েছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানই তারা পছন্দ করে। এবং এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অনেক দূরের পুরাদস্তুর আদালতের চেয়ে তাদের ভালোভাবে সেবা করতে পারবে বলে আশা করা যায়। 'এই বিচার ব্যবস্থা যা গভীর বিচার বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, গ্রামবাসীদের ঘরের কাছে স্বল্প ব্যয়ে যা পাওয়া যায়, যাতে নানা পদ্ধতিগত জটিলতার ফল স্বরূপ বিলম্ব হয় না, যা বিবাদ জিইয়ে রাখার বদলে তা মিটিয়ে ফেলতেই বেশী তৎপর, একই এলাকার ব্যক্তিরা যে বিচার চালান; একই ভাষা বলেন এবং সম্ভবত অনেক বিষয়ে একই মতামত পোষণ করেন, যা ঘরোয়া এবং জনগণের উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং যার একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যও রয়েছে গ্রামবাসী সেই বিচারব্যবস্থাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধ্য। সম্ভবত এই কারণেই এই বিষয়ে প্রায় সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন।'[5]

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের মত ইংলণ্ডের প্যারিস কাউন্সিল এবং ফ্রান্সের কমিউনের কোন বিচার সংক্রান্ত কাজ করতে হয় না। সুইজারল্যাণ্ডের কমিউন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সোভিয়েতগুলির অবশ্য সীমিত কিছু বিচার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ন্যায় পঞ্চায়েতগুলির বিচার ক্ষমতা বিদেশের এইসব স্থানীয় আদালতের তুলনায় ব্যাপকতর।

আইন প্রনয়ণ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাকে আলাদা করে না নিলে সত্যিকারে স্বাধীনতা থাকেনা। পঞ্চায়েত আদালত যাতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে তার জন্য তাদের পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বাধীন হওয়া দরকার। রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিতে প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার ব্যবস্থাকে পৃথক করবার নীতি বিধৃত রয়েছে।[6] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছে। তাছাড়া পঞ্চায়েতগুলিকে উন্নয়নমুখী করা হয়েছে। স্থানীয় এলাকার জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েত প্রশাসনকে এতটা সময় দিতে হয়

যে বিচার সংক্রান্ত কাজ করবার যথেষ্ট সময় তাদের থাকে না। যে আবহাওয়ায় বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে হয় তাতে উন্নয়নের কাজ যথেষ্ট এগোয় না। প্রশাসনিক দায় দায়িত্বের সঙ্গে বিচার করবার ক্ষমতাকে যুক্ত করে দিলে সেই বিচার ন্যায় ও নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সুতরাং পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে ন্যায় পঞ্চায়েতকে পৃথক করা দরকার হয়ে পড়েছিল। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ডের একটি সাব-কমিটির ওপর বিচার সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[7] কিন্তু ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে অঞ্চল পঞ্চায়েতের দ্বারা নির্বাচিত অথচ তার থেকে আলাদা এবং স্বাধীন একটি বিচার সংক্রান্ত সংস্থারূপে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের বিধান রাখা হয়েছিল। অন্তত এদিক থেকে ন্যায় পঞ্চায়েত বস্তুতই ইউনিয়ন বোর্ডের সাব-কমিটির ব্যবস্থা থেকে উন্নত। উল্লিখিত আইনে প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য একটি করে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছিল।[8]

১৯৭৩ সালের আইন

১৯৫৭ সালের আইন অনুসরণ করে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে ন্যায় পঞ্চায়েত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যায় পঞ্চায়েতকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। তবে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও নির্বাচনের ব্যাপারে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে উদ্যোগী হতে পারে না। রাজ্যসরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অধিকার (authority) দিলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত ন্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারে। এই রাজ্যে 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। কিন্তু কোথাও এখনও ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুরাতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 2,926টি অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র 52টি অঞ্চল পঞ্চায়েত ১৯৬৪ সালের মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করেছিলো এবং এগুলি সবই স্থাপিত হয়েছিল কেবল বর্ধমান, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। অর্থাৎ সারা পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দুইশতাংশ অঞ্চল ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান কাজ হল ন্যায় পঞ্চায়েতের সংগঠন ও

প্রশাসনের ব্যবস্থা করা, এব্যাপারে জনগণের উৎসাহ যথেষ্ট জাগ্রত করা হয়নি। ষাট দশকে সরকার ভেবেছিলেন, পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলীর ভুলত্রুটি সংশোধন না করা পর্যন্ত আরো ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করা বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু নতুন নিয়মাবলী আর রচনা হয়নি। তাই ১৯৬৪ সালের পর থেকে আর পঞ্চায়েত বিচার সভা গঠিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী এলাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য ১৯৭৩ সালে নতুন পঞ্চায়েত আইন রচিত হয়েছে এবং তা ১৯৭৮ সালে কার্যকরীও হয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়নি। এথেকেই দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যসরকার ন্যায় পঞ্চায়েত স্থাপনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী নন।

গঠন

যাইহোক, নয়া পঞ্চায়েত আইনের 51 নম্বর ধারায় ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হবে। সদস্যদের বিচারক নামে অভিহিত করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত তার এক্তিয়ার-ভুক্ত এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনমণ্ডলীর তালিকায় যাদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে থেকে ঐ বিচারপতিদের নির্বাচন করবেন। কোন পদ্ধতিতে বিচারপতিগণ নির্বাচিত হবেন সে বিষয়ে পঞ্চায়েত আইনে কিছু উল্লেখ নেই এবং কোন নিয়মাবলীও রচিত হয়নি। তাই প্রসঙ্গত পুরাতন আইন অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন ঐ বছরের ৩রা নভেম্বর থেকে বলবৎ হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে, ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকের সংখ্যা হবে পাঁচ এবং প্রতিটি গ্রামসভা থেকে একজন বিচারক নির্বাচিত হবে। আরো বলা হয়েছে, কোন অঞ্চলে গ্রাম সভার সংখ্যা পাঁচের থেকে বেশী হলে গ্রাম সভাগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন বিচারক নির্বাচিত করা হবে। আর যে অঞ্চলে গ্রাম সভার সংখ্যা পাঁচের থেকে কম সেখানে প্রতিটি গ্রাম সভা থেকে একজন বিচারক নির্বাচিত হবেন এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের বাকী সদস্যপদ অঞ্চল পঞ্চায়েত নির্ধারিত কোন গ্রামসভা বা গ্রাম সভাসমূহ থেকে নির্বাচন দ্বারা

পূরণ করা হবে। এভাবে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বিচারসভায় বিচারক নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল তা লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন আইনকে অনুসরণ করে বর্তমান আইনেও ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারক-গণকে পরোক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস্তবিকই তাঁরা যদি গ্রামবাসীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন তাহলে তাতে বিচারকদের মান নেমে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং তাঁরা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাবেন।

কোন ব্যক্তি ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকপদের নির্বাচনের যোগ্য হবেন না যদি :

(1) তিনি কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা কোন পৌর সংস্থার সদস্য হন ; অথবা

(2) তিনি সরকারী বা পঞ্চায়েত সংস্থার বেতনভুক্ত কর্মচারী হন ; অথবা

(3) তিনি কোন পঞ্চায়েত সংস্থার সঙ্গে কোন চুক্তিতে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অংশ বা স্বার্থ থাকে ; অথবা

(4) দুশ্চরিত্রতার দায়ে তিনি সরকারী বা স্থানীয় সংস্থার চাকরী থেকে গত পাঁচ বছরের মধ্যে বরখাস্ত হয়ে থাকেন ; অথবা

(5) তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক হন অথবা

(6) তিনি দায়মুক্ত নন এমন দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন ; প্রভৃতি।

এভাবে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকপদে নির্বাচনের পক্ষে অযোগ্যতার একটি দীর্ঘ তালিকা নয়া পঞ্চায়েত আইনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিচারকের যোগ্যতা সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। ফলে দক্ষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিচারকের পদে নির্বাচিত নাও হতে পারেন। আগে পঞ্চায়েত আইনে বিচারকদের সর্বনিম্ন বয়সের কথা বলা হয়েছিল—25 বছর বয়সের নীচে হলে তিনি বিচারপতি হতে পারবেন না। কিন্তু বর্তমান আইনে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের 51 (1) ধারা অনুযায়ী গঠিত প্রতিটি ন্যায় পঞ্চায়েতই সরকারী ঘোষণাপত্রে (গেজেটে) বিজ্ঞাপিত হবে। উল্লিখিত ঘোষণাপত্র বা গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ন্যায় পঞ্চায়েত বলবৎ

হবে। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছর। এই সময়কাল ধরা হবে গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে। এই সাধারণ নির্বাচনের পর নব-নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা নতুন ন্যায় পঞ্চায়েতের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ পদাভিষিক্ত থাকবেন।

প্রতিটি ন্যায় পঞ্চায়েত তার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারক নিযুক্ত করবেন। প্রধান বিচারক ন্যায় পঞ্চায়েতের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিতি বিচারকরা ঐ বৈঠকের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারক নিযুক্ত করবেন।

তিনজন বিচারকের কমে বৈঠকের কোরাম (Quorum) হয়না। অর্থাৎ ন্যায় পঞ্চায়েতের অন্ততপক্ষে তিনজন সদস্য বিচারের সময় উপস্থিত না থাকলে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত মামলা-মোকদ্দমার বিচার বা অন্য কার্য করতে পারেন না। কোন মামলার বিচারে ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ যদি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারেন তাহলে সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিচারকদের মধ্যে দু'পক্ষে সমান সমান ভোট হলে প্রধান বিচারক অথবা যে বিচারক ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন তিনি কাষ্টিং ভোট (সভাপতির ভোট) দিতে পারেন এবং সভাপতির এই মীমাংশক ভোটে ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হবে।[9]

পদাভিষিক্ত থাকবার সময়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের যে কোন সদস্য লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কতৃপক্ষের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট প্রাধিকারী সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলে সেই সদস্য পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে।[10] পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহকুমা শাসকদের ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত প্রাধিকারীরূপে ঘোষণা করেছেন।

তাছাড়া, সরকার লিখিত আদেশক্রমে যে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যকে অপসারিতও করতে পারেন। তবে তার "উপযুক্ত ও যথেষ্ট কারণ" (good and sufficient reason) ঐ লিখিত আদেশে দেখাতে হবে।[11] তবে এই "উপযুক্ত ও যথেষ্ট কারণ" কী হবে সে সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কোন সূত্র নেই। এরকম প্রতিটি ব্যাপারে তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যকে অপসারিত করবার

আগে নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তাঁকে তাঁর বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিতে হবে।

ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যপদ পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে শূন্য হলে গ্রাম পঞ্চায়েত একজন নতুন সদস্য নির্বাচন করবেন। এই নব-নির্বাচিত সদস্য যে সদস্যের স্থলে নির্বাচিত হলেন সে সদস্য পদত্যাগ না করলে যতদিন এই পদে থাকতেন নব নির্বাচিত সদস্যও ততদিন এই পদে থাকবেন।

ন্যায় পঞ্চায়েতের এলাকা (Jurisdiction)

ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই ধরণের মামলারই বিচারের এক্তিয়ার বা ক্ষেত্রাধিকার (Jurisdiction) রয়েছে। ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী (Civil) ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে চুক্তি বাবদ প্রাপ্য টাকার জন্য মামলা, অস্থাবর সম্পত্তি বা ঐরূপ সম্পত্তির মূল্য বাবদ প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা, অস্থাবর সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকার করা বা ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা এবং গবাদি পশুর অবৈধ প্রবেশের দরুণ যে ক্ষতি হয় তার খেসারতের জন্য মোকদ্দমা। অবশ্য যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়েত তার নিজস্ব দেওয়ানী এক্তিয়ার বা ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কেবল মাত্র অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকার মূল্যের দাবীর মোকদ্দমাই বিচার করতে পারেন।[12] এই বিধানের কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। যে সব দেওয়ানী মামলা ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলো হল অংশীদারের তহবিলের জমার জের হিসাবে মোকদ্দমা, উইলবিহীন অথবা উইলকৃত সম্পত্তির অংশের জন্য কোন মোকদ্দমা, সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মামলা, নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মোকদ্দমা এবং স্থাবর সম্পত্তির খাজনা নির্ধারণ, হ্রাস, বৃদ্ধি কিংবা খাজনা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা, অথবা স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকগ্রাহী বা বন্ধকদাতার পক্ষে কোন মোকদ্দমা। এছাড়া "যে মোকদ্দমা ন্যায়পঞ্চায়েতের বিচার করা উচিত নয়" বলে জেলা বিচারক (ডিষ্ট্রিক্ট জজ) কোন মোকদ্দমা প্রত্যাহার করে নিলে সেই মোকদ্দমা ন্যায় পঞ্চায়েত বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারেন

না। জেলা জজ নিজে মামলাটি বিচার করতে পরেন অথবা সংশ্লিষ্ট মুন্সেফের নিকট সেটি বিচারার্থে পাঠাতে পারেন।[13] এর কারণ সম্ভবত এই মামলার ক্ষেত্রে আইনের জটিল প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার অত্যন্ত সীমিত হলেও তা স্বতন্ত্র।

ফৌজদারী (Criminal) ক্ষেত্রাধিকার বা এক্তিয়ারের দিক থেকে বলা যায় ন্যায় পঞ্চায়েত ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের দ্বিতীয় তপশীলের (এ) বিভাগে[15] বর্ণিত অপরাধগুলির সঙ্গে জড়িত ছোট ছোটে ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারেন। এই আইনের দ্বিতীয় তপশীলের 'বি' বিভাগ[15] বর্ণিত যে কোন অপরাধের মামলা সেশন জজ বা মহকুমা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা অন্য যেকোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ন্যায় পঞ্চায়েতে হস্তান্তরিত করলে ন্যায় পঞ্চায়েত তারও বিচার করতে পারেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, পুরানো ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ইউনিয়ন বেঞ্চও[16] উল্লিখিত অপরাধের বিচার করতে পারতেন।

দ্বিতীয় তপশীলের 'এ' বিভাগে বর্ণিত অপরাধগুলির বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের তার গঠনকারী সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচারের একমাত্র অধিকার রয়েছে। অবশ্য এই বিচার ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা বা সীমায়তি রয়েছে। প্রথমত, যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা উল্লিখিত ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত সেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের স্বার্থজড়িত কোন মামলার বিচার ঐ ন্যায়পঞ্চায়েত করতে পারেন না। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায় পঞ্চায়েতের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা। এরকম অবস্থায় ন্যায় পঞ্চারেতের কর্তব্য হচ্ছে বিষয়টি সেসন জজ বা মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানানো যাতে তারা মামলাটি নিজেদের হাতে নিতে পারেন অথবা অন্য কোন বিচারালয়ে হস্তান্তরিত করতে পারেন। নিজের এক্তিয়ার বা ক্ষেত্রাধিকার না থাকলে অথবা মোকদ্দমাটি যদি এমন ধরনের হয় যাতে ন্যায় পঞ্চায়েত যে দণ্ডাদেশ দিতে সক্ষম তা যথেষ্ট হবে না, তাহলে ন্যায়পায়েত আবেদনকারীকে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

তাছাড়া সেসন জজ বা মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন যে "মোকদ্দমাটি এমন প্রকৃতির যার বিচার ন্যায়পঞ্চায়েতে হওয়া উচিত নয়"

তাহলে তিনি ঐ মোকদ্দমাটি তাঁর অধীনস্ত কোন আদালত বা অন্যকোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হস্তান্তরিত করতে পারেন।[17] এই হস্তান্তরের কারণ সম্ভবত এই যে, এইসব মোকদ্দমায় দেওয়ানী মামলার মতই আইনের ঘটনার জটিল প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া কোন পক্ষ যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা হস্তান্তরের জন্য আবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে সেই পক্ষ যাতে উপযুক্ত আদালতে আবেদন পেশ করতে পারেন এবং সেইমর্মে এক আদেশ নিতে পারেন তার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত একটা যুক্তি সঙ্গত সময় পর্যন্ত ঐ মোকদ্দমার কার্যবাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য থাকতেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকার এভাবে কঠোরভাবে সীমিত করা হয়েছে।

ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধির বাধা সত্ত্বেও কোন মামলার পক্ষগণ ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারযোগ্য একটি বা একাধিক অপরাধের আপোষ মীমাংসা করতে পারেন।[18] ফৌজদারী কার্যবিধির 345 ধারায় যেমন রয়েছে, এক্ষেত্রে সে রকম আপোষ মীমাংসাকারী ব্যক্তিদের বিস্তৃত তালিকা নেই। সুতরাং মনে হয় মামলার "পক্ষগণে"র মধ্যে তাদের প্রতিনিধি বা নিযুক্তকরাও (Agents) অন্তর্ভুক্ত।[19] তবে এইসব আপোষ মীমাংসা ন্যায় পঞ্চায়েত অনুমোদন করবার পরেই কার্যকরী হতে পারে। দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই আপোষ মীমাংসা বলবৎ করবার ব্যাপারে ন্যায় পঞ্চায়েতের সেচ্ছানুসারে কাজ করবার ক্ষমতা নেই। কোন বিধিসম্মত চুক্তি বা আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কোন মামলা যদি পুরোপুরি বা অংশত মিটিয়ে ফেলা হয় ন্যায় পঞ্চায়েত সেক্ষেত্রে মীমাংসায় শর্ত অনুযায়ীডিগ্রী প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। গ্রামাঞ্চলে দুইপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার আপোষ মীমাংসা ঘটানোর জন্য নতুন আইনে 57 নম্বর ধারা সংযোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের আইনে অপরাধের আপোষ মীমাংসার জন্য 76 ও 85(3) এই দুটি ধারা সংযুক্ত করা হয়েছিল। বেশীরভাগ মোকদ্দমার ক্ষেত্রেই, তা সে ফৌজদারী ও দেওয়ানী যে কোন বিবাদই হোক না কেন, পূর্বতন ন্যায় পঞ্চায়েত দুপক্ষের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার সূত্র খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতেন। 21 সংখ্যক সারণী থেকে এবিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। অপরদিকে "ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক কোন মামলার বিচারে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে

আপীল করতে পারবে না"[20] এবং "ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় মামলায় জড়িত উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে"।[21] এ থেকে বোঝা যায়, কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতকে রায় দেবার অবাধ ও পরিপূর্ণ একচেটিয়া এক্তিয়ার দেয়া হয়েছে।

সেসন জজ বা মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়া কোন দণ্ডাদেশ বা জরিমানার আদেশ বাতিল অথবা সংশোধন করতে পারেন। কিংবা যদি মনে করেন "ন্যায় বিচার হয়নি" বা বিচারে ত্রুটি হয়েছে, তবে তিনি তাঁর অধীনস্থ কোন আদালতে সেই মামলার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি নিজ প্রস্তাবে এই পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা মামলায় সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে যে কোন পক্ষ ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করলে এ ব্যবস্থা নিতে পারেন। অনুরূপভাবে, দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি মুন্সেফের নিকট ন্যায় বিচার হয়নি এই কারণ দেখিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রীর তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন করেন তা হলে ডিক্রী রদ বা সংশোধন করতে পারেন কিংবা ন্যায় পঞ্চায়েত বা অন্য কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারেন। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে এই রায় সংশোধনের ক্ষমতা মুন্সেফের বদলে জেলা জজের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল।[২২]

ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় পুনর্বিবেচনার ব্যাপারে সেসন জজ বা মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বা মুন্সেফের ক্ষমতা পুরোপুরি অবাধ। সেসন জজ, জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বা মুন্সেফ হাইকোর্টের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন। সুতরাং মনে হয় হাইকোর্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না।[২৩] কিন্তু হাইকোর্ট তার পরিদর্শনের এক্তিয়ারের বলে যথোচিত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।[২৪]

ন্যায় পঞ্চায়েতের জরিমানা করবার বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা খুবই সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতার দরুণ গ্রামবাসীদের কাছে গ্রামীণ বিচারালয়ের মর্যদা হ্রাস করে। ন্যায় পঞ্চায়েত কোন কারাদণ্ড দিতে পারেন না। পারেন অপরাধীদের 50 টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা জরিমানা করতে। এই অর্থদণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হল অভিযোগকারীর ক্ষতিপূরণ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যায়

পঞ্চায়েত নির্দেশ দিতে পারেন যে, আদায়ীকৃত জরিমানার সমস্তটা বা তার কোন অংশ অপরাধের দরুণ যে লোকসান বা আঘাতপ্রাপ্তি ঘটে তার ক্ষতি-পূরণ দানের জন্য ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া প্রথমবার যারা অপরাধ করেছে তাদের বয়স, চরিত্র এবং পূর্ব পরিচয় বিবেচনা করে ন্যায় পঞ্চায়েত তাদের যথাযথভাবে সতর্কীকরণের পর ছেড়ে দিতে পারেন। এ ধরনের অপরাধী অনধিক এক বছরের জন্য শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সদাচরণ করবে এই মর্মে অনধিক পঞ্চাশ টাকার একটি মুচলেকা (bond) দিলে ন্যায় পঞ্চায়েত তাদের সচ্চরিত্রতার পরীক্ষাধীনে (Probation) ছেড়ে দিতে পারেন। এর ফলে অপরাধীরা আত্মসংশোধনের একটা সুযোগ পান। পুরাতন ন্যায় পঞ্চায়েতকে সাধারণত গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের কাজই করতে হত। আবার ন্যায় পঞ্চায়েত যদি মনে করেন, তাদের নিকট পেশ করা দেওয়ানী বা ফৌজদারী অভিযোগের দরখাস্তটি তুচ্ছ, বিরক্তিকর কিংবা অসত্য, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনধিক পঁচিশ টাকার ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত অভিযোগকারীকে নির্দেশ দিতে পারেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতকে বিচার সঙ্গত, ন্যায্য ও বিবেকসম্মত বলে বিবেচিত ডিক্রি (আজ্ঞপ্তি) দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[25] ঐ ডিক্রিতে নির্ধারিত ফি-র পরিমাণ, সাক্ষীদের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ এবং কারা এই অর্থ দেবেন এসমস্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। সমস্ত দেওয়ানী মামলার আনুষঙ্গিক খরচ এবং কারা ঐ খরচ দেবেন এবং কি পরিমাণ দেবেন তাও স্থির করবার পূর্ণক্ষমতা ন্যায় পঞ্চায়েতের রয়েছে।

ন্যায় পঞ্চায়েতের অবশ্য বিনাশ্রম বা সশ্রম কোন কারাদণ্ড দেবার ক্ষমতা নেই, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি জরিমানা না দেওয়ার দায়েও তারা কারাদণ্ড দিতে পারেন না। ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায় না হলে ন্যায় পঞ্চায়েতকে বিষয়টি নিকটতম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্য সমস্ত ফি, মুচলেকা বা ঋণপত্র বাবদ প্রাপ্য সমস্ত অর্থ এবং আজ্ঞপ্তি বা ডিক্রীর (Decree) সমস্ত টাকা এই আইন মতে ধার্য বকেয়া অভিকর বা কর যে রীতিতে আদায় করা হয় সেই রীতিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশানুসারে আদায় করা যেতে পারে।[26] ডিক্রী

প্রদানকারী ন্যায় পঞ্চায়েত ডিক্রী বা আজ্ঞপ্তির টাকা আদায় করে দিতে অসমর্থ হলে ডিক্রীধারীকে তার প্রাপ্য টাকার এবং মোকদ্দমার ব্যয় বাবদ প্রাপ্য টাকার উল্লেখ করে ঐ মর্মে একটি প্রমাণপত্র (certificate) দিতে হয়। তখন সেই ডিক্রী-প্রাপক মুন্সেফের নিকট ঐ ডিক্রী কার্যকর করবার জন্য আবেদন করতে পারেন। মুন্সেফ যেন নিজেরই দেওয়া ডিক্রী জারী করেছেন এমনভাবে ঐ ডিক্রী কার্যকর করবেন।

ন্যায় পঞ্চায়েত অনুসৃত বিচারপদ্ধতি যতটা সম্ভব সরলীকৃত করা হয়েছে এবং সাধারণ আদালতে প্রযোজ্য সমস্ত খুঁটিনাটি পরিহার করা হয়েছে। ফলে ন্যায় পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত বিচারে ১৮৭০ সালের কোর্ট ফি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইন এবং ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হবে না।[27] আইন অনুযায়ী ন্যায় পঞ্চায়েত রাজ্যসরকার নির্ধারিত নিয়মানুসারে বিচারকার্য চালাবেন। কিন্তু রাজ্যসরকার এখনো এই নিয়মাবলী রচনা করেন নি। ১৯৫৭ সালের আইন অনুসারেও বিচারকার্য পরিচালনা সম্বন্ধে কোন বিধি রচিত হয়নি। ফলে সে সময় ন্যায় পঞ্চায়েতকে তার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করতে এবং রায় ও নির্দেশ জারী করতে হত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আইন ব্যবসায়ীগণ ন্যায় পঞ্চায়েতে ওকালতি করতে পারবেন না।[28] তাঁরা আগেও পারতেন না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব পদাধিকার বলে ন্যায় পঞ্চায়েতের সচিব হিসাবে কাজ করবেন এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের কার্যধারা ও রায়ের নথিপত্র রক্ষা করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য। এই গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের নিকট মৌখিক অথবা লিখিতভাবে দরখাস্ত করে ন্যায় পঞ্চায়েত মামলা রুজু করতে হবে। তাঁর অনুপস্থিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যও এই দরখাস্ত গ্রহণ করতে পারেন। যদি মৌখিকভাবে দরখাস্ত পেশ করা হয় তাহলে দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতি পালন করতে হবে এবং দরখাস্তকারীকে একটি নির্দিষ্ট দিনে ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্মুখে হাজির হবার নির্দেশ দিতে হবে।

দরখাস্ত পরীক্ষার পর যদি তা অগ্রাহ্য না করা হয় তাহলে ন্যায় পঞ্চায়েত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির হবার জন্য এবং দরখাস্তের জবাব দেবার জন্য সমন-জারী করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিযুক্তকের (agent) মাধ্যমে

হাজির হবার অনুমতি না দেওয়া হলে কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলা না হলে তাকে ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির না হলে ন্যায় পঞ্চায়েতের কর্তব্য সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিষয়টি জানান। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করবেন এবং গ্রেপ্তার হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট প্রেরণ করবেন। ন্যায় পঞ্চায়েত যেদিন অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির হবেন ঐদিনই মোকদ্দমার বিচার করতে পারেন। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তী যে কোন দিন আবার তার সামনে হাজির হবার জন্য অনধিক 25 টাকার মুচলেকা দিলে ন্যায় পঞ্চায়েত অভিযুক্তকে ছেড়ে দিতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মুচলেকা না দিলে বা দিতে অস্বীকার করলে তাকে বিচারার্থে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফেরৎ পাঠানো ছাড়া ন্যায় পঞ্চায়েতের আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট তখন অভিযোগটি যেন তাঁর নিকটেই করা হয়েছে এইভাবে একই রীতিতে এবং একই পদ্ধতিতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করবেন। এইরকম কালক্ষেপক পদ্ধতিতে বিচার বিলম্বিত হয়। তাছাড়া ধনী এবং অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা এই পদ্ধতির দরুণ গ্রামীণ আদালতের এক্তিয়ার এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পান এবং তার ফলে দরিদ্র গ্রামবাসীরাই অসুবিধায় পড়েন। ন্যায় পঞ্চায়েত সমন জারি করে মহিলা বাদে যে কোন ব্যক্তিকেই সাক্ষ্য দেবার জন্য অথবা কোন দলিল বা নথি পেশ করবার জন্য ডেকে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোন বৈধ কারণ ছাড়া কোন সাক্ষী সমন অমান্য করলে ন্যায় পঞ্চায়েত ঐ বিরূপ সাক্ষীকে কেবল অনধিক পঁচিশ টাকা জরিমানা করতে পারেন। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে হাজির করতে পারেন না। গ্রামীণ আদালতের এই সীমিত ক্ষমতার দরুণ গ্রামবাসীদের কাছে ন্যায় পঞ্চায়েতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সুতরাং ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা দরকার।

সীমিত হলেও ন্যায় পঞ্চায়েতকে কিছু কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষেত্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার পরিচালনায় ওপর যথাযথ তত্ত্বাবধান দরকার। জেলা জজ, সেসন জজ, মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফের ওপর এই তত্ত্বাবধানের

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এইসব পরিদর্শক আধিকারিকদের তাঁদের নিজ নিজ অধিকার ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েতগুলির মামলা মোকদ্দমার কার্যবাহ (Proceedings) এবং নথিপত্র পরিদর্শন করবার ক্ষমতা আছে।[২৩] এই পরিদর্শনের ক্ষমতা অর্থাৎ ন্যায়পঞ্চায়েতের ভুলত্রুটি সংশোধনের ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হয়েছে। পুরাতন ন্যায় পঞ্চায়েত দেখা গেছে এই জাতীয় আধিকারিকদের কেউই কখনো কোন ন্যায় পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেননি। পঞ্চায়েত সমূহের সম্প্রসারণ আধিকারিকই কেবল অঞ্চলের হিসাব পরীক্ষা ছাড়া এই অবেক্ষণের কাজ করতেন। কিন্তু তার তো কোন আইন বিষয়ক শিক্ষণ নেই ন্যায় পঞ্চায়েতের আইন নির্ধারিত কাজকর্ম তদারক করবার আইন সঙ্গত ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। সুতরাং পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থা তদারকির জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর আধিকারিক নিয়োগ করা দরকার।

গ্রামীণ আদালতের ভূমিকা (১৯৫৭ আইন)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে 52টি ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। আর এই ন্যায় পঞ্চায়েতগুলির কার্যাবলী থেকে আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি। একথা সত্য যে এগুলির মধ্যে অনেকগুলি ন্যায় পঞ্চায়েতই অল্প দিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চলে অবশ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রামীণ বিচার প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা হয়েছিল তা সার্থক হয়েছিল। এই পঞ্চায়েত আদালতগুলি দরিদ্র গ্রামবাসীদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছিল তাদের বিবাদ বিসম্বাদগুলি আইনের আশ্রয়ে অত্যন্ত অল্প খরচে এবং ঘরোয়াভাবে মীমাংসা করে নিতে। 21 সংখ্যক সারণীতে দেখানো হয়েছে, ১৯৬৭-৬৮ সালের ন্যায় পঞ্চায়েতগুলি 521টি ফৌজদারী এবং 163টি দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করেছে। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনের 77 ও 93 ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে 71 ও 72টি ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় বাতিল করে দেওয়া হয়। তাছাড়া মাত্র 21 শতাংশ মামলর ক্ষেত্রে রায় সংশোধন করা হয়। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম অধিকতর প্রশংসার দাবী রাখে। বর্ধমানের মহতা ন্যায় পঞ্চায়েতের (সারণী নং 22) রেকর্ড থেকেও একথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সারণী সংখ্যা—21

১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজ্য পর্যায়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের সাফল্য

সাল	পশ্চিমবঙ্গে ন্যায় পঞ্চায়েতের সংখ্যা	সক্রিয় ন্যায় পঞ্চায়েতের সংখ্যা	ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি: বকেয়া মামলা: দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা	চলতি বছরের মামলা: দণ্ড প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা	দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি: বকেয়া মামলা: মামলার সংখ্যা	মোকদ্দমার সম্পত্তির গড় মূল্য	চলতি বছরের মামলা: মামলার সংখ্যা	মোকদ্দমার সম্পত্তির গড় মূল্য	ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশ বাতিল হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা: ফৌজদারী মামলার সংখ্যা	দেওয়ান মামলার সংখ্যা	মোট
1	2	3	4(a)	4(b)	4(c)	5(a)	5(b)	5(c)	6(a)	6(b)	7(a)	7(b)	8(a)	8(b)	8(c)
1967-68	52	43	55	51	156	279	136	466	30	270·00	133	918·75	71	72	143
1968-69	52	40	35	9	39	80	82	222	28	2,200·00	70	4717·00	90	61	151

সূত্র : পঞ্চায়েত অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সারণী সংখ্যা—22

মহতা ন্যায় পঞ্চায়েতের সাফল্য

সাল	বিচারের জন্য দায়ের মামলা সংখ্যা		নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা		বছরের শেষে বকেয়া মামলার সংখ্যা		উচ্চতর আদালতে আপীল	আপোষ মীমাংসা		1957 সালের আইনের 77 ও 93 ধারার বাতিল রায়ের মামলার সংখ্যা
	ফৌজদারী	দেওয়ানী	ফৌজদারী	দেওয়ানী	ফৌজদারী	দেওয়ানী		ফৌজদারী	দেওয়ানী	
1	2		3		4		5	6		7
1964-67	63	×	59	×	4	×	2	37	×	×
1967-68	44	49	40	×	4	7	3	22	27	×
1968-69	26	10	26	10	×	×	2	19	7	×
1969-70	47	8	42	8	5	×	1	37	8	×

মামলা দায়ের ও চূড়ান্ত রায়ের মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের ব্যবধান	কীভাবে জরিমানা আদায় হয়েছে	বৈঠক সংখ্যা	কোরামের অভাব
8	9	10(a)	10(b)
সাত দিন থেকে ছয় মাস	নিজস্ব উদ্যোগে	42	×
		46	5
		44	14
		31	7

সূত্র : প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সংগৃহীত

কিন্তু মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সংখ্যা থেকে ন্যায় পঞ্চায়েতের জনপ্রিয়তা সূচিত হয় না। তাদের মধ্যে সততা ও নিরপেক্ষতার অভাব মাঝে মাঝে ঘটেছে। কখনো কখনো স্থানীয় চাপে পড়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার ব্যবস্থায় দোষ ত্রুটি ঘটেছে এবং তার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই গ্রামীণ স্থানীয় বিচার প্রতিষ্ঠানের কয়েকটিতে নানাভাবে দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল। এসব অভিযোগ ক্ষেত্রীয় সমীক্ষায় শুনতে পাওয়া গেছে।

পুরাতন পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থায় মামলার নিষ্পত্তি করতে ন্যায় পঞ্চায়েতের বেশ বিলম্ব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রায় কার্যকর হতেও অনেক সময় লেগেছে। কেননা রায় কার্যকর করবার জন্য তাদের অন্য সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হত। তাছাড়া অঞ্চল সচিব পদাধিকার বলে ন্যায় পঞ্চায়েতের সচিব ছিলেন। তাঁকে অঞ্চলের নানা ধরনের কাজ করতে হয়। স্বভাবতই তাই তার পক্ষে গ্রামীণ আদালতের কাজের জন্য বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে প্রস্তাবিত ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাগুলিই রাখা হয়েছে। সুতরাং ভালো হয় যদি ন্যায় পঞ্চায়েত তার নিজস্ব একজন সচিব নিযুক্ত করতে পারেন। কেননা ন্যায় পঞ্চায়েত প্রশাসনিক পঞ্চায়েত থেকে আলাদা ও স্বাধীন।

"স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত বিচারের একটা আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু সাধারণত যখন বিচার অল্প খরচে এবং খুব দ্রুত হয় তখন সেটা প্রায় আর বিচার থাকে না। অ-পেশাদার বিচার ব্যবস্থা কোন দেশেই কখনো প্রায় সফল হয়নি। ইংলণ্ড ছিল এ ধরণের বিচার ব্যবস্থার ঘাঁটি। সেখানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জাস্টিস অভ পীস দীর্ঘদিন ধরে ছোটখাটো মামলার নিষ্পত্তি করেছেন। কিন্তু এমন কি সেদেশেও এ ধরণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিয়েছে। লক্ষ্য করা দরকার, এ আন্দোলন আজও দিন দিন জোরদার ও গতিসম্পন্ন হয়েছে। অ-পেশাদার বিচারব্যবস্থার দিন যে শেষ হতে চলেছে এটা আর নিছক কল্পনা নয়।"[৪০]

তাই একদল চিন্তাবিদ মনে করেন, প্রথম দিকে ন্যায় পঞ্চায়েতগুলিকে কোন একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া উচিত হবে না। তাদের বরং মামলা বিচারের আদালতের চেয়ে "আপোষ মীমাংসার সংস্থা" হিসাবে কাজ করা উচিত। তাঁদের যুক্তি হল, পঞ্চায়েতগুলিকে পৌরসংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

এভাবে স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিপক্ক হবার পর তাঁরা অবশ্যই উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী ছাড়াও আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন।

১৯১৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এমন এক ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ছিল যাদের হাতে ছোটখাটো বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আজ অবশ্য ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার পরিচালনার অধিকারকে কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ করছেন। কিন্তু সমালোচকরা সম্ভবত আইনের মূল ভিত্তিটার কথা ভুলে যান। আইনের মূল দর্শনই হচ্ছে এই যে তা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। বিশেষত গণতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌম জনগণই সরকারের প্রধান চালিকাশক্তি। এই আদর্শ মনে রেখেই জনগণকে পঞ্চায়েতের মত তাঁদের নির্বাচিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এথেকে একটা বিষয় তাই পরিষ্কার। সেটা হল এই যে, বিচারকার্যে জনগণকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। সর্বশেষ বিশ্লেষণে ন্যায়বিচারের উৎস তো জনগণই। তাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার বিচারের ক্ষমতা দেওয়া দরকার। ন্যায় পঞ্চায়েত পল্লীবাসীদের এমনি একটি নির্বাচিত পরিষদ যা গ্রামে ঝগড়া বিবাদ মেটাতে এবং এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করবার আগেই তা মীমাংসা করতে পারে। সাধারণ বিচারালয়গুলিকে অত্যধিক মামলার বোঝা বইতে হচ্ছে। ন্যায় পঞ্চায়েত তাঁদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বিরোধ ও সংঘর্ষ মিটিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারলে সেখানকার প্রকৃত সমষ্টি উন্নয়ন সহজতর হবে। ন্যায় পঞ্চায়েতকে যদি গ্রামের ছোট খাট ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার বিচার ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের বিরাট দায়িত্ব পঞ্চায়েতের পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে তা কী ভাবে আশা করা যায়। শ্রীএস. এস. খেরা যথার্থ ই বলেছেন, "পঞ্চায়েতী রাজকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা না দিলে, পঞ্চায়েতকে ছোটোখাটো বিবাদ মীমাংসার ভার দিয়ে আস্থা না রাখতে পারলে......তাদের ওপর সমস্ত গ্রামের কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভবত সমানভাবে বিপজ্জনক।"[31] গ্রামের বিচারব্যবস্থা পরিচালনায় ন্যায় পঞ্চায়েতের হয়তো কিছু দোষ ত্রুটি

থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিচারালয়গুলিও এইসব দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।[32]

সাধারণ বিচারালয়গুলি সম্পর্কে নিত্যকার অভিযোগ হল এখানে বিচার কার্য বিলম্বিত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এইসব আদালতে প্রচুর বকেয়া মামলা জমে আছে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অশিক্ষিত মোকদ্দমাকারীদের অনাবশ্যক হয়রানি এবং অত্যধিক অর্থব্যয়ের অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। আদালতগুলি মহকুমা সদরে অবস্থিত হওয়ায় তাদের মামলার জন্য অনেক দূর থেকে যাতায়াত করতে হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র মহাশয় কয়েক বছর আগে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সাধারণ বিচারালয়ে মামলার বোঝা কমানোর জন্য একটি গ্রামীণ অধীনস্ত (Subordinate) বিচার বিভাগীয় কৃত্যক (Judicial Service) গঠন করা দরকার।[33] এই কৃত্যক দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঘরের কাছে স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে যাবে। এ ধরণের একটা সত্যিই কিছু করা দরকার। ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষেত্র বাড়িয়ে দিলে তারাই প্রস্তাবিত গ্রামীণ অধীনস্ত বিচাব কৃত্যকের কার্যভার গ্রহণ করতে পারে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, নাগরিকদের দায়িত্ব ও অধিকার নিরাপদে রাখতে আইন ও বিচারব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা অপরিহার্য। কিন্তু বিচারক যাতে যথাযথ ও সঠিক রায় দিতে পারেন তার জন্য তার উপযুক্ত বিচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষ মানসিক গঠন প্রভৃতি অবশ্যই থাকা দরকার। ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকদের নির্বাচন করতে তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।

ন্যায় পঞ্চায়েত ও সাধারণ আদালত

ন্যায় পঞ্চায়েত ও সাধারণ বিচারালয়ের মধ্যে কয়েকটি বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীকার ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত গ্রামের বাসিন্দা হতে হবে। দ্বিতীয় ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকদের অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। তৃতীয়ত, সাধারণ আদালতের বিচারপদ্ধতি ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং আইনজীবিগণের এইসব আদালতে সওয়াল করবার অধিকার নেই। এই তিনটি

বৈশিষ্ট্যই সুনির্ধারিত চলতি বিচার বিধির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। ন্যায় পঞ্চায়েত সাধারণ আদালতের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। এই অতিরিক্ত স্বাধীনতা থেকে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত ন্যায় বিচার পৌঁছে দেবার জন্যই গ্রামীণ আদালতগুলিকে বিচারক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ন্যায় পঞ্চায়েতগুলি এ ব্যাপারে গুণগত ও সংখ্যাগত দিক থেকে কতটা পরিমাণে গ্রামবাসীদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারবে এই ব্যবস্থার প্রশাসনিক সাফল্য তার ওপরেই নির্ভর করবে। বিচার সংস্থা হিসেবে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। ন্যায় বিচার না হলে জেলা জজ, সেসন জজ, মুন্সেফ এবং মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ন্যায় পঞ্চায়েতের যে কোন রায় বাতিল বা সংশোধন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মক্কেলরা অনাবশ্যক অসুবিধা ভোগ করেন। অপরাধ প্রমাণিত না হলে কোন শাস্তি দেওয়া যায় না। গ্রামীণ বিচার সভার বিচারকদের অপরাধ কাকে বলে এবং কীভাবে তা প্রমাণ করা যায় তা জানা দরকার। সমস্ত সভ্য সমাজে বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া স্বাভাবিক ন্যায় অন্যায়বোধের কয়েকটি নিয়ম সর্বদাই গৃহীত হয়ে আসছে। কোন ব্যক্তিকে না ডেকে বা তার কথা না শুনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, 'একই অপরাধের জন্য একবারের বেশী কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা যায় না এবং শাস্তি দেওয়া যায় না।'[34] কোন অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তিকেই তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীকে সম্ভাব্য সমর্থন করতে বাধ্য করা যায় না।[35] স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের এই নিয়মগুলি গ্রামীণ বিচারকদের জানা দরকার। দরকার তা অনুসরণ করাও। তাছাড়া ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এইসব ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্দেশগুলি সম্পর্কেও তাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এর আগে বিচারকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব যোগ্যতা থাকার দরুণ একজন দক্ষ বিচারক নিযুক্ত করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ বিচারকদের আইনগত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ন্যায় পঞ্চায়েত পরিচালিত বিচারব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করবার জন্য আইন বিষয়ে দক্ষ আধিকারিকদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটে নিয়োগ করা দরকার। বিচারকদের কিছু ভাতা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিচারক

হিসাবে নিয়োগের পর কোন অবস্থাতেই তাঁদের আর রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকা উচিত নয়।

REFERENCES

1. Radha Kumud Mukherjee, Local Government in Ancient India, Motilal Benarasidas, 1958, Delhi, P. 165.
2. N. C. Sengupta, Evolution of Ancient Indian Law, Tagore Law Lecture, 1953, P. 10.
3. Ursula K. Hicks, Development from below, Clarendon Press, 1961, Oxford, P. 46.
4. Report (Parliamentary Paper), Vol. 44 of 1908, P. 245.
5. Report of the Study Team on Nyaya Panchayat, 1962, PP. 35-36.
6. Constitution of India, Art, 50.
7. The Bengal Village Self-Government Act, 1919, Secs. 65 and 73.
8. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec, 19 (M)
9. Ibid, Sec. 72(1).
10. Ibid, Sec. 90.
11. Ibid, Sec. 91.
12. Ibid, Sec. 61.
13. Ibid, Secs. 62 and 79(2),
14. 'এ' বিভাগ

    (1) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের গবাদি পশু অনুপ্রবেশ আইনে 26 ও 27 ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ।

    (2) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন এবং এই আইন ছাড়া অন্যান্য আইন বা তার অধীন নিয়মাবলী বা উপ-বিধি অনুসারে অনধিক (ঊর্ধসীমা) পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ।

    (3) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পুলিস আইনের 34 ধারা, অনুযায়ী অপরাধসমূহ।

    (4) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইনের 28 এবং 30 ধারা ছাড়া অন্যান্য ধারামতে অপরাধসমূহ।

    (5) ভারতীয় দণ্ডবিধির 160, 269, 277, 289, 290, 294, 323, 341 352, 358, 426, 447, 448, 504 এবং 510 ধারা অনুযায়ী অপরাধসমূহ এবং তার

পঞ্চায়েতের মতে যেসব ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য দুই শত টাকার বেশী নয়, সেসব ক্ষেত্রে ঐ দণ্ডবিধির 379 এবং 411 ধারা অনুযায়ী অপরাধসমূহ।

15. 'বি' বিভাগ
ভারতীয় দণ্ডবিধির 283, 428, 430, 431, 506 এবং 509 ধারা মতে অপরাধসমূহ এবং যে ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের মতে সম্পত্তির মূল্য দুইশত টাকার বেশী নয়, সে ক্ষেত্রে 403 ধারা অনুযায়ী অপরাধসমূহ।

16. Vide. Bengal Village Self-Government Act, 1919, 4th. Sch.

17. West Bengal Panchayat Act, 1919, Sec. 79(1).

18, Ibid, Sec. 57.

19. Ibid, Sec. 83(2).

20. Ibid, Sec. 58

21. Ibid, 74.

22. Bengal Village Self-Government Act. 1919, Sec. 88.

23. B. Mukherjee, West Bengal Panchayat Act, 1956, S. C. Sirkar

24. Constitution of India, Act, 227.

25. West Bengal Panchayat Act, 1973, Sec. 72(1)

26. Ibid, Sec. 88(1). Vide Rules 119-129, West Bengal Panchayat Rules, 1958.

27. Ibid, Sec, 77(1).

28. Ibid, Sec. 84.

29. Ibid, Sec. 81(1) (2)

30. Dr. N. C. Roy, Village Self-Government in Bengal, 1936, Calcutta University, P. 189.

31. S. S. Khera, District Administration in India, Asia Publishing House, 1964, Bombay, P. 211.

32. Ibid, P. 218.

33. The Statesman, Calcutta, December 28, 1975.

34, Constitution of India, Art. 2o(2).

35. Ibid, Art. 20(3).

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতী রাজের মৌলিক দর্শন হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'। এর অর্থ হচ্ছে স্থানীয় ও গ্রামীণ ব্যাপারে সরকারী সংস্থা থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত ও সামগ্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েতী আইন প্রণেতাদের এই উচ্চ প্রত্যাশা অনেকটাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যত রাজ্যসরকারের অঙ্গ। অর্থাৎ এজেন্ট হিসাবে কাজকর্ম চালাচ্ছে। গৌণত সেগুলি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ইউনিট। কারণ পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত প্রত্যাভিযোজন এখনো করা হয়নি। এই অবস্থার মূলে যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অপর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ, সরকারী অনুদানের ওপর অতি নির্ভরশীলতা, পঞ্চায়েতগুলির ওপর অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

এরাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজের সূচনা ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গ্রাম পর্যায়ে দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্থাপন করতে রাজ্যসরকারের দীর্ঘ আট বছর (১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩) সময় লেগেছিল। মাত্র ১৯৬৪ সালে ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল। ফলে এই সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

নিয়মানুসারে প্রতি চার বছর অন্তর পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে জরুরীকালীন অবস্থা প্রভৃতি কারণে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতী নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। পঞ্চায়েতের নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রথায় করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ১৯৬৯ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চায়েত

বিল আনলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়। বলা যেতে পারে, এই পর্যায়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের দরুণ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মনোযোগ দেবার জন্য প্রশাসন যন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই যুক্তির ভেতর কোন গভীরতা নেই। পঞ্চায়েতী রাজকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য ঘোষিত নীতির প্রতি সরকার সব সময় উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয়। গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন বারবার পিছিয়ে দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত থেকে এ ব্যাপারে আমলা যন্ত্রের অনীহাই প্রতিফলিত হয়েছে। আর আমলাতন্ত্র তো খুব জরুরী প্রয়োজনের সময়েও ব্যবস্থা গ্রহণে মন্থর। কংগ্রেস ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ক্ষমতায় আসার পর নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করেন। কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেও নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান-পতন আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বারবার ঘটছে এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যাইহোক বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৮ সালে জুন মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। ১৯৫৭ সালের আইনকে ভিত্তি করেই যে নির্বাচন হয়েছিল তার সাথে এই নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে সুযোগদান এবং পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা। এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং গ্রামের মানুষের মনেও নির্বাচন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপার সঞ্চার করেছিল। সত্তর থেকে আশী শতাংশ ভোট পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এই বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চায়েত নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ অভিজ্ঞতা গত 15বৎসরের উপর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ছিল না। পঞ্চায়েতের নির্বাচন বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন চাইতেও অনেক বেশী ব্যাপক এবং অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিশ হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্র

থেকে গ্রাম বাংলার প্রায় আড়াইকোটি ভোটদাতা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে তিন স্তরে 56 হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। বিধানসভার 294টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল 1,764 আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে 56 হাজার আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন দুই লক্ষ। এই নির্বাচনের পর তিনটি স্তরে নির্বাচিত সদস্যেরা পর্যায়ক্রমে 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 324টি পঞ্চায়েত সমিতি ও15টি জেলা পরিষদ গঠন করে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সংবিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংস্থা গড়ে তোলেন।

পঞ্চায়েতের নির্বাচনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে বলা চলে। নজীর হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলাকে ধরা যেতে পারে। সেখানে বসবাস করেন মেচ, রাভা, টোটো ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল আদিবাসী এবং রাজবংশী সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গ থেকেও বহু উদ্বাস্তু সেখানে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নমশূদ্র সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। নেপালী ভাষাবাসী একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ধর্মগত বৈচিত্রও সেখানে লক্ষ্য করা যায়। মাড়োয়ারী সম্প্রদায় যাঁরা সাধারণত নিজেদের বিষয় কর্মে নিযুক্ত থাকেন। তাঁরাও এবার নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন এবং নির্বাচিতও হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে একজন শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত আছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় পঞ্চায়েতের নির্বাচনোত্তর যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে এই জাতি, ভাষা, ধর্ম ও অন্যান্য স্বার্থগত বৈচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এবং নতুন পঞ্চায়েত কাঠামোর তিনটি স্তরেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব আছে।

এবারকার পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্বের ধারাও পাল্টাচ্ছে। পুরানো নেতৃত্ব তাদের স্থান ও প্রভাব হারাচ্ছেন। এককালে জমিদাররা ছিলেন গ্রামের নিয়ম মাফিক এবং বিধি বহির্ভূত বা ঘরোয়া নেতা। কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার উচ্চতর স্তরের ঐতিহ্যগত চিরাচরিত নেতারা ক্ষমতাচ্যুত হন। ফলে গ্রামীণ কর্তৃত্ব কাঠামোয় একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে নতুন নেতৃত্বের কাঠামো গড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে সামাজিক পরিবর্তনের ধারা বেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজের অন্যতম বড় অবদান হচ্ছে জেলা, ব্লক ও গ্রাম পর্যায়ে নতুন রাজনৈতিক বাছাই করা গোষ্ঠীর (Political elite) অভ্যুদয়। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যা আমলা ও বিধানসভার

সদস্যগণ এককভাবে ভোগ করে এসেছেন সেখানে অংশীদার হওয়ার দাবী জানাচ্ছেন এই নতুন নেতৃবৃন্দ। নেতৃত্ব বদল নয়, নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাই দেখলাম, এতদিন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব ছিল বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে। প্রতিটি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ধনীব্যক্তি সেখানে নেতা হিসাবে গৃহীত হতেন। চিরাচরিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের কাঠামোয় ছিল বর্ণ বা সম্প্রদায় ভিত্তিক গোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক দলের ঘরোয়া নেতৃত্বের প্রাধান্য। এই চিরাচরিত কর্তৃত্ব কাঠামো ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী এবং অর্থ, বয়স ও বংশানুক্রম ভিত্তিক ছিল; এই কর্তৃত্বের ভাঙ্গন ধরেছে নয়া পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। তাই ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পল্লী বাংলায় এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যে নেতৃত্ব বয়সে তরুণ এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক সচেতন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্য রাজ্যসরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু পরিষদ বা সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের ক্ষেত্রে সেটা আরো ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। তাঁদের জন্য ওরিয়েন্টেশানের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

তাছাড়া, শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে আজকের পঞ্চায়েতগুলি সাধারণ নিম্নবিত্তদের হাতে একথা জোর করে বলা না গেলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নিম্নবিত্তদের মধ্য থেকে অনেক প্রতিনিধি এসেছেন। মহিলা, তপশীলী জাতি বা উপজাতিদের মধ্য থেকে কতজন পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নির্বাচিত হয়েছেন সে তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটা জানা আছে যে জেলা পরিষদে 30 জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে 648 এবং গ্রাম পঞ্চায়েত 6484 জন মহিলা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। ঠিক সেভাবেই সে সব স্তরে তপশীলী জাতি বা উপজাতি থেকে কোন প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হয়ে থাকলে সরকার থেকে নিযুক্ত দুজন করে সদস্য আছেন। কয়েকজন মহিলা গ্রামপ্রধানও আছেন। তাই বলা যেতে পারে পুরাতন গ্রামীণ নের্তৃত্বের পরিবর্তন হয়ে নতুন নের্তৃত্ব গড়ে ওঠবার একটা সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়

বা সামাজিক গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিকভাবে এক সাধারণ মঞ্চে এনে সমবেত করতে পেরেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন পঞ্চায়েত পরিচালনায় সব লোক সমান সুযোগ পায়নি। তাছাড়া, পঞ্চায়েত চালাতে গেলে সরকার রচিত বিভিন্ন নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। এজন্য পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তির কিছুটা শিক্ষা ও অবসর সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, গরীব গ্রামবাসী নিজেদের রুজিরোজগারের কাজেই সবসময় ব্যস্ত থাকেন। পঞ্চায়েতের কাজে সময় দেবার মত সময় তারা খুব কমই পান। ফলে গ্রামাঞ্চলের সব কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে শিক্ষা ও আর্থিক দিক থেকে অগ্রসর কতিপয় ব্যক্তির হাতে। সে কারণে মনে হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ পেশায় শিক্ষক এবং তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেই প্রধান, সভাপতি ও সভাধিপতি পদে নির্বাচিত হতে সফল হয়েছেন।

সবশেষে এটুকু বলা যেতে পারে, বয়স্ক ভোটাধিকার এবং পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরুন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত প্রথাগত কর্তৃত্ব ও প্রভাবের ক্রমাবসান ঘটছে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক প্রভাব প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতি বা সম্প্রদায়গত মনোভাব লোপ পেতে চলেছে। আর দৈনন্দিন কাজকর্মে ধর্মীয় প্রভাবও হ্রাস পাচ্ছে। বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যের সঙ্গে একই বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে রাজ্য শাসক দলও গ্রামীণ রাজনীতিতে এক প্রভাবশালী সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু বিধিগত অর্থেই বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যসরকারের সঙ্গে জড়িত নয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহীরাও রাজনৈতিক দিক থেকে এক কেন্দ্রীভূত দলীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো সেই ধরনের রাজনীতির প্রাধান্য যা সুবিস্তৃত সংগঠনের মাধ্যমে সমাজকে আচ্ছন্ন করে ক্রমশ সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝখানের সীমানা ধুয়ে মুছে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে এই প্রবণতাই চোখে পড়ে। এই রাজনৈতিক বন্ধনের সঙ্গে কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও যুক্ত। আর এইসব মিলেই গ্রামগুলিকে করে তুলেছে ম্যাককিম ম্যারিয়টের ভাষায় 'এক মহান সমাজের অংশ'।

সামাজিক পরিবর্তনেও সংগঠিত পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এক সাধারণ মঞ্চে এনে সমবেত করেছে।

এখন গ্রামে এমন কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে যাতে গ্রামের সমস্ত অংশের স্বার্থই সমভাবে জড়িত। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপন, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা বৃদ্ধি, গণসংযোগ মাধ্যমের প্রসার প্রভৃতি কারণে এরাজ্যের সমস্ত গ্রামে জীবনধারণের পদ্ধতি, অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিরাচরিত কর্তৃত্ব কাঠামো এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কিন্তু এক নতুন জীবনধারণ পদ্ধতি গড়ে উঠবার যথেষ্ট লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে পৌর সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা সীমিত। গ্রাম বাংলায় কর আদায়ের সুযোগও কম এবং খুব অল্প সংখ্যক করই লাভজনক। তাই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠাগুলি সরকারী অনুদানের ওপরেই নির্ভরশীল। সরকার বহু প্রকল্প, অর্থ ও গম দিয়েছেন পঞ্চায়েতগুলির হাতে। তারা এই প্রকল্পগুলি অনেক সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করেছে বলা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি তৈরী হচ্ছে কলকাতায় সরকারী নির্দেশে। নিজেদের প্রকল্প রচনা করবার যে ক্ষমতা আছে তার প্রকাশ কখনো ঘটেনি। তাছাড়া এই পরিকল্পনাগুলি ও অর্থের অনুদান যে কোন সময় সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া, এই পঞ্চায়েতগুলি স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য নিজস্ব আয়ের সূত্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন সঞ্চয় ও সম্পদ সৃষ্টি। কেবল মাত্র ন্যস্ত বিভাগীয় দায়িত্ব ও সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পঞ্চায়েত সংগঠন কখনই স্বনির্ভর হতে পারে না। পঞ্চায়েতগুলির অধিকাংশ কর্মসূচী কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের অনুদান নির্ভর। সেজন্যই এই অনুদান প্রাপ্তির কোন স্থিরতা নেই বলেই পঞ্চায়েতের কর্মসূচির প্রতিটি এমনভাবে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় যা হবে নির্দিষ্ট গ্রামের জন্য স্থায়ী সম্পদ। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি না হলে উন্নয়নের কোন স্থায়ী পথ সৃষ্টি হবে না ; কর্ম সংস্থানের কোন বন্দোবস্ত হবে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হল দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আবহমান কাল থেকে তারা আর্থিক দুর্দশা ও স্থায়ী ঋণে জর্জরিত হয়ে জীবন কাটায়। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা দানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না করতে পারলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তারা অংশগ্রহণ করতে পরবে বলে কখনোই আশা করা যায় না। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সফল করে তুলতে হলে বর্তমান মুহূর্তে আশু প্রয়োজন হলো আর্থিক সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দেয়া এবং তাদের জন্য বাধ্যতামূলক সার্বজনীন ও বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর লোকদের হাতে পৌঁচেছে। এ তথ্য থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্ভবত এই সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়েই পৌঁছেছে। পঞ্চায়েতের প্রশাসনে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এখনো খুবই কম। সমান পর্যায়ের সমান মানুষের মধ্যেই কেবল গণতন্ত্র কাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলিতে বৈষম্য ও শোষণের মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা, জমির অসম বণ্টন এবং ঋণ দান। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটলেও প্রাথমিক শিক্ষার হার খুবই কম। সমবায় আন্দোলন তেজারতি ব্যবসা সমাপ্তি ঘটাতে পারতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের আগ্রহ সত্ত্বেও ভূমি সংকারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি। যাদের জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারা এর সুযোগ নিতে পারেনি। ভাগচাষী এবং ক্ষেতমজুরদের অবস্থাও কম খারাপ নয়। বর্তমানে এসব ব্যাপারে নতুন উদ্যমে কাজ চলছে। তবে যতদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে এই দারুণ বৈষম্য থাকবে, ততদিন তারা কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মানুষ বলে নিজেদের ভাবতে পারবে না। এধরনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য। অবশ্য রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে যে আর্থিক সমতা আনার কথা বলা হয়েছে তা অনেকটা পরিমাণে পঞ্চায়েত পরিচালনায় উপযোগী পঞ্চায়েতী মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু এই কাজকর্মের

স্বয়ংক্রিয় ও স্বনির্ভর একটা ধারাবাহিক স্রোত সৃষ্টি করতে না পারলে সে সব কাজ অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। পঞ্চায়েতগুলি তাদের জনপ্রিয়তা হারাবে। আর এই পঞ্চায়েতগুলিই তো সরকারের ভাবমূর্তি (Image) বহন করে। ফলে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরী, কুটীর শিল্প প্রসার, প্রভৃতি কাজের ওপর গুরুত্ব দিলেই তো গ্রামে অনেক সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে। গ্রাম দেশকে নিজস্ব সম্পদ ও সঙ্গতি তৈরী করতে হবে। নইলে পঞ্চায়েত হবে হয়তো, কিন্তু পঞ্চায়েতীরাজ হবে না, গ্রাম-স্বরাজ হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ ব্যয় করবার ক্ষমতা সীমিত হলেও কতকগুলি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা যেমন, গ্রাম্য জল সরবরাহ, ময়লা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং গ্রাম্য পথগুলির নির্মাণ ও মেরামতের কাজ সাফল্যের সঙ্গে কার্যে পরিণত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামবাসীদের মধ্যেও একটা রাজনৈতিক নবজাগরণ সৃষ্টি করতে সাফল্য হয়েছে—গণতন্ত্রের ধারাকে অনেকটা প্রসারিত করেছে, এটা জোর করে বলা যেতে পারে। পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির হাতে রাজ্য সরকার বহু কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন যা আগে কখনো হয়নি। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে এটা সত্য। কিন্তু সেজন্য পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা খর্ব করা হোক এ দাবি সঙ্গত নয়। পঞ্চায়েতগুলি ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তার প্রতিকারের পথ আছে। পঞ্চায়েত সংগঠন যাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তার জন্য পঞ্চায়েত স্তরেই ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী তৎপরতা এবং গ্রামবাসীদের চেতনাই পঞ্চায়েতের কাজকর্মের মধ্যে একটা ভারসাম্য এনে দিতে পারে। আর এই পঞ্চায়েতগুলিই তো গ্রামবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। পঞ্চায়েতই তো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বুনিয়াদী সংগঠন। ক্ষমতা মূলে পৌছে দেওয়ার জন্যই তো পঞ্চায়েত সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ভুল ত্রুটির মাধ্যমেই গ্রামবাসীগণ তাঁদের এলাকার উন্নতির চেষ্টা সবে মাত্র শুরু করেছেন। একাজে তাঁরা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন তা দেখবার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

যে কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই যে

অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারই আলোকে তারা সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং এগিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে আজ হয়ত অনেক বাধা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে আধুনিকীকরণ (Modernization) শুরু হয়েছে এবং নতুন নেতৃত্বের প্রভাবে সমস্ত বাধা দূর হয়ে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে বলা যেতে পারে। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কেও গ্রামবাসীরা অনেক সচেতন হয়েছেন এবং সমাজ জীবনের দুর্বল শ্রেণীকে কিছু কিছু সুযোগ এনে দিয়েছে এই নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তাই আশা করা যায় পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আধুনিক সু-সমৃদ্ধ সুন্দর জীবনের আলো পৌঁছে যাবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী

A. PUBLIC DOCUMENTS

1. Government of India, A Digest on Panchayati Raj, Ministry of C.D. & Co-operation, 1962.
2. ,, Census of India, 1971 Census, Delhi, Manager of Publications, 1972.
3. ,, Democratic Decentralization, Ministry of C.D., 1959.
4. ,, Panchayati Raj, Delhi, Publication Division, 1961.
5. ,, Panchayati Raj, The Ten Point Test, Dept. of C.D., 1961.
6. ,, Panchayati Raj at a Glance, Dept. of C.D., 1964.
7. ,, Panchayati Raj—A Comparative Study of Legislation, Dept. of C.D. 1962.
8. ,, Report of the Royal Commission on Decentralization, 1909.
9. ,, Report of the Study Team for Community Development and National Extension Service, Balwantrai G. Mehata, Chairman, Planning Commission, New Delhi, 1957.
10. ,, Report of the Study Team on the Position of Gram Sabha in Panchayati Raj Movement, R. R. Diwakar, Chairman, New Delhi, 1963.

11. ,, Report of the Study Team on Panchayati Raj Finances (Parts I & II), K. Santhanam, Chairman, New Delhi, 1963.

12. ,, Report of the Study Team on Naya Panchayats, 1962.

13. ,, Report of the Rural-Urban Relationship Committee, Vol. I, Ministry of Health, 1966.

14. ,, The Nyaya Panchayats, Road to Justice, Ministry of C. D. & Co-operation, 1964.

State Governments :

1. West Bengal, Union Board Manual, Vol. I, Alipore, Govt. of West Bengal Press, 1953.

2. ,, District Board Manual, Alipore, Govt. of West Bengal Press, 1953.

3. ,, West Bengal Panchayat Act, 1957, Alipore, Govt. of West Bengal Press.

4. ,, West Bengal Zilla Parishad Act, 1963, Alipore, Govt. of West Bengal.

5. ,, West Bengal Panchayat Act, 1973, Alipore, Govt. of West Bengal Press.

6. ,, West Bengal Panchayat Rules, 1958, Alipore, West Bengal Govt. Press, 1958.

7. ,, West Bengal Zilla Parishad Rules, 1964, Alipore, West Bengal Govt. Press, 1964.

8. ,, Annual Administrative Report of Panchayati Raj Bodies, 1966-67, Alipore, Govt. of West Bengal Press.

9. ,, Annual Administrative Report of Panchayati Raj Bodies, 1967-68 (Unpublished), Directorate of Panchayats, 1970.

10. ,, Annual Administrative Report of Panchayat Raj Bodies, 1968-69 (Unpublished), Directorate of Panchayats, 1971.

11. ,, West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Vol. V, XII, XIII, XV, XXXIV, XXXVI, West Bengal Govt. Press, Alipore.

12. ,, Study of Panchayati Raj in West Bengal, First Report, Zilla Parishad (Unpublished), 1967, Directorate of Evaluation.

13. ,, Evaluation Report on Panchayati Raj Bodies in West Bengal, Anchalik Parishads, 1969, (Unpublished), Directorate of Evaluation.

14. ,, Evaluation Report on Panchayati Raj Bodies in West Bengal, Anchal Panchayats, 1970, (Unpublished), Directorate of Evaluation.

15. ,, Report of Recommendations of the Working Group on District Administration and Agricultural Administration, West Bengal Govt. Press, Alipore, 1968.

16. ,, The Report of the Police Commission, 1960-61, West Bengal Govt. Press.

17. ,, The Working of Panchayat System in West Bengal, Dept. of Panchayats & C. D., 1980.

18. ,, Panchayats in West Bengal (From 1978-79 to 1980-81). A Review, Dept. of Panchayats & C.D., 1982.

B. BOOKS & PAMPHLETS

1. All India Congress Committee : Report of the Congress Village Panchayet Committee, 1954.
2. All India Panchayat Parishad : Seminar on Fundamental Problems of Panchayati Raj. AIPP, New Delhi, 1964.
3. Bhattacharya, M. : Rural Self-Govt. in Metropolitan Calcutta, IPA, New York, 1965.
4. -do- : "Panchayati Raj in West Bengal", Patterns of P. Raj in India, ed. by G. Ram Reddy, 1977, Macmillan, PP 286-298.
5. Central Institute of Community Development : Seminar on Public Administration in Panchayati Raj, Agenda Papers, Mussoorie, 1962.
6. Dey, S. K. : Panchayati Raj in India, Asia Publishing House, Bombay, 1961.
7. Indian Institute of Public Administration : The Pattern of Rural Govt. (Report of a Seminar, Feb. 1958), IIPA, New Delhi.
8. Jacob, G. (ed.) : Readings on Panchayati Raj, NICD, Hyderabad, 1967.

9. Jain S. C. : Community Development and Panchayati Raj In India, Allied Publishers, Calcutta, 1967.

10. Maddick, Henry : Democracy, Decentralisation & Development, Asia Publishing, 1963.

11. -do- : Panchayati Raj : A study of Rural Local Govt. in India, London, 1969.

12 Mukherjee, S. K. : Local Government in West Bengal, Das Gupta & Co., Calcutta, 1974.

13. -do- : Some Aspects of Panchayat System in West Bengal (A monograph, cyclostyled), 1966.

14. Mukhopadhaya, A. K. : The Panchayat Administration in West Bengal, World Press, 1977.

15. Roy, N. C. : Rural Self-Government in Bengal, Uniuersity of Calcutta, 1936.

C. ARTICLES

1. Bhattacharjee, Sibnath : 'Finances of Panchayats in North Bengal, Econ. & Pol. Weekly, 9.11.68.

2. Basu, Asit Kumar : 'Panchayati Raj in West Bengal' Kurukshetra, April 16, 1973.

3. Basu, Asit Kumar : 'Reorganization of Panchayati Raj in West Bengal', Rastra (Bengali Quaterly), 12 (3-4).

4. ,, (with B. Saha) : West Bengal's Panchayati Experiment, The Economic Times, Sept. 4, 1979.

5. ,, Two years' Panchayats in West Bengal Yojana (Bengali), June 1, 1980, Ganasakti, June 11, 1980.

6. ,, : State—Panchayat Relations in West Bengal, Quarterly Journal of the Local Self-Govt. Institute, Bombay, Vol L I, No. 4, April-June, 1981.

7. প্রদোষ নাথ : পঞ্চায়েত ও গ্রাম-উন্নয়ন, অন্য অর্থ, সংখ্যা 17, জানুয়ারী 1982.

8. অশোক মিত্র : পঞ্চায়েত সাফল্য ও সমস্যা, পঞ্চায়েতী রাজ, মে-জুলাই, 1981.

9. দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চায়েত ও আমাদের ভাবনা, পঞ্চায়েতী রাজ, জুন, 1980.

10. পান্নালাল দাশগুপ্ত : পঞ্চায়েত ও বামফ্রন্ট, পঞ্চায়েতী রাজ, জুন, ১৯৮০।

11. বিপ্লব দাশগুপ্ত : ভূমি সংস্কার ও গ্রাম উন্নয়ন, পঃ বঃ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, ১৯৭৯।

12. Maddic, Henry : 'Control, Supervision and Guidance of Panchayati Raj Institutions', Indian Journal of Pub. Admn., 8(4), Oct.-Dec., 1962, PP. 500-11.

13. Mukherjee, S. K. : 'Some Aspects of the Panchayat System in West Bengal', Indian Journal of Publication Administration, 13(2), April-June 1967, PP. 313-37.

পরিশিষ্ট

পঞ্চায়েতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। এই সময় 19662টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 2926টি অঞ্চল পঞ্চায়েত, 325টি আঞ্চলিক পরিষদ এবং 15টি জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী নির্বাচন চার বছর বাদে হওয়ার কথা। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘকাল কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের শেষ উদ্যমটুকু হারিয়ে ফেলেন এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ক্রিয়তার অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে নূতন পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রশ্নটি তখনও স্থগিত থাকে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই ১৯৭৮ সালের জুন মাসে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে নির্বাচন হয়েছিল। এই নির্বাচনের সঙ্গে প্রথম নির্বাচনের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, নূতন আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির কাঠামো পরিবর্তন করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ব্যবস্থার—গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ—প্রবর্তন করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে সর্বপ্রথম দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে সুযোগ দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এটা আগে ছিল না। চতুর্থত, ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। গ্রামবাংলার আড়াই কোটি ভোট-দাতা একই দিনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিশ হাজার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ছাপান্ন হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত

সংস্থাগুলির জন্য। নির্বাচনও হয়েছিল বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। এটা গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সচেতনতারই একটা দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনের পরে নির্বাচিত সদস্যগণ 3242টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 324টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 15টি জেলা পরিষদ গঠন করেন।

এই নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে 46,953টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে 8,138টি এবং জেলা পরিষদে 648টি আসন ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা গড়ে তুলতে পারেনি সে সময়। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাই ছাপান্ন হাজার আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন প্রায় দু'লক্ষ। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছিল। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে সি. পি. আই. (এম) এককভাবে 60 শতাংশের অধিক আসন লাভ করেছিল। তারপর স্থান ছিল নির্দল প্রার্থীদের। কংগ্রেস (ই), আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের স্থান ছিল যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সময় কেন্দ্রে জনতা দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তার কোন ভিত্তি না থাকায় ঐ দল পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। 23 নম্বর সারণী থেকে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল জানা সহজ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের বিধান অনুসারে প্রতি চার বছর অন্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু গত বছর পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সদস্যদের কার্যকলাপের মেয়াদ চার বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর করা হয়েছে। সে কারণে এ বছরই (১৯৮৩ সাল) পঞ্চায়েতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে জুন মাসের 31 তারিখে।

তাছাড়া, দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায় গ্রামাঞ্চলে এতদিন ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন প্রযোজ্য ছিল। এবার সর্বপ্রথম এই এলাকাগুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা বাগান এলাকায় (resumed area) পঞ্চায়েত নির্বাচন এবারই প্রথম হ'ল। অপরদিকে কয়েকটি ব্লক এলাকা

সারণী সংখ্যা—23
১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল

দলগুলি	জেলা পরিষদ সংখ্যা 15 মোট আসন সংখ্যা 648	পঞ্চায়েত সমিতি সংখ্যা 324 মোট আসন সংখ্যা 8138	গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা 3242 মোট আসন সংখ্যা 46953
১	২	৩	৪
সি. পি. আই. (এম)	488	5596	28105
কংগ্রেস (ই)	22	623	4536
কংগ্রেস (আর)	4	105	580
আর. এস. পি.	31	353	1674
ফরোয়ার্ড ব্লক	44	320	1539
সি. পি. আই.	5	132	825
নির্দল	56	1332	9436
জনতা পার্টি	—	2	5
	647	8454	46700

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঙ্গীয় পৌরসভা আইনের আওতায় এসেছে। কয়েকটি ব্লক এলাকাও পুনর্গঠিত হওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা বেড়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। আইন সংশোধন করে এক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির এলাকার, মোট সংখ্যার বা আসন সংখ্যার দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ 15টি ও আসন সংখ্যা 678, পঞ্চায়েত সমিতি 339টি ও আসন সংখ্যা 8664, এবং গ্রাম পঞ্চায়েত 3305টি ও আসন সংখ্যা 46153। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা হল 55495 এবং ভোটদাতা ছিলেন 2 কোটি 20 লক্ষ।

কতজন ভোট দিয়েছেন, কোন দল কত ভোট পেয়েছেন, বা নির্বাচিত ও পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান কত সে তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সরকারী হিসাব অনুযায়ী সবকটি জেলাতেই গড়ে 60 থেকে 65 শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটদাতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ উপেক্ষা করে ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় এবং ভোটও হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। এটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতি গ্রামবাসীদের আস্থা ও রাজনৈতিক চেতনাই সূচিত করে।

সারণী সংখ্যা—24

পঞ্চায়েত নির্বাচন ১৯৮৩/দলগত প্রার্থী ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা

দল	জেলা পরিষদ 15 মোট 678 আসনে ভোট হয়েছে		পঞ্চায়েত সমিতি 339 মোট 8664 আসনে ভোট হয়েছে		গ্রাম পঞ্চায়েত 3305 মোট 46153 আসনে ভোট হয়েছে	
	প্রার্থী	নির্বাচিত	প্রার্থী	নির্বাচিত	প্রার্থী	নির্বাচিত
কংগ্রেস (স)	1	—	—		26	—
সি. পি. আই.	99	—	1132	96	6083	716
সি. পি. আই. (এম)	603	422	7894	5048	41571	24405
কংগ্রেস (আই.এন.সি.)	663	149	8267	2541	42628	14733
ফরোয়ার্ড ব্লক	109	25	1254	194	6584	1084
আর.এস.পি.	90	14	1066	248	5362	1241
লোকদল	5	—	3	—	18	—
জনতা	29	—	147	11	763	44
বিজেপি	29	—	153	2	821	34
নির্দল	531	21	5163	466	30755	3413

এবারকার নির্বাচনে গতবার থেকে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম। গত নির্বাচনে প্রতিটি পঞ্চায়েত আসনে গড়ে সাত-আট জন প্রার্থী ছিলেন। এবার সেক্ষেত্রে গড়ে চারজনেরও কম প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয় যে বহু জায়গায় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। 24 নম্বর সারণী থেকে পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে দলগত প্রার্থী ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে।

এই নির্বাচনে বিভিন্ন দলের 400 জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছেন 332 জন এবং 68 জন নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতিতে। জেলা পরিষদে কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। যাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সি. পি. আই. (এম) 226 জন, কংগ্রেস (আই. এন. সি.) 25 জন, ফরোয়ার্ড ব্লক 2 জন, আর. এস. পি. 3 জন, সি. পি. আই. 1 জন এবং নির্দল 75 জন। এভাবে পঞ্চায়েত সমিতিতে সি. পি. এম. 40 জন, কংগ্রেস 9 জন, আর. এস. পি. 1 জন, সি. পি. আই. 1 জন এবং নির্দল 17 জন। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রার্থীদের আসনগুলিতে কোন নির্বাচন হয়নি।

এছাড়া নির্বাচনের আগেই প্রার্থীদের মৃত্যুর জন্য 16টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 26টি আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির 3টি আসনে ও জেলা পরিষদের একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। অপরদিকে, নদীয়া জেলার তাহেরপুর ও কুপার্স ক্যাম্প গ্রাম পঞ্চায়েতের 25টি আসনে কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেননি। ঐ এলাকার বাসিন্দারা পুরসভার অন্তর্গত হতে চান। তাই সেখানে কোন পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। সংক্ষেপে গ্রাম পঞ্চায়েতের 45,461টি, পঞ্চায়েত সমিতির 8,583টি এবং জেলা পরিষদের 678টি আসনে এবার নির্বাচন হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের দলগত ফলাফল 25 নম্বর সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী সংখ্যা—25

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের দলগত ফলাফল (6. 6. 83 পর্যন্ত প্রকাশিত)

জেলা পরিষদ	1978	1983
যে আসনগুলিতে নির্বাচন হয়েছে	647	678
যে ফলগুলি বেরিয়েছে	647	631
সি. পি. আই. (এম.)	488	422
কংগ্রেস (আই. এন. সি)	22	149
আর. এস. পি	31	14
ফরোয়ার্ড ব্লক	44	25
সি. পি. আই.	5	—
কংগ্রেস (আর.)	4	—
নির্দল	53	21

পঞ্চায়েত সমিতি	1978	1983
যে আসনগুলিতে নির্বাচন হয়েছে	8,454	8,664
যে ফলগুলি বেরিয়েছে	8,454	8,586
সি. পি. আই. (এম.)	5,596	5,048
কংগ্রেস (আই. এন. সি.)	623	2,541
আর. এস. পি.	353	248
ফরোয়ার্ড ব্লক	320	194
সি. পি. আই.	132	96
জনতা	2	11
বিজেপি	—	2
কংগ্রেস (আর.)	105	—
নির্দল	1,323	466

গ্রাম পঞ্চায়েত	1978	1983
যে আসনগুলিতে নির্বাচন হয়েছে	46,700	46,153
যে ফলগুলি বেরিয়েছে	45,461	45,670
সি. পি. আই. (এম.)	28,105	24,405
কংগ্রেস (আই. এন. সি.)	4,536	14,733
আর. এস. পি.	1,674	1,241
ফরোয়ার্ড ব্লক	1,539	1,084
সি. পি. আই.	825	716
জনতা	5	44
বিজেপি	—	34
কংগ্রেস (আর.)	580	—
নির্দল	9,436	3,413

এই নির্বাচনের ফল থেকে একটি চিত্র পরিষ্কার—রাজনৈতিক মেরুকরণ (political polarization)। এই মেরুর এক প্রান্তে সি. পি. আই. (এম.) এবং অপর প্রান্তে কংগ্রেস। একটি গোষ্ঠী হিসাবে বামফ্রন্টের ফলাফল গত নির্বাচনের তুলনায় আশাপ্রদ নয়। তবে ফ্রন্টের প্রধান শরিক সি. পি. আই. (এম.) এর দলগত ফল মোট আসন সংখ্যার দিক থেকে গতবারের তুলনায় কিছুটা হ্রাসের দিকে। মোটামুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যার 53 শতাংশ সে নিজেই পেয়েছে এবং নিজেকে গ্রাম বাংলার একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু গতবারের তুলনায় চার হাজারের মত বেশী প্রার্থী দিয়েও সি. পি. আই. (এম.) জয়লাভ করতে পেরেছে গতবারের চেয়ে প্রায় চার হাজার কম গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে। গত নির্বাচনে অনেক কম প্রার্থী দিয়েও সে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যার শতকরা 60 ভাগ দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। এবার তাকে গতবারের তুলনায় 7 শতাংশ আসন হারাতে হয়েছে।

ফ্রন্টের অন্য দুই শরিক আর. এস. পি. এবং ফরোয়ার্ড ব্লকেরও প্রাধান্য যথেষ্ট লোপ পেয়েছে। গতবার গ্রাম পঞ্চায়েতে আর. এস. পি. পেয়েছিল

1674টি আসন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক 1539টি আসন। এবার তারা পেয়েছে যথাক্রমে 1241টি এবং 1084টি আসন। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে এই দুই দলের অবস্থা খুবই খারাপ। সি. পি. আই-এর অবস্থাও একই প্রকার।

অপরদিকে, এই নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি হিসাবে নিজেকে গ্রামবাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। গতবার এই দল দশ শতাংশ আসনও পায়নি। কংগ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েতে 4536টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে 623টি এবং জেলা পরিষদে 22টি আসন পেয়েছিল। এবার এই দল যথেষ্ট ভাল ফল করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে 14733টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে 2541টি এবং জেলা পরিষদে 149টি আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এই দল গতবারের তুলনায় সাড়ে তিনগুণ বেশী আসন লাভ করেছে। ত্রিশ শতাংশ আসন লাভ করেছে এই দল।

গত পাঁচ বছর ধরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই পঞ্চায়েতগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বামফ্রন্টের বিশেষ করে সি. পি. আই, (এম.)-এর দলভুক্ত নির্বাচিত ব্যক্তিরাই। তাই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেসের পক্ষে এই নির্বাচনে এত ভাল ফল করা সম্ভব হ'ল কী করে? অনেকে মনে করেন, বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেস লাভবান হয়েছে। যেখানেই একটি আসনে তিনজন প্রার্থী সেখানেই মোটামুটি এই দল জয়লাভ করেছে। এটাই একমাত্র কারণ বলে আমাদের মনে হয় না। কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি ঘটেছে সেগুলির সবই যে বামফ্রন্ট থেকে এসেছে তা' নয়। একটা বড় অংশ এসেছে নির্দল প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। এছাড়া, বেশ কিছু পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন, বর্গা রেকর্ড, এবং ত্রাণের ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বৈষম্যের অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, বর্গা রেকর্ড অধিকাংশ গরীব লোকদের উপকারে এলেও জমির মালিকরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। কৃষি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে কৃষি শ্রমিকরা উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু অপর একটি শ্রেণী তাতে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। এইসব ব্যবস্থাগুলি সরকারের সদিচ্ছা বহন

করলেও সর্বস্তরে সমাদৃত হয়নি। এবারের নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করতে হলে উল্লিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করা উচিত।

এবার গতবার থেকে নির্দল সদস্যদের সংখ্যা অনেক কম। গ্রাম পঞ্চায়েতে 3413, পঞ্চায়েত সমিতিতে 466 এবং জেলা পরিষদে 21 জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রাম পঞ্চায়েতে 75 জন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে 17 জন নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী দার্জিলিং জেলায়। সেখানে এই নির্দল সদস্যরা হলেন সম্ভবতঃ গোর্খা লীগের সভ্য। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদে নির্দল সদস্যরা সংখ্যায় বেশ ভারী। এদের অনেকেই হয়ত স্বীকৃত ও আঞ্চলিক দলগুলির সভ্য বা সমর্থিত প্রার্থী।

পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নূতন নেতৃবৃন্দ যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এলেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মকুশলতা এই পঞ্চায়েতকে গ্রামোন্নয়নের দিশারী হিসাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে আশা করা যায়।